# মহাকাশে কী ঘটছে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

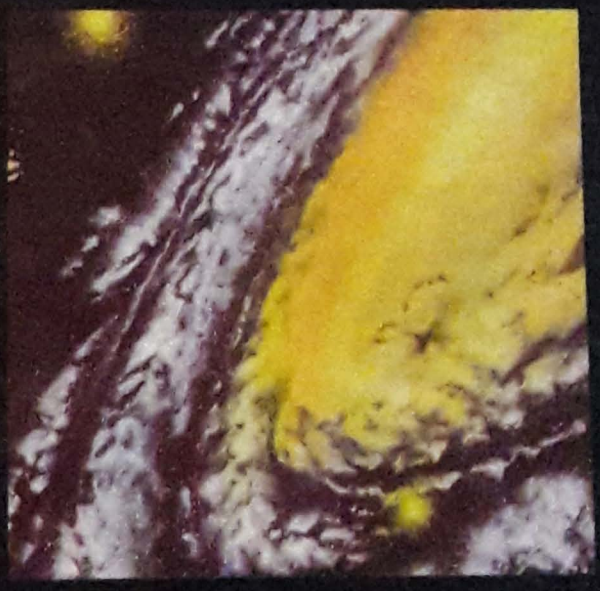

# মহাকাশে কী ঘটছে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
মাঘ ১৪০৩

গ্রন্থস্বত্ব
আবদল্লাহ আল-মুতী

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

হরফ বিন্যাস
ড্রিমল্যান্ড কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২০.০০ টাকা

MOHAKASHEY KEE GHOTCHHE (What is Happening in Space) by Abdullah Al-Muti. Published by Anupam Prokashani 38/4 Banglabazar Dhaka-1100. Price Foreign U$ 5 ISBN 984-404-082-5

উৎসর্গ

*জামীল ও ভিনাসকে*

# ভূমিকা

দূরের আকাশের চাঁদ-সূর্য গ্রহ-তারা চিরকালই মানুষের মনে অপরিসীম কৌতূহল জাগিয়েছে। মহাকাশের রহস্য মানুষ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছে আদিকাল থেকে। সেই বোকা পণ্ডিতের কাহিনীটা আমাদের সবারই জানা। পণ্ডিত রাতের বেলা পথ চলেছেন—দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের ভাবনায় তিনি মশগুল। এদিকে পথে ছিল এক খাদ; আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে পথ চলতে চলতে তিনি পড়ে গেলেন সেই খাদে।

এই কাহিনীর শিক্ষামূলক দিকটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না—আশপাশে না তাকিয়ে শুধু দূরের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। তবে সেই সাথে যেসব পণ্ডিত ঘর-সংসারের চিন্তা ছেড়ে কেবলই আকাশের ভাবনা-চিন্তায় মন দেয় তাদের জন্য করুণার দিকটিও এখানে স্পষ্ট।

বহুকাল ধরে জ্ঞানী মানুষদের নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা অনেকটা এরকমই ছিল। তার কারণ, আকাশের বিষয় যে তাদের জীবনে কখনো কাজে লাগবে তা ছিল মানুষের কল্পনারও অতীত।

কিন্তু আজ এ অবস্থা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ; চাঁদের বুকে নেমে ঘুরে বেড়িয়েছে। মহাকাশে ঘুরপাক খাওয়া কৃত্রিম উপগ্রহের বদৌলতে আমরা সহজেই দূরদেশে টেলিফোনে কথা বলতে পারছি, টেলিভিশনে ছবি দেখছি নানা দেশের। মহাকাশের বার্তা পেয়ে আমরা জানতে পারছি ঘূর্ণিঝড়ের আগাম খবর—খরা ও বন্যার সতর্কবাণী। বিজ্ঞানীরা মহাকাশ থেকে আশ্চর্য স্পষ্ট ছবি তুলে আনছেন সৌরজগতের অতি দূরের গ্রহ-উপগ্রহদের। চাঁদের মেরু অঞ্চলে পানি আর মঙ্গলগ্রহের বুকে প্রাণের চিহ্ন থাকতে পারে—খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহের বুকে মানুষের আস্তানা গাড়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

সূর্যের গায়ে সৌরকলঙ্কের খবর থেকে জ্যোতির্বিদরা খবর দিচ্ছেন পৃথিবীর আবহাওয়ায় বা বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার কোন ছাপ পড়বে কিনা। তাঁরা বলছেন সূর্যের

বিকিরণে যদি এক শতাংশের ভগ্নাংশমাত্র হেরফের ঘটে তাহলেই বদলে যেতে পারে পৃথিবীর জলবায়ু।

নভোযান থেকে আশ্চর্য সব খবর আসছে মানুষের জন্য। বৃহস্পতির ওপর আছড়ে পড়েছে ধূমকেতুর কিছু খণ্ড—তার স্পষ্ট ছবি দেখছি আমরা পৃথিবীতে বসে। এমনি ধূমকেতু বা গ্রহাণু যে কোন সময় এসে পড়তে পারে পৃথিবীর ওপর। অতীতে এমন ঘটেছে—ভবিষ্যতেও যে ঘটবে তা প্রায় নিশ্চিত, তবে কখন তা কেউ বলতে পারে না।

মহাকাশের বিষয়ে তাই আজ মানষের আগ্রহ বাড়ছে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মানুষ। গ্রহ-তারার জগৎ সম্বন্ধে ভাল করে জানার জন্য ঢাকায় একটি মহাকাশ-কেন্দ্র ও প্ল্যানেটেরিয়াম বসাবার দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

মহাকাশ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আজ অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। প্রতি বছরই জানা যাচ্ছে নতুন নতুন চমক লাগানো খবর। পৃথিবীর ওপর বসছে আরো জোরালো নতুন নতুন দূরবীন—আলোক-দূরবীনের সঙ্গে যোগ হচ্ছে বেতার-দূরবীন, অবলাল-রশ্মি দূরবীন, এক্স-রশ্মি দূরবীন, গামা-রশ্মি দূরবীন; মহাকাশেও বসছে নানারকম শক্তিশালী দূরবীন।

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার আমাদের মহাকাশ সম্বন্ধে কয়েকটি অসাধারণ বই উপহার দিয়েছেন; নব্বইয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত তাঁর রচনা এদেশের মানুষকে মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আজ আর তিনি নেই; তবে কিছু মহাকাশ-উৎসাহী তরুণ তাঁর সেই চর্চার ধারাকে আজো জিইয়ে রেখেছে।

আজকের দিন পর্যন্ত মহাকাশ সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি তা এ বইতে সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের এ বিষয়ে কৌতূহল মেটাতে এটি সাহায্য করবে। এ বইয়ের রচনাগুলি যখন জনকণ্ঠ সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখনই অনেক শুভানুধ্যায়ী এগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুরোধ জানান। প্রকাশের আগে জ্যোতির্বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ. আর. খান বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে নানা সুপরামর্শ দিয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

# সূচিপত্র


রঙিন ছবি ৯
মহাকাশে কী ঘটছে ১৭
পৃথিবী ছাড়ালেই চাঁদ ২৮
আমাদের কাছের পড়শিরা ৩৮
আরো দূরের অভিযাত্রা ৪৯
মাপজোখের উঁচুতলা নিচতলা ৬২
স্বর্গ-নরক কত দূর ৬৮
আকাশ জুড়ে তারার মেলা ৭৬
তারার ভিড়ে একটি তারা ৮৭
জন্ম-মৃত্যুর ভৈরব নৃত্য ৯৬
কৃষ্ণবিবরের অতল অন্ধকারে ১০৬
পড়শির খোঁজে দূরে কোথাও ১১৪
আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে ১২৩
শেষের সেদিন আসবে যখন ১৩৫
মহাকাশ নিয়ে মহাসঙ্কট ১৪২

পরিশিষ্ট ১৪৯
১: সৌরজগতের গ্রহদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য
২: মিটারের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা আর নামা
৩: কবে কী ঘটেছে বা ঘটবে
৪: কোন্ শব্দ কী বোঝায়

আমাদের সবচেয়ে কাছের পেঁচানো গ্যালাক্সি হল অ্যাণ্ড্রোমিডা। এর ব্যাস প্রায় ১.৩০ লক্ষ আলোক-বছর আর এটি আছে আমাদের থেকে ২৩ কোটি আলোক-বছর দূরে।

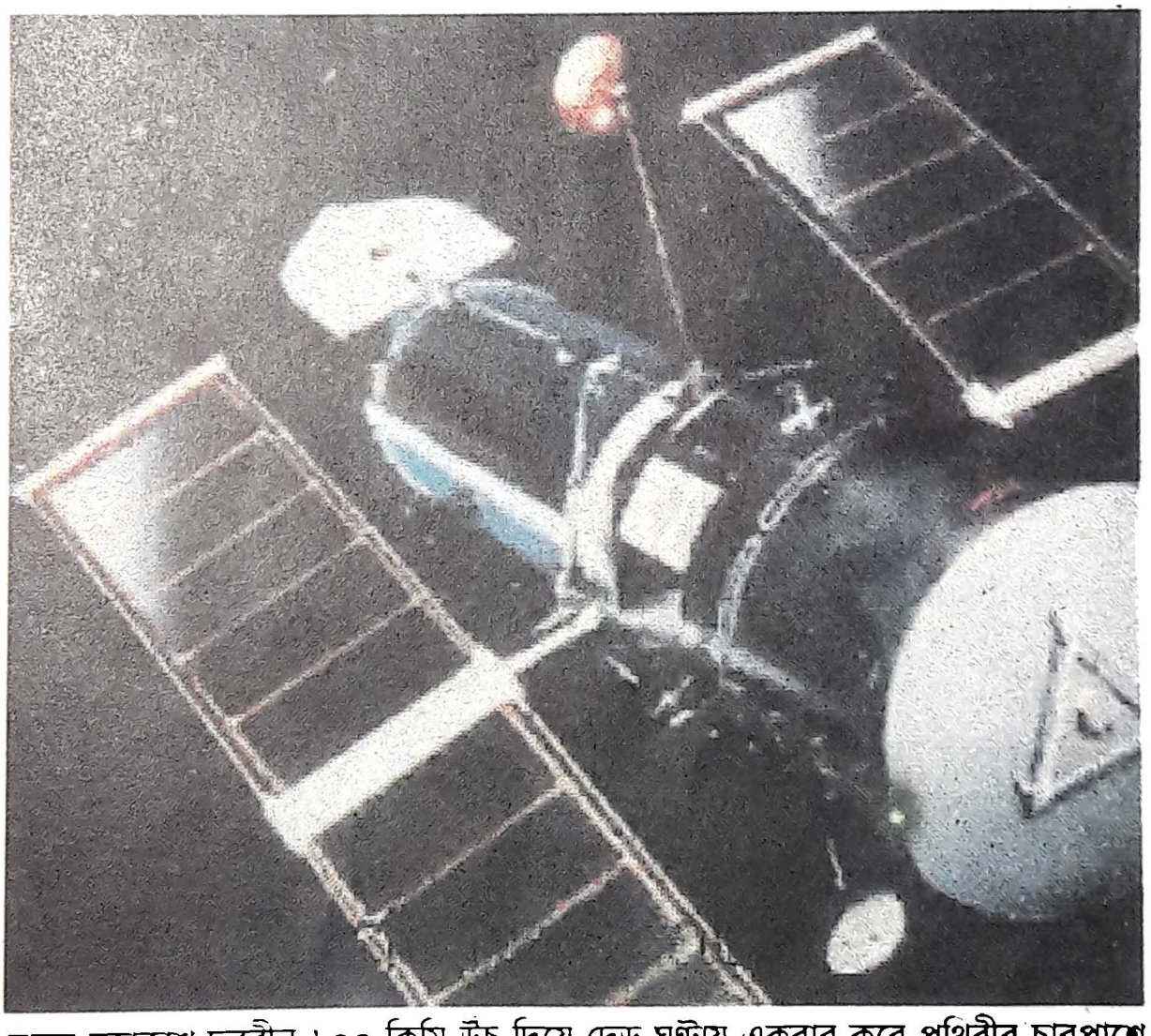

হাব্‌ল্ মহাকাশ দূরবীন ৬০০ কিমি উঁচু দিয়ে দেড় ঘণ্টায় একবার করে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে নভশ্চররা এর আয়না সমাবেশ মেরামত করে আসার পর এই দূরবীন থেকে পাওয়া যাচ্ছে অতি দূর মহাকাশের অনেক গোপন খবর।

প্রথম নভশ্চর ইউরি গাগারিন। সাধারণ এক কৃষকের সন্তান গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ভোস্তক নভোযানে মহাকাশে উঠে পৃথিবীর চারপাশে একপাক ঘুরে আসে

মহাকাশ থেকে নেয়া মঙ্গলগ্রহের ছবি। মাঝামাঝি আছে বিশাল খাদ—পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় খাদ গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের তুলনায় এটা চারগুণ গভীর, ছ'গুণ চওড়া আর দশগুণ লম্বা।

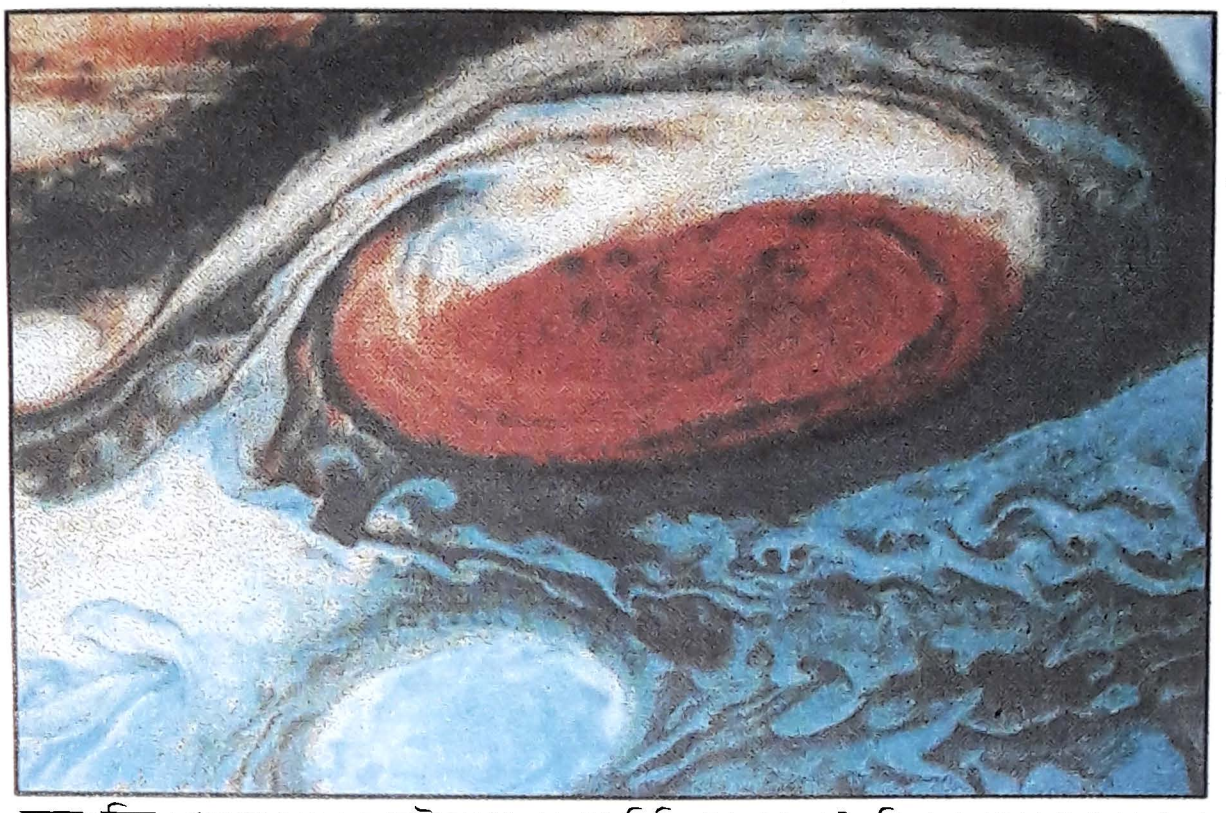

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল মূলত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরি; সামান্য মাত্রায় আছে অ্যামোনিয়া, মিথেন এসব গ্যাস। ওপরে ভাসে অ্যামোনিয়ার সাদা কেলাস আর নানা রঙের মেঘ। ভয়েজারের তোলা এক বিশাল লাল ঘূর্ণির এলাকার ছবি। এটি লম্বায় প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার; তার ভেতর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে গোটা তিনেক পৃথিবী।

নাসার বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তোলা লম্বা জীবাণুর মতো গড়নগুলোকে বলছেন মঙ্গলের মাটিতে ৩৬০ কোটি বছর আগের আদি প্রাণের নমুনা। এসব চওড়ায় মানুষের চুলের একশ ভাগের একভাগ—পৃথিবীতে এত পুরনো দিনের জীবাণুর চেয়ে হাজারগুণ ছোট। কিছু বিজ্ঞানী বলছেন এগুলো জীবের নমুনা না হয়ে অন্যভাবেও তৈরি হতে পারে।

মঙ্গলগ্রহের ওপর রয়েছে সৌরজগতের সবচেয়ে বিশাল আগ্নেয় পর্বত অলিম্পাস। এটা চওড়া ৬০০ কিলোমিটার আর উঁচু ২৫ কি.মি. অর্থাৎ এভারেস্টের চেয়ে তিনগুণ উঁচু।

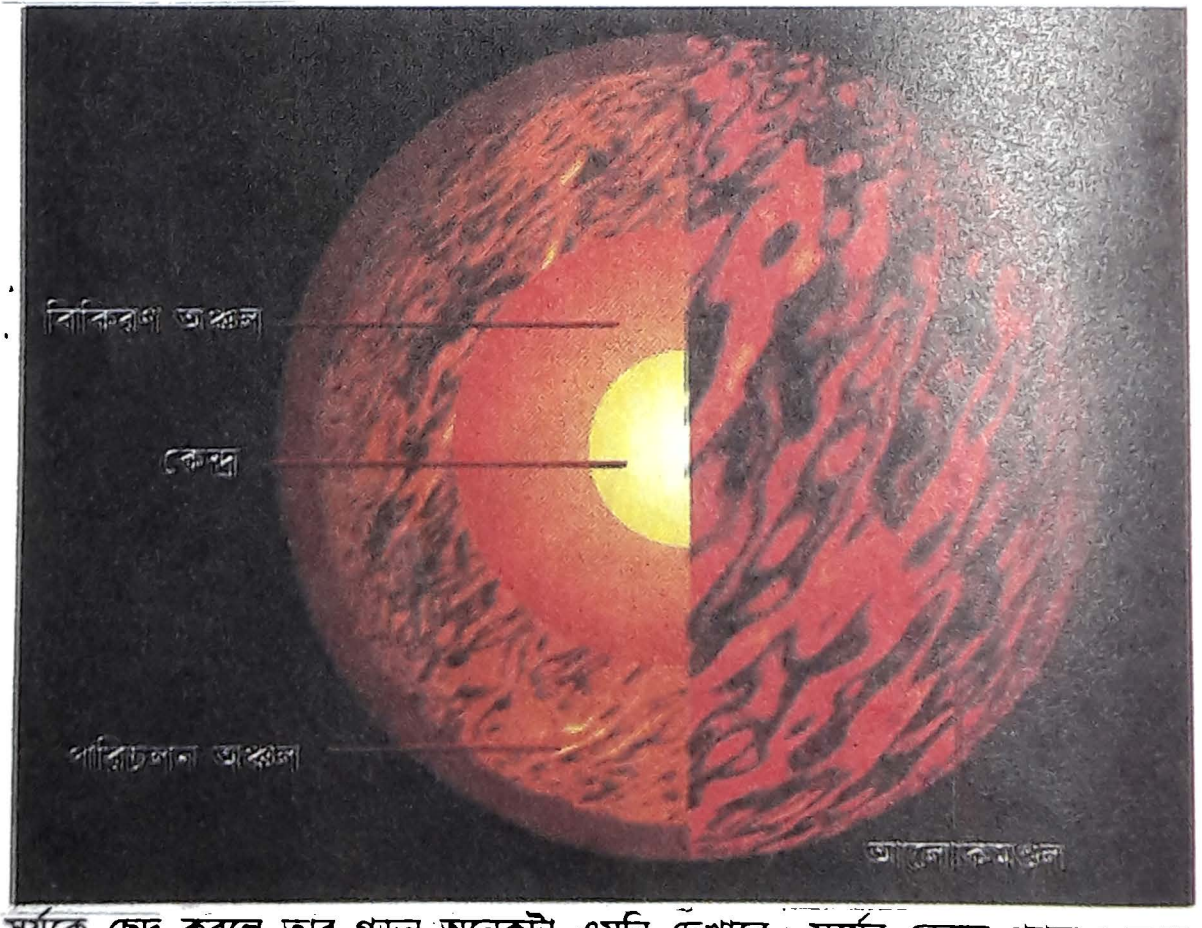


সুর্যকে ছেদ করলে তার গড়ন অনেকটা এমনি দেখাবে। সূর্যের কেন্দ্রে গ্যাসের ঘনত্ব পানির তুলনায় প্রায় ১৫০ গুণ আর তাপমাত্রা ১.৬ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লীয় সংযোজনের ফলে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়; তা থেকেই উদ্ভব তার বিপুল তেজের। বিকিরণ অঞ্চলে গ্যাসের ঘনত্ব মোটামুটি পানির ঘনত্বের মতো; উষ্ণতা প্রায় ২৫ লক্ষ ডিগ্রি সে.। পরিচলন অঞ্চলে ঘনত্ব প্রায় পানির এক দশমাংশ আর উষ্ণতা ২০ লক্ষ ডিগ্রি সে.। আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা মাত্র ৫,৫০০ ডিগ্রি সে.; ঘনত্ব পানির দশ লক্ষ ভাগের একভাগ।

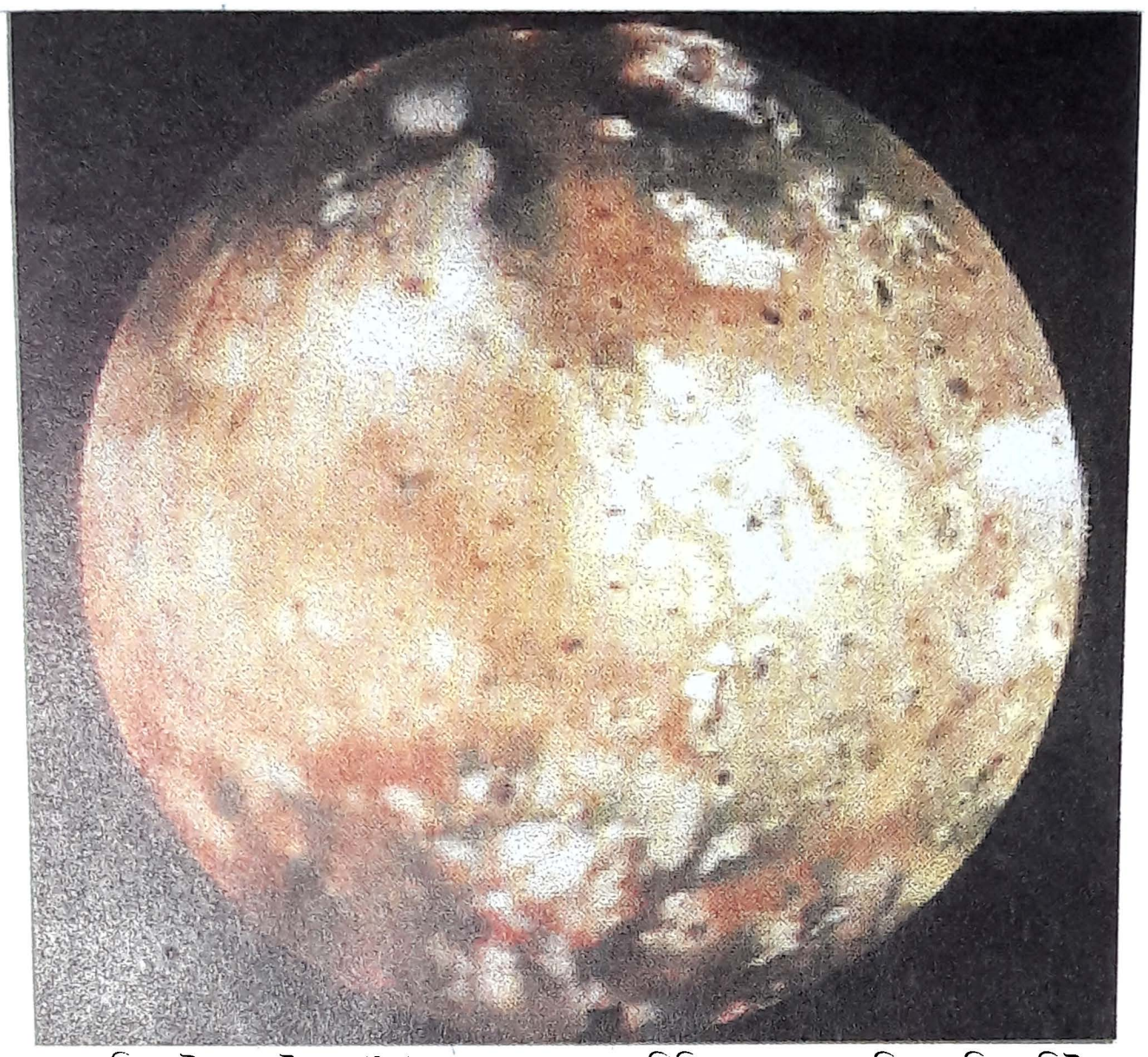

বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়ো (Io)-র গায়ের আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার উঁচুতে ফুঁসে উঠছে গন্ধক আর গন্ধক যৌগ; চারপাশে বইছে বিপুল লাভার স্রোত। ভয়েজার থেকে পৃথিবীর বাইরে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির হদিস এখানেই প্রথম পাওয়া গেল।

১৯৮০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়েজার নভোযান মহাকাশের বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছয় শনি গ্রহের কাছে;তখন শনি থেকে তার দূরত্ব ১২৮,০০০ কিলোমিটার (শিল্পীর চোখে)।

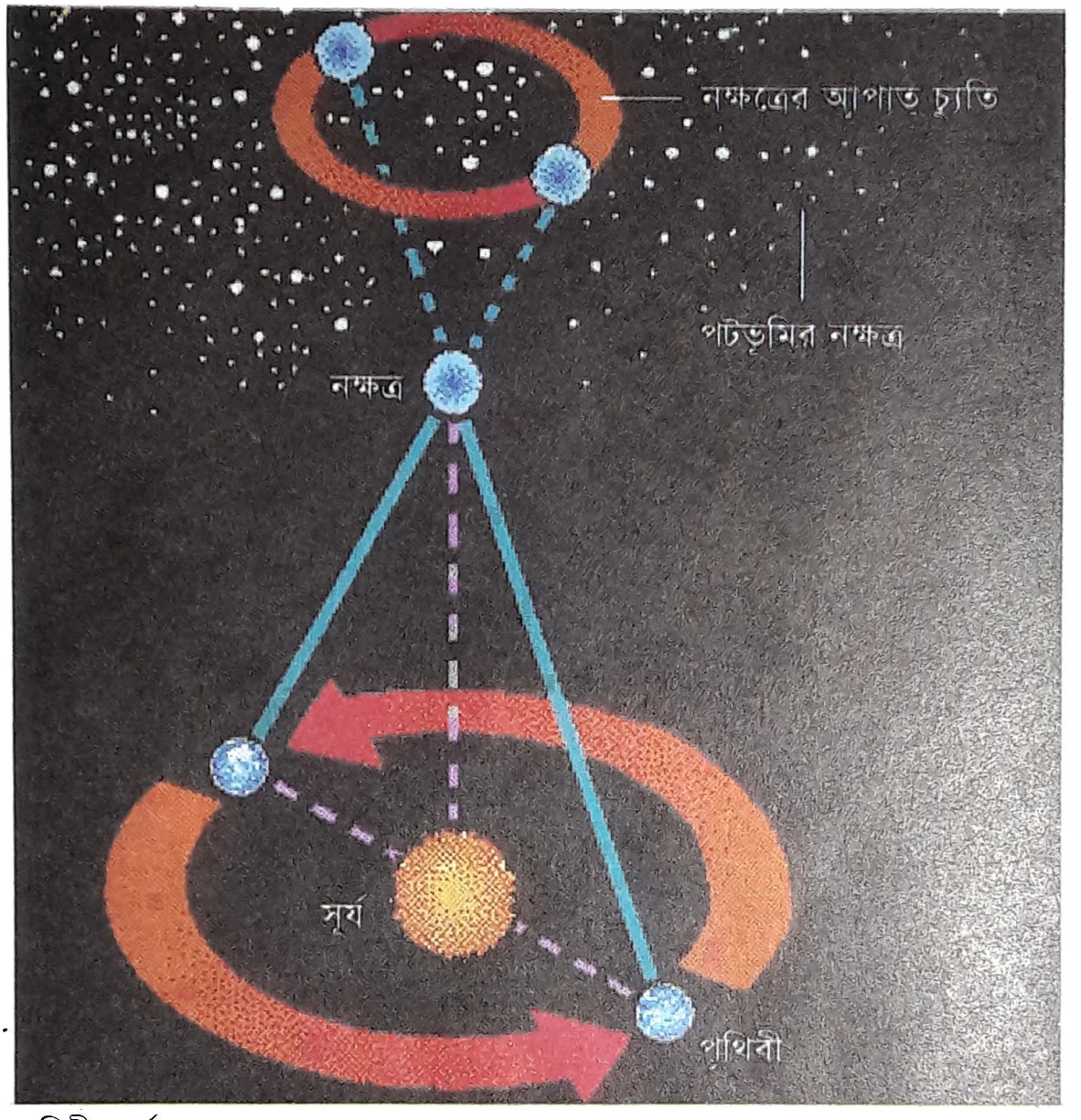


পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরার ফলে আকাশে দূরের তারার অবস্থান সরে যায় বলে মনে হয়। এই আপাত স্থানচ্যুতিকে বলা হয় প্যারালাক্স বিচ্যুতি বা দিগ্‌ভেদ বা লম্বন। পৃথিবী ছ'মাস পর তার কক্ষপথে বিপরীত দিকে গেলে দিগ্‌ভেদ সবচেয়ে বেশি হয়।

কালপুরুষের কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের মাঝখানে আছে কালপুরুষ নীহারিকা (এম৪২) নামের এই বিশাল গ্যাস আর ধুলোর পুঞ্জ। এর ভেতরে গোটা ছয়েক তারায় তৈরি 'ট্রাপেজিয়াম'–তারই আলোকে আলোকিত এই নীহারিকা। আর ভেতরে তৈরি হচ্ছে আমাদের সূর্যের মতো হাজার হাজার নতুন তারা।

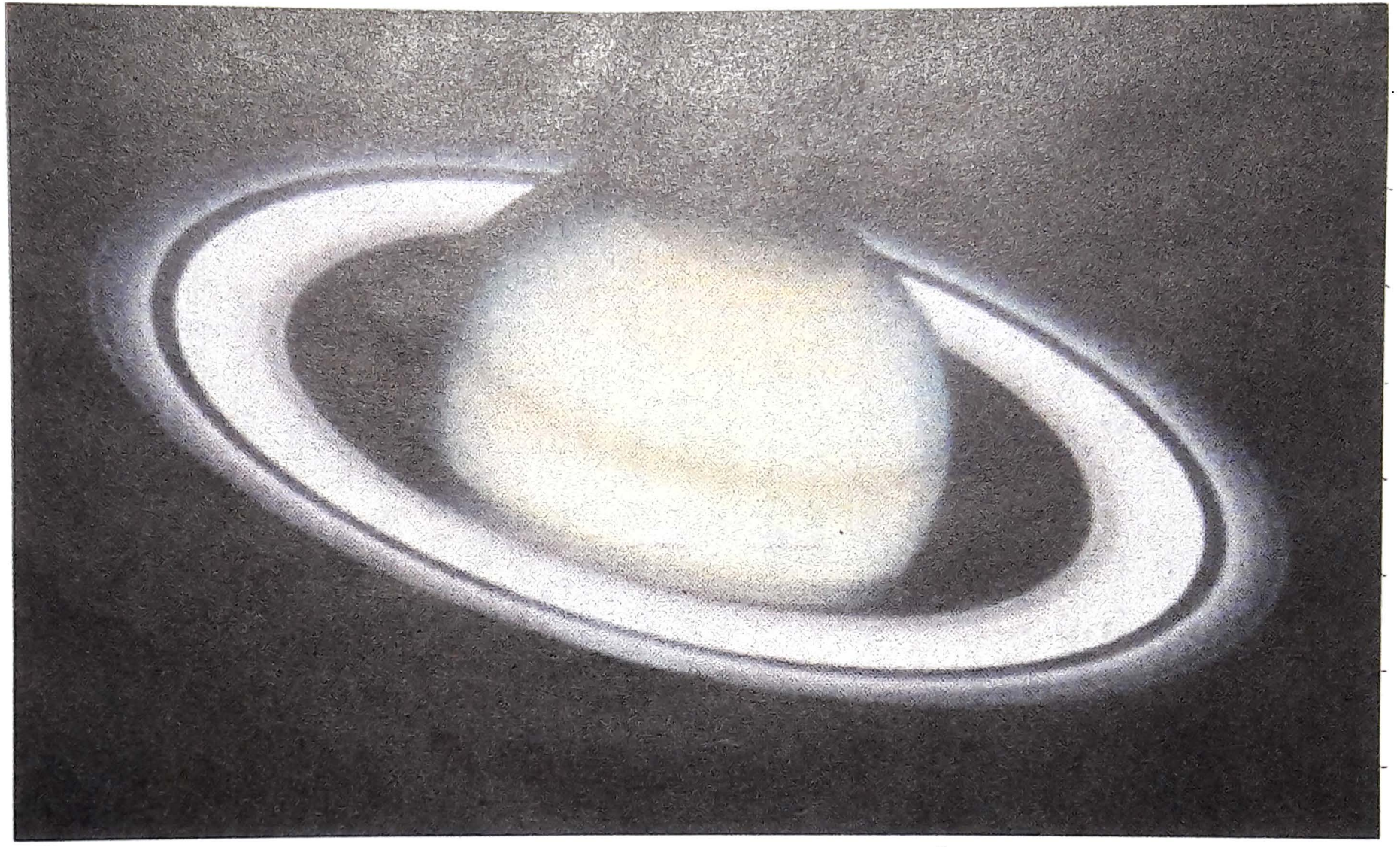

হাব্‌ল মহাকাশ দূরবীন থেকে তোলা শনিগ্রহের ছবি। শনির বলয়গুলো অতি চওড়া তবে পুরু খুব কম। ভয়েজার থেকে দেখা গেছে প্রায় লাখখানেক বলয়; বলয় সমাবেশের মাঝখানে ক্যাসিনির বিভেদ নামে যে ফাঁকা জায়গা সেটা প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার চওড়া।

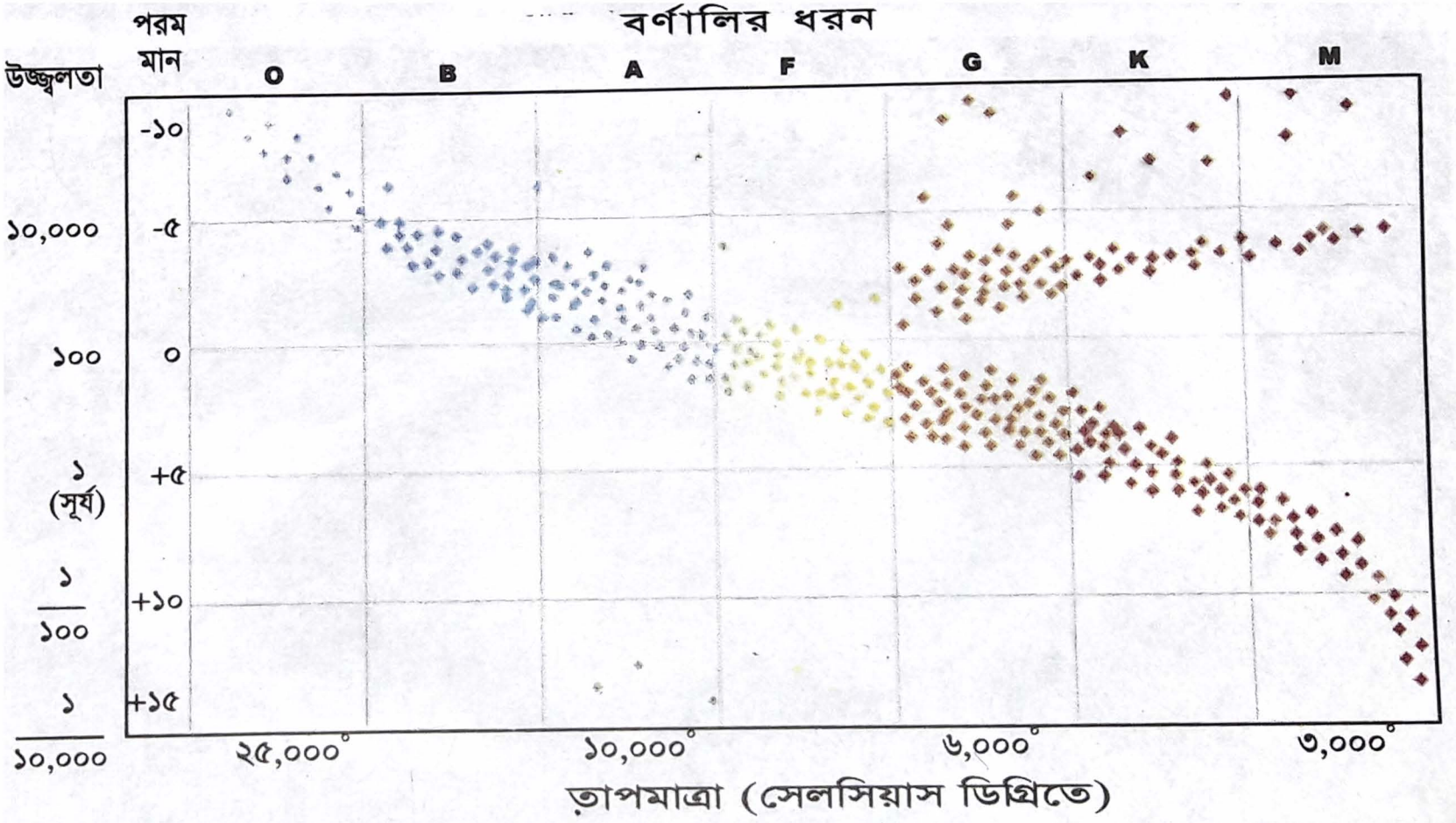


হের্ৎস্প্রুং-রাসেল নকশা থেকে তারার রঙ, উজ্জ্বলতা ও তাপমাত্রার মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক বোঝা যায়। নকশায় মূলধারার অতি উষ্ণ তারাদের রঙ নীল আর কম উষ্ণ তারাদের রঙ লালচে; লাল দানব তারাদের আকার বিশাল তবে তাপমাত্রা বেশ কম। আমাদের সূর্য রয়েছে এই দুই সীমার মাঝামাঝি। লেখচিত্রটি উদ্ভাবন করেন এইনার হের্ৎসপ্রুং (দিনেমার) ও হেনরি রাসেল (মার্কিন) নামে দু'জন জ্যোতির্বিদ।

# মহাকাশে কী ঘটছে

১৬০৯ সালে ইতালিতে গ্যালিলিও গ্যালিলেই প্রথম দূরবীনের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য সব জিনিস দেখেন; তখন মহাকাশের রহস্য সন্ধানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। এমনি আরেক নতুন যুগের সূচনা হয় যখন ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম স্পুৎনিক আকাশে ওড়ে। মানুষের পাঠানো সেই প্রথম নভোযানটি ছিল অতি ছোট; কিন্তু দেখতে দেখতে তার আকার বাড়তে থাকে। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ইউরি গাগারিন নামে এক দুঃসাহসী তরুণ বৈমানিক রকেট যানে চেপে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে আসে।

তারপর থেকে শুধু পৃথিবীর চারপাশে নয়, সৌরজগতের দিকে দিকে নভোযানের সাহায্যে মানুষের অভিযাত্রা এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালে মানুষ গিয়ে পৌঁছেছে চাঁদে; সেখানে বসানো হয়েছে মহাকাশ সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। নভোযানে চেপে মানুষ মাসের পর মাস – এমন কি এক বছরের বেশি সময় – কাটিয়েছে মহাকাশে; সেখানে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। নভোযানে সে নানা বিশেষ ধরনের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বসিয়ে রেখেছে আকাশের অনেক উঁচুতে। সেসব থেকে অনবরত নানা তথ্য এসে পৌঁছচ্ছে পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে।

মহাকাশ গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ হল সত্তর আর আশির দশকে ভয়েজার নভোযানের অভিযান। ১৯৭৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে 'ভয়েজার' বা অভিযাত্রী নামে যে দুটি নভোযান বৃহস্পতি গ্রহের দিকে পাঠানো হয় সেগুলো ১৯৮০-৮১-তে শনি, ১৯৮৬-তে ইউরেনাস আর ১৯৮৯ সালে নেপচুন গ্রহের পাশ দিয়ে যায়। তারপর প্লুটোর কক্ষপথ পেরিয়ে পাড়ি জমায় সৌরজগতের আরো অতি দূর প্রান্তে। এসব নভোযান থেকে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুনের আশ্চর্য স্পষ্ট ছবি পাওয়া গিয়েছে; অনেকগুলো নতুন উপগ্রহের খোঁজ মিলেছে; জানা গেছে আরো বহু আশ্চর্য, অজানা তথ্য। এমনি নানা পদ্ধতিতে মহাকাশের তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা জানতে চাইছেন কিভাবে এই সৌরজগতের উৎপত্তি হল; কী হবে এর পরিণতি। এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতি সম্বন্ধেও জানতে চাইছেন তাঁরা। আর এসব অনুসন্ধানের জন্য উদ্ভাবন করছেন নানা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি।

## আরো শক্তিশালী দূরবীন

গ্যালিলিও যে দূরবীনের সাহায্যে চাঁদের গায়ের এবড়ো-খেবড়ো খাদ দেখেছিলেন তার 'চোখ' চওড়ায় ছিল মাত্রই ২·৫ সেমি (এক ইঞ্চি)। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে কিছুদিন আগ পর্যন্তও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চালু দূরবীন ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালোমার-এ; তার নাম হেল (Hale) দূরবীন। এর প্রতিফলক ৫ মিটার (২০০ ইঞ্চি) চওড়া (সত্তরের দশকে সাবেক সোভিয়েতের জেলেনচুকস্কায়ায় ৬ মিটার বা ২৩৬ ইঞ্চি মাপের একটি দূরবীন চালু হয়েছিল কিন্তু সেটি তেমন ভাল কাজ করেনি)। ১৯৯৩ সালে হাওয়াইয়ের মাউনা কিয়া (Mauna Kea) পর্বতের ৪,২০০ মিটার উঁচুতে বসানো হয়েছে কেক (Keck) দূরবীন; এর প্রতিফলক আয়না সমাবেশ ১০ মিটার (৩৮৭ ইঞ্চি) চওড়া। অর্থাৎ এতে আগের সব দূরবীনের চেয়ে নক্ষত্রের অনেক বেশি পরিমাণ আলো ধরা যায়। তাই এটি দিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি নক্ষত্রের হদিস করা যাচ্ছে।

নক্ষত্রজগতের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গত ক'বছরে অনেক নতুন ধরনের পরিমাপের যন্ত্রপাতি মহাকাশে বসানো হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৯০ সালে স্থাপন করা হয়েছে হাব্‌ল্ নামে মহাকাশ দূরবীন। হাব্‌ল্ দূরবীনের প্রতিফলকের মাপ পৃথিবীর ওপরকার বিশাল দূরবীনগুলোর তুলনায় ছোট — মাত্র ২·৪ মিটার (৯৫ ইঞ্চি)। কিন্তু এটি পৃথিবীর ৬০০ কিলোমিটার ওপর দিয়ে যে কক্ষপথে ঘোরে সেখানে বাতাস নেই বললেই চলে। তাই হাব্‌ল-এ পৌঁছায় নক্ষত্রলোকের অবিকৃত বিকিরণ। এই দূরবীন তৈরির কিছুটা ত্রুটির জন্য এটি পুরো শক্তিতে কাজ করছিল না। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একদল নভশ্চর শাট্‌ল্ যানে করে এক দুঃসাহসিক অভিযানে মহাকাশে গিয়ে এর প্রতিফলক আয়না সমাবেশ মেরামত করে এসেছেন। পৃথিবীর ওপরকার সবচেয়ে ভাল দূরবীনের চেয়ে হাব্‌ল্-এর ছবি দশগুণ বেশি স্পষ্ট ; তাই এসব অতিসূক্ষ্ম ছবি মহাকাশের আরো গভীর রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করছে।

মহাকাশে বসানো এসব দূরবীনের সঙ্গে আজ যোগ হয়েছে পৃথিবীর ওপর বসানো নানা ধরনের বেতার দূরবীন। পৃথিবীতে প্রথম বড় আকারের বেতার দূরবীন বসানো হয় বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে জডরেল ব্যাঙ্ক-এ ১৯৫৭ সালে ; এর ডিশের ব্যাস ৭৬ মিটার (২৫০ ফুট); কিন্তু এটাকে এদিক-ওদিক ঘোরানো যেত না। পুরোপুরি ঘোরানো যায় এমন বড় বেতার দূরবীন বসানো হয় জার্মানির ইফেল্‌স্‌বার্গ-এ ১৯৭১ সালে; এই দূরবীনের ব্যাস ১০০ মিটার (৩২৮ ফুট)। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেতার দূরবীনের ডিশ ৩০৫ মিটার (১০০০ ফুট): এটা বসানো আছে পোর্টো রিকোর আরেসিবোতে একটি পাহাড়ের উপত্যকায়।

বেতার দূরবীনের ক্ষমতা বাড়াবার একটা উপায় হল কয়েকটা ডিশে ধরা সংকেতকে এমনভাবে একসঙ্গে জুড়ে দেয়া যেন একটা খুব বড় ডিশের মতো ফলাফল পাওয়া যায়। এ জাতের এক ধরনের বেতার দূরবীনের নাম হল Very Large Array (VLA) বা অতি বিশাল-বিন্যাস দূরবীন। এতে অনেকগুলা ডিশ-অ্যান্টেনার মতো বেতার গ্রাহক একযোগে সাজানো থাকে ইংরেজি Y অক্ষরের আকারে; এগুলো অতিদূর নক্ষত্র থেকে আসা বেতার তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। নিউ মেক্সিকোতে এমনি এক বেতার দূরবীন আছে— তাতে ২৫ মিটার (৮২ ফুট) ব্যাসের ২৭টা ডিশ একসঙ্গে করা হয়েছে Y অক্ষরের মতো; তাতে যে ছবি পাওয়া যায় তা একটি ডিশ থেকে পেতে হলে ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) চওড়া ডিশের দরকার হত। আরেক রকম বেতার দূরবীনের নাম হল Very Long Baseline Interferometer (VLBI)। এতে পৃথিবীর নানা অংশে

## পৃথিবীর কয়েকটি বড় আকারের দূরবীন

| মানমন্দির | অ্যাপারচার (ইঞ্চির মাপে) |
|---|---|
| **প্রতিফলক দূরবীন** | |
| কেক দূরবীন, মাউনা কিয়া, হাওয়াই | ৩৮৭ |
| জেলেনচুকস্কায়া (রাশিয়া) | ২৩৬ |
| পালোমার, ক্যালিফোর্নিয়া (হেল প্রতিফলক), ১৯৪৮ | ২০০ |
| লা পালামা, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ (উইলিয়াম হার্শেল প্রতিফলক) | ১৬৫ |
| সেরো তলোলো, চিলি | ১৫৮ |
| কিট পীক, অ্যারিজোনা | ১৫৮ |
| লা সিলা, চিলি | ১৫৮ |
| লা সিলা, চিলি (নতুন প্রযুক্তি দূরবীন) | ১৫৮ |
| সাইডিং স্প্রিং, অস্ট্রেলিয়া (ব্রিটিশ-অস্ট্রেলিয়া দূরবীন) | ১৫৩ |
| মাউন্ট স্ট্রমলো, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া | ১৫০ |
| মাউনা কিয়া, হাওয়াই (ব্রিটিশ অবলাল রশ্মি দূরবীন) | ১৫০ |
| মাউনা কিয়া, হাওয়াই (কানাডা ফ্রান্স হাওয়াই দূরবীন) | ১৪৩ |
| **প্রতিসরক দূরবীন** | |
| ইয়ের্কস্, উইলিয়ম্স্ বে, আমেরিকা | ৪০ |
| লিক, ক্যালিফোর্নিয়া | ৩৬ |

বসানো বেতার দূরবীনের তথ্যকে কম্পিউটারের সাহায্যে সমন্বিত করা হয় আর তার ফলে দূরবীনের বেতার-চোখ চওড়া হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর ব্যাসের সমান

অর্থাৎ প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার। এই ব্যবস্থায় একটি চুলের ব্যাস মাপা যেতে পারে আশি কিলোমিটার দূর থেকে।

এই শতাব্দীর বিশের দশকে মানুষ প্রথম জানতে পেরেছে আমাদের সৌরজগৎ মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ নয়, আসলে এটা ছায়াপথ গ্যালাক্সির অংশ। এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি সূর্যের মতো প্রায় ৪০,০০০ কোটি তারার বিশাল এক পুঞ্জ বুকে নিয়ে গাড়ির চাকার মতো ক্রমাগত নিজ কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। সূর্য আছে এক লক্ষ আলোক-বছর চওড়া এই চাকার কিছুটা কিনার ঘেঁষে – কেন্দ্র থেকে মোটামুটি ৩০,০০০ আলোক-বছর দূরে। আমাদের সূর্য আর এর কাছাকাছি অন্য নক্ষত্ররা ঘণ্টায় প্রায় ৮০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে প্রায় ২৫ কোটি বছরে একবার এই গ্যালাক্সি-চাকার চারপাশ ঘুরে আসছে।

এই ছায়াপথই যে পুরো মহাবিশ্ব নয়, বরং মহাবিশ্বে আছে ছায়াপথের মতো আরো অসংখ্য গ্যালাক্সি – একথা জানা গেছে আরো অনেক পরে। আজ আমরা জানি, আমাদের গ্যালাক্সির আশপাশে শ'খানেক গ্যালাক্সি মিলে তৈরি হয়েছে গ্যালাক্সির এক 'স্থানীয় দল'; এই দলে আমাদের এক কাছাকাছি সদস্য হল ২৩ লক্ষ আলোক-বছর দূরে অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি। রাতের আকাশে একে পৃথিবী থেকে খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। এই অ্যাণ্ড্রোমিডার যে আলো আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি তা যখন সেখান থেকে রওনা দিয়েছিল তখন আফ্রিকার বুক থেকে মানব প্রজাতি কেবল হাঁটি হাঁটি পা পা করে পৃথিবীর নানা দিকে অভিযাত্রা শুরু করেছে। আমাদের স্থানীয় দল থেকে বহু দূরে রয়েছে একটি বিশাল গ্যালাক্সি দল; তার নাম কন্যা স্তবক (Virgo Cluster)। এটি আছে প্রায় পাঁচ কোটি আলোক-বছর দূরে; আর এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ২,৫০০।

বিজ্ঞানীরা আজ দেখছেন, আমাদের থেকে দূরের কিছু গ্যালাক্সি কাছাকাছি অন্য গ্যালাক্সিকে যেন গিলে খাচ্ছে। হয়তো আমাদের গ্যালাক্সিও এমনি কাছের অন্য গ্যালাক্সিদের গিলে খাবার উপক্রম করছে। আর এক আশ্চর্য নতুন আবিষ্কার হল আমাদের গ্যালাক্সি এবং কাছাকাছি অন্য গ্যালাক্সিরা যেন কোন অদৃশ্য শক্তির টানে আরো দূরের কোন গন্তব্যের দিকে বিপুল বেগে ছুটে চলেছে। সে টানের উৎসটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি; তবে এটা বোঝা গেছে যে, তার ভর হবে অন্তত ২০০ কোটি কোটি (২-এর পর ১৬টি শূন্য) সূর্যের সমান।

নতুন ধরনের নানা দূরবীনের সাহায্যে আমাদের গ্যালাক্সির ভেতরের ঘন নক্ষত্রসমাবেশের ধোঁয়াটে এলাকার দিকে আজ বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি দিতে পারছেন। মনে হচ্ছে সেখানে এক বিশাল কৃষ্ণবিবর ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার গ্যালাক্সির সমাবেশ দেখা যাচ্ছে মোটেই সুষম নয়, কিছু বিশাল রকম ফাঁকা জায়গা রয়েছে

যেখানে তেমন কোন বস্তু নেই। গ্যালাক্সিরা মহাকাশে সমানভাবে না ছড়িয়ে এমন বিশাল সব ফাঁকা জায়গা কেন তৈরি হল তার এখনও হদিস মেলে নি। আরো গভীর রহস্য সৃষ্টি হয়েছে অদৃশ্য বস্তু নিয়ে; যেন গ্যালাক্সিগুলোর চারপাশে রয়েছে বিশাল সব অদৃশ্য বস্তুর চক্র। মনে হচ্ছে মহাবিশ্বের মাত্র শতকরা একভাগ বস্তু এযাবৎ মানুষের হিসেবের মধ্যে এসেছে, বাকি ৯৯ ভাগই অদৃশ্য বস্তু, সেগুলো এখনও রয়েছে মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

## অদৃশ্য রশ্মির জগৎ

আকাশে আমরা যেসব তারা দেখি সেগুলো আসলে ছায়াপথ গ্যালাক্সি নামে যে তারাপুঞ্জে আমাদের সূর্য রয়েছে তারই অংশ। আগেই বলেছি, আমাদের এই তারাপুঞ্জে আছে প্রায় ৪০,০০০ কোটি তারা। আর মহাবিশ্বে এমনি তারাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি আছে অন্তত ১০,০০০ কোটি। তাহলে মহাবিশ্বে মোট তারার সংখ্যা কত সেটা হিসেবে পটু পাঠকদের জন্য একটা চমৎকার ধাঁধা হতে পারে। আমাদের এই মহাবিশ্ব আজ এমন বড় হয়ে উঠেছে যে, এর দূরত্ব হিসেব করা হয় আলোর বেগ দিয়ে। আলো প্রতি সেকেণ্ডে যায় মোটামুটি তিন লক্ষ কিলোমিটার; অর্থাৎ বছরে প্রায় সাড়ে ন'লক্ষ কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্বকে বলা হয় এক আলোক-বছর।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল তাও বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করেছেন। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী মহাবিশ্বের শুরু আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে; তখন একটা পরমাণুর চেয়েও বহু লক্ষগুণ ছোট এক বিপুল শক্তিধর বিশ্বডিম্ব থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল এ মহাবিশ্বের। এই অতি উত্তপ্ত বিশ্বডিম্ব অকস্মাৎ প্রবলভাবে প্রসারিত হতে আরম্ভ করে আর এই বিস্তারের ফলে সেটা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়; তা থেকে বস্তুকণা রূপ পেতে থাকে – সৃষ্টি হয় আদি বস্তুকণা হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের উপাদান। এসব বস্তু শেষ পর্যন্ত জোট বেঁধে তৈরি হয়েছে গ্যালাক্সিগুলো আর তার ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে তারাদের।

এই যে তারার দল তার মধ্যে আছে আবার নোভা (Nova) বা নবতারা ; এমনি নবতারা অকস্মাৎ আকাশে দপ করে জ্বলে ওঠে আর দেখা যায় বেশ কিছুদিন ধরে। বিজ্ঞানীরা আজ জানতে পেরেছেন, আমাদের সূর্য এক লাখ বছরে যত শক্তি বিলায় একটি নবতারা মাত্র এক বছরে বিলিয়ে দিতে পারে ততখানি শক্তি। তারার অন্তিম সময়ে একটি তারা পরিণত হতে পারে সুপারনোভা (Supernova) বা অতিনবতারায়; তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তারার বস্তু প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। আর এ অবস্থায় তার তেজের বিকিরণ বেড়ে উঠতে পারে দশ লক্ষগুণ বেশি। শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে বিজ্ঞানীরা আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি বছরই

দু'চারটি করে নবতারার হদিস পাচ্ছেন। তার চেয়ে অনেক বেশি অবশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মহাকাশের অতি দূর এলাকায় আছে রহস্যময় কোয়াসার (Quasar) বা নক্ষত্রসদৃশ বস্তুরা; তাদের একেকটি যে পরিমাণ তেজ বিকিরণ করে তা কয়েক হাজার গ্যালাক্সির সমান।

মহাবিশ্ব দিয়ে যে নিরন্তর বিপুল শক্তির আনাগোনা তার বেশির ভাগ মানুষের চোখে আদৌ ধরা পড়ে না; তার কারণ সে তেজের বিকিরণ ঘটে মানুষের চোখে অদৃশ্য নানা রকম রশ্মির আকারে। যেমন তরুণ বয়সী অতি উত্তপ্ত নবতারা তার শক্তি বিলায় প্রধানত অতিবেগুনি, এক্স-রশ্মি আর গামারশ্মির আকারে। অপেক্ষাকৃত শীতল, অদৃশ্য বস্তুরা সাধারণত তাদের তেজ বিকিরণ করে অবলাল রশ্মিতে। বেতার তরঙ্গ – যাতে তেজ থাকে সবচেয়ে কম – সৃষ্টি হয় অতিমাত্রায় বিক্ষোভময়, সংঘাতশীল তারাদের গা থেকে; সেসব তরঙ্গও মানুষের চোখে কোন সাড়া জাগায় না। আজ বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের দূরবীন ব্যবহার করে – বিশেষ করে মহাকাশে বসানো নভোযানের সাহায্যে – এসব অদৃশ্য রশ্মির আশ্চর্য এক নতুন জগতের হদিস করতে পারছেন।

মহাকাশে তারাদের পৃথিবী থেকে দেখতে যত কাছাকাছিই মনে হোক আসলে তাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে বহু আলোক-বছরের ব্যবধান। তাতে মনে হতে পারে মহাবিশ্বের বেশির ভাগ ফাঁকা জায়গা বুঝি অতি শীতল আর নিস্তরঙ্গ। কিন্তু আসলে সারা মহাকাশ জুড়ে চলেছে শক্তির বিপুল দাপাদাপি; নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ক্রমাগত ছিটকে উঠছে বিপুল পরিমাণ বস্তুরাশি। কোথাও ছত্রখান হয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে কোন তারা; তাতে চারপাশে ঘাত-তরঙ্গ ছুটছে বিপুল বেগে আর মহাকাশের আন্তঃনাক্ষত্র গ্যাস তেতে উঠছে বহু লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।

## নবতারা আর অতিনবতারা

নবতারার সূচনা হয় সচরাচর যুগলতারা থেকে। যুগলতারা হল আমাদের সূর্যের মতো আকারের দুটি তারা, যারা রয়েছে পরস্পরের খুব কাছাকাছি আর ঘুরছে পরস্পরের সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারপাশে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্বে একক তারার চেয়ে যুগলতারার সংখ্যাই বেশি। যুগলতারার দুটি তারার মধ্যে একটি হয়তো নিজের সবটা হাইড্রোজেন জ্বালিয়ে ফেলল। তার আকার যদি হয় আমাদের সূর্যের মতো তাহলে সেটা প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে ফেঁপে উঠতে থাকে; তারপর হয়ে দাঁড়ায় বিশাল লাল দানবতারা। তারপর এটা জ্বালাতে থাকে তার হিলিয়াম; এই হিলিয়ামও যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন সেটা চুপসে গিয়ে হয়ে পড়ে আমাদের পৃথিবীর আকারের ছোট একটি বামনতারা। এভাবে

চুপসে যাবার সময় প্রচণ্ড অন্তর্মুখী চাপে এর ভেতরকার গ্যাসগুলোর প্রকৃতি যায় বদলে। তখন সে গ্যাসের গড়ন হয়ে পড়ে অনেকটা ধাতুর মতো; তাপ পেলে তা আর দ্রুত প্রসারিত হতে পারে না। এ ধরনের বামনতারাদের ওপরকার ঘনত্ব হয় সূর্যের গায়ের ঘনত্বের চেয়ে কোটিগুণ বেশি। আর তার কেন্দ্রবস্তু অতিমাত্রা চাপে কেলাসিত কার্বনে পরিণত হয়। অর্থাৎ বামনতারার একেবারে মাঝখানে থাকে সম্ভবত একটি বিশাল আকারের হীরার খণ্ড।

এধরনের বামনতারা আর তার সঙ্গী পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বামনটি তার তীব্র মাধ্যাকর্ষের টানে সঙ্গীর গা থেকে গ্যাস শুষে তুলে নিতে থাকে। সে গ্যাস বামনের চারপাশে ঘুরপাক খায় আর ক্রমে ক্রমে তার গায়ে জমতে থাকে। বামনের চারপাশে ঘূর্ণায়মান এসব গ্যাসের বেগ হতে পারে প্রতি সেকেণ্ডে ৫,০০০ কিলোমিটার আর বামনের গায়ের সঙ্গে ঘষা খেয়ে তার তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে পারে এক কোটি ডিগ্রি বা তারও বেশি। এমন বিপুল তাপে সে তারার বাইরের দিকের গ্যাসে হাইড্রোজেন বোমার মতো পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়। বলতে গেলে একটা মরা তারার চারপাশে এক নতুন তারার জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই নতুন তারার সৃষ্টি কিছু সময়ের জন্য এক বিপুল শক্তি উদ্গারের রূপ নেয়; তখনই সেটা আকাশে দেখা দেয় উজ্জ্বল নবতারা হিসেবে।

বিজ্ঞানীদের এসব নবতারার খোঁজাখুঁজির একটা বিশেষ কারণ আছে। আমরা পৃথিবীতে যে নানা মৌলিক আর যৌগিক বস্তু দেখি তার বেশির ভাগেরই সৃষ্টি এমনি সব নবতারার বুকে। আদতে মহাবিশ্বের যখন সৃষ্টি হয় সেই 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণে শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের মতো সরল পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছিল; হালকা মৌলগুলোর সৃষ্টি হয়েছে মূলত তারার বুকে, তারপর নবতারা বা লাল দানবের বিস্ফোরণের সময় সেসব ছিটকে পড়েছে চারদিকে। ভারি মৌলগুলোর সৃষ্টি কোনো অতিনবতারার বিস্ফোরণে। আমাদের দেহ যেসব উপাদানে তৈরি তাদেরও সৃষ্টি কোনো তারার বুকে। অনেকটা এধরনের কথাই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন 'পত্রপুট' (১৯৩৬)-এ তাঁর কাব্যের ভাষায় :

*বলি – হে সবিতা*
*তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়*
*রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।*

পৃথিবী থেকে আমাদের গ্যালাক্সিতে অতিনবতারার দেখা মেলে সচরাচর তিনশ বছরে মাত্র একবার। তখন একটি প্রায় অদৃশ্য তারা অকস্মাৎ জ্বলে উঠে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হয়ে ওঠে। এর আগে এমনি অতিনবতারা দেখা দিয়েছিল ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে; কাজেই এর মধ্যে আরেকটা দেখা দেবার সময় হয়ে

এসেছে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময় যে বেথ্‌লেহেমের তারা দেখা গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেটিও ছিল একটি অতিনবতারা। অতিনবতারা আসলে নবতারারই অতি বিশাল রূপ। তাদের মধ্যে আবার আছে দুটো জাত। প্রথম জাতের যারা তাদের শুরু মোটামুটি সাধারণ নবতারার মতোই; তবে তাতে প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর আসে আরো অনেক বড় আকারের অতিনবতারার বিশাল বিস্ফোরণ।

আমাদের গ্যালাক্সিতে অতিনবতারা খুব কম দেখা যায় বলে দূরের অন্য গ্যালাক্সিতে এদের খুঁজতে হয়। ১৯৮১ সালে একটি খুব উজ্জ্বল অতিনবতারা আবিষ্কার করেছিলেন একজন রুশ জ্যোতির্বিদ – প্রায় পাঁচ কোটি আলোক-বছর দূরের একটি গ্যালাক্সিতে। বিজ্ঞানীরা দু'বছর ধরে একে পর্যবেক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেন। তারপর বললেন, সম্ভবত এটিও একটি যুগলতারা; বামন অবস্থায় তার সঙ্গীর গা থেকে গ্যাসীয় বস্তু শুষে নিয়ে এটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একসময় এর তাপমাত্রা এমন বেড়ে ওঠে যে, শুধু বাইরের অংশ নয়, এর ভেতরের সমগ্র কেন্দ্রবস্তু পর্যন্ত জ্বলে উঠে প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হয়েছে। তাই তা থেকে এমন আতশবাজির মতো আলোর উদ্গীরণ।

প্রথম জাতের অতিনবতারা তৈরি হয় মূলত বামনতারার মৃত্যুর ফলে আর দ্বিতীয় জাতের অতিনবতারা তৈরি হয় দানবতারার মৃত্যুর সময় হলে। এমনি দানবতারার ভর হয় সাধারণত আমাদের সূর্যের চেয়ে মোটামুটি আট থেকে বিশগুণ বেশি; এদেরই বুকে মূলত হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের কাঁচামাল থেকে কার্বন, অক্সিজেন এমনি সব অপেক্ষাকৃত ভারি মৌল তৈরি হয়। আর এই তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বোমার মতোই বিপুল শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে।

দানবতারার রসুইখানায় রাসায়নিক সংশ্লেষে তারার কেন্দ্র পুড়তে পুড়তে শেষমেশ প্রায় পুরোটাই লোহায় পরিণত হয়। এভাবে লোহা তৈরি হবার সময় তারার জ্বালানির পুঁজি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়; দানবতারার বস্তু তখন ধসে পড়ে। কিন্তু ধসে পড়তে গিয়ে যে শক্তি ছাড়া পায় তাতেই সে দানব বিপুল শক্তিতে ছত্রখান হয়ে চারপাশে ছিটকে ওঠে। এই বিস্ফারণের সময়ই সৃষ্টি হয় ইউরেনিয়াম এবং আরো সব ভারি ধাতু। এরপর তারার যে শবদেহ পড়ে থাকে তা হয়ে দাঁড়ায় ঘুরপাক খেতে থাকা অতি ঘনীভূত নিউট্রন তারা। বিদ্যুৎহীন নিউট্রন কণারা অতিনবতারার ধসেও ধ্বংস হয়ে যায় না; বরং তারা এমন ঘন হয়ে পিণ্ড বাঁধে যে, তার এক চামচ বস্তু হয়ে ওঠে বহু কোটি টন ভারি। নিউট্রন তারার এই অতি ছোট পিণ্ডে মূল তারার পুরো চৌম্বকক্ষেত্র ঘনীভূত হয়। তার ফলে এই ঘুরন্ত নিউট্রন তারার দুই চৌম্বক-মেরু থেকে তীব্র আয়নিত কণার ধারা বেরোতে

থাকে। তারার চৌম্বকমেরু যখন পৃথিবীমুখো হয় তখন তার স্পন্দনশীল তীব্র বেতাররশ্মির ঝলক পৃথিবী থেকে আঁচ করা যায়। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন পালসার (Pulsar) বা স্পন্দমান তারা। বৃষরাশিতে কর্কট নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছিল ১০৫৪ সালে এক অতিনবতারার বিস্ফোরণে। তার শবদেহ যে নিউট্রন তারায় পরিণত হয়েছে তা আজো এমন তেজী রয়েছে যে, সেটা প্রতি সেকেণ্ডে ঘুরছে ত্রিশ বার।

আমাদের গ্যালাক্সিতে অনেক ধরনের বিস্ফোরণের গোড়ায় রয়েছে যুগলতারাদের মধ্যে একটি নিউট্রন তারায় পরিণত হওয়া। এদের অনেকগুলো থেকেই বেরোতে থাকে প্রবল এক্স-রশ্মির প্রবাহ। এক্স-রশ্মি এমনিতে অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারলেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের শুষে নেয়, তাই এতদিন মানুষ এসব বিকিরণ সম্বন্ধে তেমন খবর পেত না। সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে মহাকাশে বিশেষ ধরনের সংবেদী গ্রাহকযন্ত্র বসাবার ফলে আজ তাদের সম্বন্ধে খবর যোগাড় করা সহজ হয়েছে। তেমনিভাবে আজ হদিস করা যাচ্ছে মহাকাশ থেকে আসা এর চেয়ে আরো শক্তিমান গামারশ্মির বিকিরণের। মহাকাশে আজ এমন সব বিস্ফোরণের হদিস পাওয়া যাচ্ছে যার তেজ বিকিরণ দশ হাজার কোটি তারার তেজের সমান।

## কোয়াসার আর কৃষ্ণবিবর

কোয়াসারদের আবিষ্কার হয় ষাটের দশকের শুরুতে। তখন মনে হয়েছিল এগুলো যেন ছোট আলোর বিন্দু যা আমাদের কাছ থেকে দ্রুত দূরে ছুটে চলেছে – তবে আলো বিচ্ছুরণ করছে একটা পুরো গ্যালাক্সির চাইতেও বহু হাজার গুণ বেশি। আজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন কোয়াসাররা হচ্ছে অতি বিক্ষুব্ধ গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রবস্তু। আর মহাকাশে প্রায় দু'হাজার এমনি কোয়াসারের হদিস পাওয়া গিয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন এদের সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত মহাবিশ্ব সৃষ্টির অল্প কিছুদিন পরই; তারপর থেকে সৃষ্টিকালীন সেই মহাবিস্ফোরণের ধাক্কায় তারা আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি (৯০ শতাংশের মতো) বেগে কেবলই দূরে ছুটে চলেছে। তাদের আলো এতদিনে আমাদের চোখে পড়লেও আসলে তারা হয়তো এর মধ্যে নিভেই গিয়েছে।

এসব কোয়াসারের ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলছেন, খুব সম্ভব এদের ভেতরে পাওয়া যাবে এক বিপুল উত্তপ্ত গ্যাসের ঘূর্ণি; সেখানে হয়তো গ্যাসের বেগ ওঠে আলোর বেগের কাছাকাছি। তারও ভেতরে আছে হয়তো একটা কৃষ্ণবিবর। এই কোয়াসাররা আমাদের কাছ থেকে কত দূরে রয়েছে সে হিসেবটা নির্ভর

করবে এরা কত আগে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল – অর্থাৎ মহাবিশ্বের কখন সৃষ্টি হয়েছিল – তার ওপর। যদি ধরা যায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে ১,৫০০ কোটি বছর আগে তবে সবচেয়ে দূরে যে সব কোয়াসার দেখা যাচ্ছে তারা রয়েছে মোটামুটি ১,৪০০ কোটি আলোক-বছর দূরে। এত দূরের আর কোনো বস্তুর হদিস মানুষ এযাবৎ পায় নি।

কৃষ্ণবিবর (Black Hole) হল বস্তুর অতিমাত্রায় ঘনীভূত অবস্থা। তাতে বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এমন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে ওঠে যে, কোনো কিছুই – এমনকি আলোও – তার আকর্ষণের টান এড়িয়ে বাইরে বেরোতে পারে না। আমাদের এই পৃথিবীটাকে যদি কোনোমতে চেপেচুপে একটা মার্বেলের মতো ছোট করে ফেলা যেত তাহলে পৃথিবীও একটা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃষ্ণবিবর আবার হতে পারে তিন মাপের। মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বস্তু অতিঘন হয়ে জমে হয়তো অসংখ্য খুদে কৃষ্ণবিবরের জন্ম দিয়েছিল। তার একেকটির আকার ছিল পরমাণুর কেন্দ্রের ব্যাসের চেয়েও ছোট অথচ ভর ছিল হাজার কোটি টনের মতো; তবে তাদের প্রায় সবই সম্ভবত এর মধ্যে বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উবে গিয়েছে। অল্প কিছু যা এখনও টিকে আছে সেগুলোও হয়তো মাঝে মধ্যে মহাবিশ্বের এখানে সেখানে এভাবে উবে যাচ্ছে।

কোনো দানবতারা ধসে পড়ার সময় যদি নিউট্রন তারার স্তর পেরিয়ে যাবার পরও ধস চলতেই থাকে তাহলে সৃষ্টি হয় মাঝারি আকারের কৃষ্ণবিবরের। সে দানবতারা তখন চলে যায় একেবারে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। যুগলতারার একটা যদি হয় নিউট্রন তারা আর সেটা তার সঙ্গীর গা থেকে প্রচুর বস্তু শুষে নেয় তখন সেও হয়ে যেতে পারে মাঝারি আকারের কৃষ্ণবিবর।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বড় ধরনের কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি হয় সম্ভবত গ্যালাক্সি সৃষ্টির গোড়াতেই বিপুল পরিমাণ বস্তু তার কেন্দ্রে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘনীভূত হয়ে। বিজ্ঞানীরা একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিপুলভাবে ঘুরপাক খাওয়া গ্যাসের বেগ মেপে একটা কৃষ্ণবিবরের ভর হিসেব করেছেন প্রায় দশ কোটি সূর্যের ভরের সমান। এমনি আরেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি কৃষ্ণবিবরের ভর মাপা হয়েছে ৩০০ কোটি সূর্যের ভরের সমান। আমাদের আপন গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও কি এমনি কোনো কৃষ্ণবিবর থাকা সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে কৃষ্ণবিবর তার ভর হতে পারে সূর্যের ভরের চেয়ে চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশি।

তাহলে কি এর মধ্যে মহাবিশ্বের সব রহস্য ভেদ হয়ে গিয়েছে? – না, তার এখনও বহু বাকি। পৃথিবীতে আরো বড় ডজনখানেক নতুন আলোক-দূরবীন

তৈরির কাজ আজ এগিয়ে চলেছে। চিলির আটাকামা মরুভূমিতে একটি পাহাড়ের ওপরে বসানো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলোক-দূরবীন; তাতে আট মিটার ব্যাসের চারটি দূরবীন থাকবে একসঙ্গে। এছাড়া মহাকাশে ক্রমাগতই বসানো হচ্ছে দূরের মহাকাশ অনুসন্ধানের নতুন নতুন যন্ত্র। ১৯৯৭, ১৯৯৯ আর ২০০২ সালে নভশ্চররা হাব্‌ল্‌ দূরবীনের কাছে গিয়ে তাতে আরো আধুনিক, নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করার কথা। এসবের লক্ষ্য একটাই – মহাকাশের আরো দূরের, আরো গভীর সব নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করা।

এ তো হল কিছু নমুনামাত্র। কত কী রহস্যময় ব্যাপার যে মহাকাশে নিরন্তর ঘটে চলেছে! আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, "আমরা যে মহাবিশ্বের এত সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছি এটাই মনে হয় এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়।" – আর ক্রমাগত এমনি নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটনের ক্লান্তিহীন, বিনিদ্র সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

# পৃথিবী ছাড়ালেই চাঁদ

চাঁদের বুকে বসে যে বুড়ি দিন-রাত অবিশ্রাম সুতো কেটে চলে সে আমাদের ছেলেবেলার অতি চেনাজনদেরই একজন। তার চরকা কাটা দেখতে দেখতে আর 'শোলক বলা কাজলা দিদি'র শ্লোক শুনতে শুনতে আমাদের অনেকের শৈশব কেটেছে। চাঁদের হাসি কত শিশুর মলিন মুখে হাসি ফুটিয়েছে ; আর তার রূপ কত না শিশুর চাঁদমুখের উপমা হয়েছে!

পূর্ণিমার রাতে যখন পূর্ণ চাঁদ আকাশে ওঠে তখন ধবল জ্যোৎস্নায় চারদিক ছেয়ে যায় ; গ্রামের পথে হাঁটতে গেলে মনে হয় যেন দিনের আলোতেই হাঁটছি। কিন্তু তখন এটা ভাবা শক্ত হয় যে আসলে চার-পাঁচ লাখ পূর্ণিমার চাঁদের আলো একসঙ্গে করলে তবে তা সূর্যের আলোর সমান হবে। আসলে সূর্য তার সামান্য কিরণ ধার দেয় চাঁদকে; চাঁদের মাটি-পাথর মেটে রঙের, তা থেকে সে আলোর মাত্র দশ শতাংশের মতো ঠিকরে ওঠে; তার সামান্য অংশ এসে পড়ে আমাদের পৃথিবীতে, তাকেই আমরা জ্যোৎস্নার আভা হিসেবে দেখি। এ আলোর তাই সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু চাঁদের আলোটাই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হল চাঁদ আমাদের পৃথিবীর সর্বক্ষণের সঙ্গী; সূর্যের চারপাশ দিয়ে পৃথিবীর চলার পথে কয়েকশ' কোটি বছর ধরে চাঁদ রয়েছে আমাদের সাথে সাথে। চাঁদকে বাদ দিয়ে তাই পৃথিবীর কথা ভাবাই শক্ত। আর পৃথিবীর বাইরে একমাত্র যে জগতে মানুষ এযাবৎ যেতে পেরেছে সে হল এই চাঁদ। চাঁদের বুক থেকে মানুষ মাটি-পাথর তুলে এনেছে; সেসব গবেষণাগারে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছে কী দিয়ে তৈরি চাঁদ, সেখানে কোন রকম প্রাণের চিহ্ন আছে কিনা— এমনি সব নানা বিষয়ে মানুষ জানার চেষ্টা করেছে। সেখানে কোনোরকম প্রাণের হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবে জানা গেছে আরো অনেক নতুন খবর। আর সেসব খবর থেকে চাঁদ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আগের চেয়ে আজ অনেকখানি বদলে গিয়েছে।

চাঁদের দিকে খালি চোখে তাকালে যে কালো কালো দাগ দেখা যায় সেসব দেখেই চরকা-কাটা বুড়ির চেহারার কথা মনে হয়। আজ থেকে চারশ বছর আগে মানুষ প্রথম দূরবীনের ভেতর দিয়ে তাকায় চাঁদের দিকে; তখন মনে হল ওগুলো বুঝি সমুদ্র। তাই তাদের একেকটার নাম রাখা হল বেশ কাব্য করে; যেমন 'প্রশান্তির সাগর', 'রঙধনু উপসাগর', 'ঝড়ের সমুদ্র' ইত্যাদি। এসব নাম এখনও টিকে আছে, তবে আজ আমরা জানি চাঁদের ওপরে রয়েছে শুধু বহু পুরনো দিনের লাভার প্রবাহ। কিন্তু চাঁদের ওপর নানা রকম জীবজন্তু বাস করতে পারে এরকম কথা মানুষ ভেবে আসছে বহু কাল থেকে; সে সব নিয়ে অনেক উপাখ্যানও তৈরি

হয়েছে। এমনি ধরনের কিছু উপাখ্যান আমরা প্রায় চারশ বছর আগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইয়োহান কেপলার (Johannes Kepler)-এর লেখাতেও পাই।

## কেপলারের চন্দ্র-উপাখ্যান

কেপলার মানুষ হিসেবে ছিলেন কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে প্রাচীন আর আধুনিকের মিশেল ঘটেছিল। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র দিয়ে লোকের ভাগ্য গণনা করে দিতেন। তবে তাঁর গণিতের মেধা ছিল অসাধারণ। আর সেকালের সেরা জ্যোতির্বিদ ডেনমার্কের তাইকো ব্রাহের শিষ্য হিসেবে কাজ করতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর বেশ দখল জন্মে যায়। তাইকো ডেনমার্ক আর সুইডেনের মাঝখানে হ্বিন (Hveen) দ্বীপে একটা মানমন্দির তৈরি করেছিলেন : তারপর সেখানে বিশ বছর ধরে গ্রহদের গতিবিধি খুব যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিখে রেখেছিলেন। ১৬০১ সালে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে সেসব পর্যবেক্ষণ কেপলারের হাতে আসে। হিসেব-নিকেশ করে তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন মঙ্গল গ্রহের যেসব পর্যবেক্ষণ পাওয়া গিয়েছে তা বৃত্তের মতো গোলাকার কক্ষপথ দিয়ে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ছ'বছর ধরে হিসেব কষে তিনি প্রমাণ করলেন আসলে মঙ্গল, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারপাশে বৃত্তের মতো পথে না ঘুরে কিছুটা লম্বাটে উপবৃত্তের মতো কক্ষপথে ঘোরে। তিনি যেসব গ্রহ গতির নিয়ম আবিষ্কার করেন তার প্রথম দুটি প্রকাশিত হয় ১৬০৯ সালে আর তৃতীয়টি ১৬১৮ সালে। এগুলো নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কারের পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

এমন যে বিজ্ঞানী কেপলার তিনি চাঁদকে নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন; তার নাম 'সোমনিয়াম' অর্থাৎ স্বপ্ন। বইটা বেরোয় ১৬৩২ সালে, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর। এ বইয়ের নায়ক ডুরাকোটাস এক প্রেতের সাহায্য নিয়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছায়। কোন এক চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে তখন সেই ফাঁকে ছায়া বেয়ে বেয়ে প্রেত তাকে চাঁদে নিয়ে যায়। বইটা কাল্পনিক কাহিনী হলেও সে সময়ে চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যতটুকু জানতেন তাকে কেপলার কাজে লাগিয়েছিলেন। যেমন কেপলার জানতেন যে চাঁদের শুধু একটা দিকই আমরা দেখতে পাই কিন্তু তার অন্য দিক পৃথিবী থেকে কখনোই দেখা যায় না। তিনি লিখেছেন, চাঁদ এমন জায়গা যেখানে তাপমাত্রার প্রবল ওঠানামা ঘটে; আর সেখানে আছে বিশাল সব পর্বত আর গভীর খাদ। এসব কথা আজ প্রমাণিত হয়েছে। গ্যালিলিও চাঁদের গায়ে যেসব খাদের মতো জায়গা দেখেছেন, কেপলার বললেন সেগুলো তাঁর কাছে বরং জলা জায়গা বলে মনে হয়।

কেপলার কল্পনার রঙ চড়িয়ে লিখেছেন, চাঁদের বাসিন্দাদের চেহারা নানা ধরনের। কিছু আছে সাপের মতো চেহারার; কিছু মাছের মতো ডানাওয়ালা – তারা সমুদ্রে সাঁতরাতে পারে; কিছু চলে মাটিতে। অধিকাংশের গায়ে আছে ঘন লোম। তাদের কেউ যদি ভুল করে দুপুর রোদে খোলা জায়গায় আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার লোম

পুড়ে যায়, আর সেটা মরার মতো পড়ে থাকে। অবশ্য রাত হলে সেই পোড়া লোম খসে পড়ে আবার নতুন লোম গজায়। চাঁদের বাসিন্দারা অধিকাংশই বেশ ভাল সাঁতরাতে পারে; আর তারা দম নেয় খুব ধীরে ধীরে, তাই সহজেই পানির নিচে অনেকক্ষণ থাকতে পারে।

সেকালে চাঁদের মানুষদের নিয়ে এধরনের কাহিনী আরো অনেকেই লিখেছিলেন। তাতে বোঝা যায় চাঁদে যে মানুষজন আছে এ ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকেই বিশ্বাস করতেন। এধরনের কথা লিখেছেন সেকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেলও। এই শৌখিন জ্যোতির্বিদ নিজের হাতে তৈরি দূরবীন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে ১৭৮১ সালে আবিষ্কার করেন ইউরেনাস গ্রহ ; এর ফলে সৌরজগতে মানুষের চেনাজানা এলাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর পর তিনি হাজার হাজার যুগল তারা, তারার জোট আর নীহারিকা আবিষ্কার করেছেন। ছায়াপথ গ্যালাক্সির আকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তিনিই প্রথম দেন। সে সময়ের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভাল সব দূরবীন তিনিই তৈরি করেছিলেন। এমন যে হার্শেল তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, চাঁদে যে মানুষ আছে এটা 'অবধারিত সত্য'। সেকালে অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করতেন চাঁদের ওপর ঘন বায়ুমণ্ডল আছে।

১৮৩৮ সালে বিয়ার ও মেডলার নামে দু'জন জার্মান বার্লিনে খুব যত্ন করে তৈরি চাঁদের একটি মানচিত্র প্রকাশ করলেন। তাতে তাঁরা বললেন চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই, কোন রকম পরিবর্তনও নেই। চাঁদে উন্নত ধরনের জীব আছে এ ধারণা উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাতিল হয়ে যায়। তবে সেখানে গাছপালা থাকতে পারে এমন ধারণা তার পরও বহুদিন টিকেছিল। কেবল এই শতাব্দীতে নভোযানে করে মানুষ চাঁদের ওপর নামার পরই স্পষ্ট বোঝা গেছে সেখানে কোন রকম প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

## চাঁদের উল্টো পিঠের রহস্য

চাঁদ ২৭.৩ দিনে পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসে; আবার নিজের অক্ষের ওপরও একবার ঘোরে ২৭.৩ দিনে। এজন্যই পৃথিবী থেকে আমরা শুধু চাঁদের এক পিঠ দেখি, অন্য পিঠ কখনো দেখতে পাই না। আপাতদৃষ্টিতে এই যোগাযোগটা খুব আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। কিন্তু কারণটা বুঝলে এটা আর তেমন আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হবে না। আসলে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীর টানে চাঁদের গায়ে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তার বাধার ফলেই চাঁদের নিজের অক্ষের ওপর ঘুরপাক খাবার ব্যাপারটা এমন খাঁজে খাঁজে মিলে গিয়েছে।

সৌরজগতের শুরুর দিকে চাঁদ এখনকার চেয়ে পৃথিবীর আরো অনেক কাছাকাছি ছিল; আর আজকের মতো এমন কঠিনও হয়ে ওঠেনি। তখন চাঁদ নিজের অক্ষের ওপর এখনকার চেয়ে আরো জোরে ঘুরপাক খেত; কিন্তু তার যেদিকটা পৃথিবী মুখো হত সেদিক পৃথিবীর আকর্ষণের টানে জোয়ারের মতো ফুলে উঠত – এই

ফুলে ওঠা তার ঘোরায় বাধার সৃষ্টি করত। এভাবে চাঁদের ঘোরার বেগ কমতে কমতে এক সময় পৃথিবীর তুলনায় ঘোরা একেবারে থেমে গেল; যেটুকু ঘোরা থাকল তা শুধু পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সমান। ধরা যাক কেউ ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার বসিয়ে তার দিকে মুখ রেখে চারপাশে ঘুরছে; চেয়ারটাতে কেউ বসে থাকলে সে শুধু প্রথম জনের মুখই দেখতে পাবে, পেছন দিক কখনো দেখবে না। ব্যাপারটা অনেকটা তেমনি।

এ থেকে মনে হতে পারে আমরা বুঝি সব সময় চাঁদের গায়ের ঠিক অর্ধেক এলাকা দেখতে পাই। কোন এক সময়ে ৫০ শতাংশ দেখতে পেলেও আজ আমরা মোটমাট দেখি চাঁদের ৫৯ শতাংশ এলাকা। আসলে চাঁদ নিজের অক্ষের ওপর সর্বক্ষণ একই বেগে ঘুরলেও পৃথিবীর চারপাশে সব সময় একই বেগে ছোটে না। তার কারণ পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের পথটা পুরোপুরি গোল নয়, অনেকটা উপবৃত্তের মতো। চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে দূরত্ব হয় ৩৫৬.৪০০ কিলোমিটার (অনুভূ) আর যখন সবচেয়ে দূরে থাকে তখন দূরত্ব হয় ৪০৬,৭০০ কিলোমিটার (অপভূ)। আর চাঁদ পৃথিবীর কাছে এলে তার ঘোরার বেগ হয় বেশি, দূরে থাকলে ঘোরার বেগ হয় কম। এতে নিজের অক্ষের ওপর ঘোরা আর কক্ষপথে তার অবস্থানে কিছুটা গরমিল হয়; এজন্য মনে হয় চাঁদ যেন সামান্য দুলছে। প্রথমে পুবদিকে তার গা একটু বেশি দেখা যায়, তারপর পশ্চিম দিকে একটু বেশি দেখা যায়। তাছাড়া চাঁদের বিষুবতল কক্ষপথের সঙ্গে সামান্য কোণ (৬°) করে আছে; এজন্য উত্তর-দক্ষিণেও তার সামান্য দুলুনি হয়। সবটা মিলিয়ে চাঁদের ৪১ শতাংশ এলাকা সব সময় আমাদের চোখের আড়ালে থাকে।

দৃশ্যটা অবশ্য হঠাৎ করে বদলে গেল ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে। রাশিয়ার লুনা-৩ নভোযান চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাল। এই প্রথম মানুষ জানতে পেল চাঁদের রহস্যময় উল্টো পিঠের খবর। দেখা গেল সচরাচর চাঁদের যে পিঠ আমরা দেখতে পাই উল্টো পিঠটা অনেকটা সেরকমই। অবশ্য তার পর আরো নভোযান বিশেষ করে অ্যাপলো নভোযান থেকে চাঁদের উল্টো পিঠের অনেক স্পষ্ট ছবি তুলে সে পিঠ সম্বন্ধে বহু নতুন খবর জানা গিয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর দিকে সব সময় মাত্র একটা পিঠ ঘুরিয়ে থাকলেও সূর্যের দিকে কিন্তু দু'পিঠই মেলে দেয়, তাই সারাটা চাঁদে দিন-রাত হয় একই ধরনের। তবে এই উল্টো পিঠ থেকে পৃথিবী কখনো দেখতে পাওয়া যায় না।

চাঁদের এক পিঠ যে সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে তার ফলে তার এক দিকে দু'সপ্তাহ ধরে থাকে সূর্যের আলো, তখন অন্য পিঠ থাকে অন্ধকারে ; তারপর আবার দু'সপ্তাহ ধরে হয় এর উল্টো অবস্থা। চাঁদের যে পিঠে সূর্যের আলো থাকে সে পিঠে তাপমাত্রা ওঠে ১২৭ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত আর অন্যপিঠে তাপমাত্রা নেমে যায় –১৭৩ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত।

## নভোযানে চাঁদের পথে

আজ প্রায় চার দশক হল মানুষ মহাকাশে নভোযান পাঠাতে শুরু করেছে। নভোযানে করে মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে তাও প্রায় তিন দশক হল। আজকাল মহাকাশে নভোযান পাঠানো যেন রোজকার সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা রীতিমতো জটিল। মহাকাশে যেতে হলে যেতে হবে রকেটের সাহায্যে; কিন্তু একই রকেটে চাঁদে যাওয়া আবার তাতে চেপে ফেরত আসার কোন উপায় আজও বের করা যায় নি। যাওয়া যায় পর পর কয়েকটি রকেট জোড়া লাগিয়ে; ফেরার কায়দাও তেমনি জটিল।

অ্যাপলো নভোযানে বসতে পারে তিনজন নভশ্চর। নভোযানটিকে শক্তিশালী তিন-স্তর রকেটের সাহায্যে ছোঁড়া হয় চাঁদের দিকে; চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে সেটা চাঁদের চারপাশের কক্ষপথে ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর তা থেকে দু'জন নভশ্চর চন্দ্রফেরিতে করে চাঁদের ওপর আলতোভাবে নেমে আসে। যখন ফেরার সময় হয় তখন এই চন্দ্রফেরিই আবার নিচের দিকে রকেট ইঞ্জিন ছুঁড়ে চাঁদ থেকে ওপরে উঠে মূলযানের কক্ষপথে তার সঙ্গে জোড়া লাগে। নভশ্চর দু'জন ঢুকে যায় মূলযানে, তারপর নভোযান আবার ফেরত আসে পৃথিবীতে। এই ব্যবস্থার একটা অসুবিধে হল চন্দ্রফেরি যদি ঠিকমতো ওপরে উঠতে না পারে তাহলে সেই নভশ্চরদের উদ্ধার করার আর কোন উপায় নেই।

প্রথমবার চাঁদে নামার আগে দুটো মহড়া হয়ে গেল। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপলো-৮ ঘুরে আসে চাঁদের চারপাশ দিয়ে; ১৯৬৯-এর মে মাসে অ্যাপলো ১০-কে পরীক্ষা করা হয় একেবারে চাঁদের কাছে নামিয়ে দিয়ে, তারপর আবার সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই তারিখে গ্রিনিচ মান সময় ২০:১৮ মিনিটে (ঢাকা সময় ২১ জুলাই সকাল ২:১৮) অ্যাপলো-১১ নভোযানের চন্দ্রফেরি নামল চাঁদের বুকে। প্রথমে নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং (Neil Armstrong) নেমে এলেন চাঁদের 'মারে ট্রাংকুইলিটাটিস' বা প্রশান্তির সাগরে। চাঁদের মাটিতে এক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "একজন মানুষের জন্য ছোট একটি ধাপ; কিন্তু মানব জাতির জন্য বিশাল এক লাফ।" একটু পরে নেমে এলেন এডুইন অলড্রিন (Edwin Aldrin)। পরে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন সেখানে ধুলো আর মাটি আছে প্রায় ২০ মিটার (৬০ ফুট) পুরু; তার তলায় আছে কঠিন পাথর।

দু'জনে মিলে চাঁদের মাটিতে দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সময় হাঁটাচলা করলেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল চাঁদের মাটি-পাথরের নমুনা সংগ্রহ করা – তাঁরা সেখান থেকে প্রায় ২০ কেজি (৪৮ পাউণ্ড) নমুনা সংগ্রহ করলেন; তারপর কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বসালেন। চাঁদে কোন হাওয়া নেই; তাই তাঁদের পরতে হয়েছিল নভশ্চরের জবড়জঙ গোছের বিশেষ ধরনের পোশাক। তার ওপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় মাত্র ছ'ভাগের একভাগ। তাই শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য তাঁদের চলাফেরা করতে হচ্ছিল বেশ ধীরে ধীরে। সারা পৃথিবীর

লোকে ঘরে বসে টেলিভিশনে তখন আর্মস্ট্রং আর অলড্রিনের হাঁটাচলা দেখতে পায়।

চাঁদ থেকে নভশ্চররা বেশ কিছু মাটি-পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন ; পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা সেসব পরীক্ষা করে দেখলেন পৃথিবীতে যে ধরনের আগ্নেয় শিলা দেখা যায় সেগুলো প্রায় হুবহু তেমনি। তাই তা থেকে তেমন কোন নতুন খবর মিলল না। দেখা গেল শিলার বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বছর; পরে জানা গিয়েছে চাঁদের বেশিরভাগ শিলার বয়সই এর চেয়ে বেশি। শিলা থেকে চাঁদের ওপর পানি বা প্রাণের কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেল না; এমন কি আদিকালের কোন রকম জীবের ফসিলও না। তবু অজানা জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুরো পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নভশ্চরদের আড়াই সপ্তাহ ধরে পৃথক করে রাখা হল।

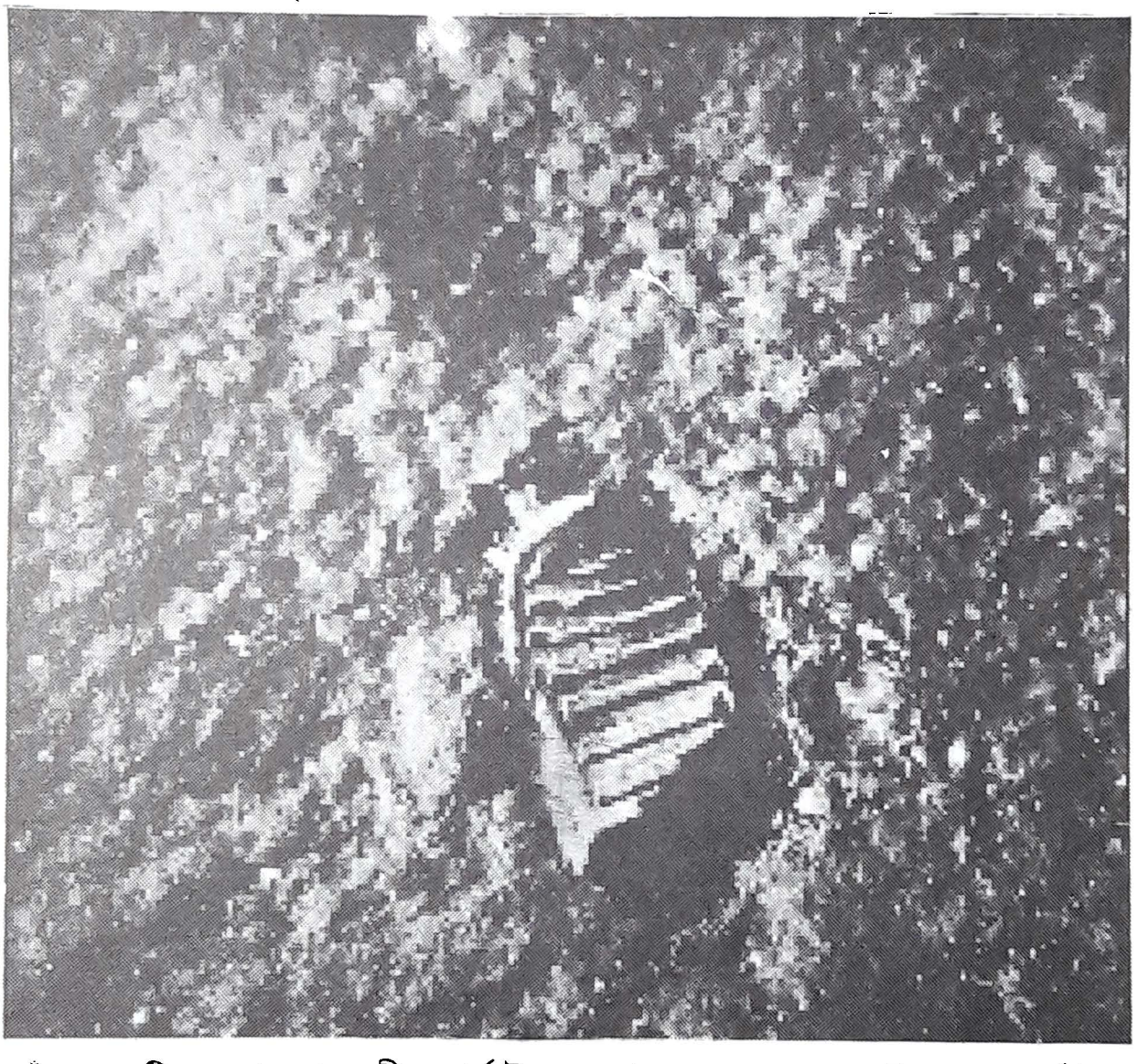

চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং-এর পায়ের ছাপ। ২১ জুলাই ১৯৬৯ আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন নামেন চাঁদের মাটিতে; কলিন্স থাকেন চাঁদের চারপাশে ঘুরন্ত নভোযানে।

কয়েক মাস পরই ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাপলো ১২-কে পাঠানো হল চাঁদে। নভশ্চর কনরাড (Conrad) ও বীন (Bean) চাঁদের 'ঝড়ের সাগর'-এ

নেমে নানা রকম পরীক্ষা করলেন; মাটি-পাথরের আরো কিছু নমুনা সংগ্রহ করলেন। সারভেয়র-৩ নামে আগে পাঠানো এক নভোযান ১৯৬৭ সাল থেকে পড়ে ছিল চাঁদের মাটিতে। তাঁরা তার কাছে গিয়ে তারও খানিকটা অংশ খুলে নিয়ে এলেন। ১৯৭০-এর এপ্রিলে অ্যাপলো-১৩ নভোযান পাঠাবার পর ঘটল একটা বড় রকম দুর্ঘটনা। চাঁদের দিকে যাবার পথেই মূল নভোযানের পেছনে অক্সিজেন ট্যাঙ্কে ঘটে বিস্ফোরণ। চাঁদের ওপর নামার পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হল; নভশ্চররা অসমসাহসিকতা দেখিয়ে চন্দ্রযানে রাখা সামান্য হাওয়া-পানির ওপর ভরসা করে কোনক্রমে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারলেন।

এর পরের চারটি অভিযানে আর কোন সমস্যা ঘটেনি। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপলো-১৪ নভোযানে গিয়েছিলেন অ্যালান শেপার্ড (Alan Shepard) যিনি দশ বছর আগে আমেরিকা থেকে প্রথম মহাকাশে ওঠেন। তিনি আর তাঁর সঙ্গী এডওয়ার্ড মিচেল (Edward Mitchell) চাঁদের ওপর যন্ত্রপাতি বইবার জন্য একটা 'ঠেলাগাড়ি' সঙ্গে নিয়েছিলেন; তাঁরা সেখানে প্রায় এক মাইল দূর পর্যন্ত চলাফেরা করেন। অ্যাপলো ১৫-তে নভশ্চররা নিয়ে গেলেন এক বিদ্যুতচালিত চন্দ্রযান; সেটা ঘণ্টায় ১৪ কিমি (৯ মাইল) পর্যন্ত চলতে পারে। তাতে চড়ে দুই নভশ্চর ডেভিড স্কট (David Scott) আর জেমস আরউইন (James Irwin) চাঁদের অ্যাপেনাইন পর্বতের গোড়ায় নেমে এক বড় উপত্যকার শেষ প্রান্ত প্রর্যন্ত সফর করে এলেন। ন'মাস পর ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে অ্যাপলো ১৬-তে গেলেন ইয়ং (John Young) ও ডিউক (Charles Duke) নামে দুই নভশ্চর; তাঁরা চাঁদের দক্ষিণে দেকার্ত অঞ্চলের মালভূমি এলাকা সফর করলেন আর চন্দ্রফেরির বাইরে সবসুদ্ধ কাটালেন চব্বিশ ঘণ্টার ওপর ।

সবশেষে অ্যাপলো ১৭-র অভিযান হল ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন ইউজিন সার্নান (Eugene Cernan)। তাঁর সঙ্গী ড. হ্যারিসন শ্মিট (Harrison Schmitt) একজন পেশাদার ভূতত্ত্ববিদ, তিনি এই অভিযানের জন্যই বিশেষ করে নভশ্চর হবার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁরা পুরো তিন দিন কাটান চাঁদের ওপর; সেখানে চলাফেরা করেন ৩৫ কিমি (২২ মাইল); সংগ্রহ করেন ১১৩ কেজি (২৪০ পাউণ্ড) মাটি-পাথর। এঁরা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল মানুষের চন্দ্র অভিযানের প্রথম পর্যায়।

এই প্রথম পর্যায়ের অভিযানে চাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে। ছ'টি সফল অভিযানে মোট ৩৮০ কেজি (৮৪০ পাউণ্ড) মাটি-পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্য এসব অভিযানে খরচ হয়েছে অনেক – প্রায় ৪,০০০ কোটি ডলার। জানা গেছে চাঁদের মারিয়া বা 'সাগর' এলাকাগুলোতে আছে প্রচুর লোহা, টাইটানিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম; পাহাড়ি এলাকায় আছে ক্যালসিয়াম আর অ্যালুমিনিয়াম। এগুলো মানুষ কোনদিন হয়তো কাজে লাগাতে পারবে।

এরপর বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন চাঁদে আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে মহাকাশ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার। চাঁদের ওপরে

যেসব তীব্র রশ্মি এসে পড়ছে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য এসব গবেষণাকেন্দ্র হয়তো হবে মাটির তলায়; চাঁদের মাটি থেকে অক্সিজেন বের করে তা থেকে বিজ্ঞানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলবে। চাঁদের ওপর হাওয়া নেই, সে আকাশে কোন রকম ধুলোবালিও নেই; তাই চাঁদের ওপর থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে যা পৃথিবী থেকে সম্ভব নয়। একদিন হয়তো চাঁদকে ঘাঁটি করে মানুষ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে অভিযানে বেরোবে।

## এক অপরূপ বিরান ভূমি

১৯৬৯ সালে প্রথম যে দু'জন নভশ্চর চাঁদে নেমেছিলেন তাঁদের একজন হলেন এডুইন অলড্রিন। চাঁদ দেখতে কেমন লেগেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সে এক অপরূপ বিরান ভূমি।

চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চারভাগের একভাগের একটু বেশি; তাতে আজকাল অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন আসলে পৃথিবী আর চাঁদ একই সঙ্গে আর একইভাবে তৈরি হয়েছিল এক জুটি হিসেবে। পৃথিবী আর চাঁদের বয়সও দেখা যাচ্ছে মোটামুটি একই রকম (৪৬০ কোটি বছর)। আবার এমনও হতে পারে যে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছিল আলাদাভাবে, পরে এক সময়ে পৃথিবী তাকে টেনে নিজের আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছে।

পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হল চাঁদের আকার ছোট, তাই তার আকর্ষণের শক্তি কম। এজন্য পৃথিবী থেকে যেখানে নিষ্ক্রমণ বেগ সেকেণ্ডে ৭ মাইল সেখানে চাঁদ থেকে নিষ্ক্রমণ বেগ সেকেণ্ডে মাত্র ১.৫ মাইল। ফলে চাঁদ তার ওপরে হাওয়াকে ধরে রাখতে পারে নি। তবে এর ভেতরে এখনও প্রচুর তাপ রয়ে গিয়েছে; অর্থাৎ চাঁদ তার সব তাপ ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি।

চাঁদের গায়ে প্রধান দেখবার মতো জিনিস হল অনেকগুলো 'সাগর', পাহাড় আর খাদ। বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন যে চাঁদের সাগরে কোন সময়ই পানি ছিল না, এগুলো বরং ভরা ছিল আগ্নেয়গিরির গলন্ত লাভায়। চাঁদের যে পাশটা পৃথিবীর দিকে তার গায়ের বেশিরভাগ সাগর একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগানো; একটা বড় রকম ব্যতিক্রম হল উত্তর-পূর্ব কোণের কাছে 'সঙ্কটের সাগর', এটাকে পৃথিবী থেকে খালি চোখেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

চাঁদের গায়ে অসংখ্য গোল গোল খাদ ছড়ানো; এগুলোর চারপাশ সাধারণত ঢিবির মতো উঁচু হয়ে ওঠা। উঁচু জায়গাগুলোতে এমনি খাদ গিজ গিজ করছে, আবার চাঁদের সাগরের ভেতরেও আছে খাদ। এদের কোন কোনটার আকার বিশাল— ১৫০ মাইল পর্যন্ত চওড়া; আবার কোনটা এত ছোট যে পৃথিবী থেকে দেখাই যায় না। এদের বেশিরভাগেরই নাম রাখা হয়েছে কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামে – যেমন টলেমি, হাইপেশিয়া, তাইকো, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হ্যালি।

চাঁদের পাহাড়গুলো আমাদের পৃথিবীর পাহাড়ের মতো নয়। বেশিরভাগ পাহাড়ই রয়েছে সাগরগুলোর ধারে ধারে। যেমন চাঁদের অ্যাপেনাইন আর আল্পস পর্বত রয়েছে মারে ইমব্রিয়াম বা বৃষ্টির সাগরের কিনারায়। এছাড়া কিছু আলাদা ছোট পাহাড়ও আছে। কাদামাটি শুকিয়ে গেলে যেমন ফাটল দেখা দেয় এমনি ফাটলও চাঁদের ওপর প্রচুর রয়েছে।

চাঁদের ওপরকার খাদগুলো কি করে তৈরি হল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ৩৮০ কোটি থেকে ৪১০ কোটি বছর আগে চাঁদের ওপর ব্যাপকভাবে উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ হয়েছিল, তা থেকেই বেশিরভাগ খাদ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর চাঁদের ভেতর থেকে বিপুল আকারে আগ্নেয়গিরির লাভা বেরিয়ে সাগর অর্থাৎ বড় খাদগুলো ভরে গিয়েছে। আবার অন্যরা বলেন বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরির উদ্গার থেকেই এই জ্বালামুখের মতো খাদগুলোর সৃষ্টি। আসলে হয়তো দুটি মতই কিছুটা পরিমাণে সত্যি।

চাঁদের ওপর এধরনের উল্কাবর্ষণ বা আগ্নেয়গিরির উদ্গার প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে থেমে গিয়েছে; কাজেই এই সময়ের মধ্যে চাঁদে আর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে এখনও চাঁদের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কিছু গ্যাস বেরোয় বলে মনে হয়।

অ্যাপলো নভোযানের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে চাঁদের ওপর পঞ্চাশ-ষাট ফুট পুরু একটি হালকা মাটির স্তর রয়েছে। তার নিচে আছে একটি ভাঙ্গাচোরা পাথুরে স্তর; তার নিচে বেশ কিছু শক্ত পাথরের স্তর। আরো অনেক নিচে তাপমাত্রা এমন বেশি যে তাতে পাথর গলে যায়; আর চাঁদের একেবারে গভীরে সম্ভবত হাজার মাইলের মতো চওড়া একটি কেন্দ্র আছে যার প্রধান উপাদান লোহা। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদের কোন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই, যদিও তার গায়ে কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা চৌম্বকত্ব আছে। তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোনকালে হয়তো পৃথিবীর মতো চাঁদেরও চৌম্বক ক্ষেত্র ছিল তবে আজ তা কোন কারণে উবে গিয়েছে।

## চাঁদের কিভাবে সৃষ্টি হল

আগে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন চাঁদ এককালে পৃথিবীরই অংশ ছিল অথবা একই সময়ে আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়েছিল। সত্তরের দশকে চাঁদের মাটি-পাথর পরীক্ষা করে তার জন্ম রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ নতুন কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন, সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথম দিকে বিরাট গ্যাস আর ধুলো-পাথরের পাঁজার মধ্যে সূর্যের কাছাকাছি পাথুরে চারটি গ্রহ তৈরি হয়েছিল আগে। দু'তিন কোটি বছরের মধ্যেই কোটি কোটি পাথরের খণ্ড একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে পৃথিবী আর শুক্রের সৃষ্টি হল। তখন পৃথিবীর কাছাকাছি আদি বুধ আর আদি মঙ্গল ছাড়াও ছিল আরো অসংখ্য বড় বড় পাথরের খণ্ড; তার কোন কোনটা ছিল প্রায় বুধ আর মঙ্গলের সমান। এরা যে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারপাশে ঘুরছিল তা

পৃথিবী আর শুক্রের কক্ষপথের খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময়ে মঙ্গল গ্রহের আকারের একটি বস্তু – সেটা আকারে আমাদের পৃথিবীর অর্ধেকের মতো হবে – এসে ধাক্কা লাগাল পৃথিবীর সঙ্গে।

রাইফেল বুলেটের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি বেগে বস্তুটি প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়ায় পৃথিবীর ওপর থেকে বিপুল পরিমাণ বস্তু ওপর দিকে ছিটকে উঠল। পৃথিবীর ওপরটা কেঁপে উঠল প্রবলভাবে; পাথর গলে লাভার স্রোত বইল। যে বস্তুটি এসে পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল তার ওপর চোট পড়ল আরো বেশি; সেটা ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রচণ্ড তাপে তার দেহ বাষ্প হয়ে ছিটকে উঠল মহাশূন্যে আর আঘাতের ধাক্কায় পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। এই জ্বলন্ত গ্যাসের পুঞ্জ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে জমাট বেঁধে সৃষ্টি হল চাঁদের দেহ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন চাঁদের কক্ষপথ যে পৃথিবীর বিষুবরেখার সঙ্গে কোণ করে আছে সেটা এই সংঘর্ষেরই ফল। তাছাড়া চাঁদে আদৌ কোন পানির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, সেও তার এক সময়ে গনগনে গরম হয়ে ওঠারই জন্য। পৃথিবীর মাটি-পাথরের সঙ্গে চাঁদের মাটি-পাথরের বেশ কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়; তবে তার ওপর কতকগুলো মৌল যেমন ক্লোরিন ও পটাসিয়াম পৃথিবীর চেয়ে কম পাওয়া যাচ্ছে। চাঁদের গা জমাট বাঁধার পর তেজস্ক্রিয়ার তাপে ভেতরে কোথাও কোথাও পাথর গলে লাভার প্রবাহ বয়ে গেছে; তাতেই তার ওপর তথাকথিত সাগরগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। তবে এসব লাভা প্রবাহও শেষ হয়েছে অন্তত তিনশ' কোটি বছর আগে। তারপর এত বছর ধরেই চাঁদ এক বিরান মরুভূমি হয়ে আছে।

# আমাদের কাছের পড়শিরা

পড়শিদের সম্বন্ধে জানতে কার না ইচ্ছে করে? পড়শিরা কেউ খুব ভাল আবার কেউ হয়তো তেমন ভাল না, তবু তো তারা পড়শি! সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহরা যে আমাদের পড়শি একথা মানুষ জেনেছে বহুকাল থেকে। আর ভেবেছে এসব গ্রহ-উপগ্রহে আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী হবার মতো কোন জীব থাকতেও পারে। আমাদের সবচেয়ে নিকট পড়শি হল পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদে কোন রকম জীবের চিহ্নমাত্র নেই সেকথা তো আমরা আগেই জেনেছি। এরপর বাকি থাকে গ্রহেরা।

গ্রহদের মধ্যে একটা বড় মিল হল পৃথিবীর মতো তারা সবাই আলো পায় সূর্যের কাছ থেকে; তাদের গা থেকে এই আলোর খানিকটা ঠিকরে আসে বলেই তাদের আমরা দেখতে পাই। এদের আবার মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে পড়ে চারটি ছোটখাট গ্রহ যেগুলো সূর্যের কিছুটা কাছাকাছি: বুধ, শুক্র, পৃথিবী আর মঙ্গল। এদের সবারই ওপরটা পৃথিবীর মতো কঠিন; তাই কখনো কখনো এদের বলা হয় ভূসদৃশ গ্রহ। এর পর আছে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা; তাতে আছে অসংখ্য খুদে গ্রহ বা গ্রহাণু। তারপর আরেক দলে পাওয়া যাবে বিশাল ক'টা গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর একটা অতি ছোট গ্রহ প্লুটো। সৌরজগতের একেবারে ভেতর দিকে অর্থাৎ সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি যে দুটো গ্রহ সেই বুধ আর শুক্রের কোন উপগ্রহ নেই, তাছাড়া বাকি সবার এক থেকে ১৮টি পর্যন্ত উপগ্রহ আছে।

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের আকার ছোট বলে তার গা থেকে বহুকাল আগে সব বাতাস মহাশূন্যে পালিয়েছে; তেমনি ঘটেছে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রহ বুধের বেলা। তাছাড়া সূর্যের খুব কাছে বলে বুধের অতি লম্বা দিনে তার গা এমন প্রচণ্ড রকম তেতে ওঠে যে সে তাপে সীসাও গলে যাবার কথা। যে দিকটায় রাত নামে সেখানে তাপমাত্রা পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গার চেয়েও নিচে নেমে যায়। সৌরজগতে গ্রহ ছাড়া যে সব ছোট ছোট গ্রহাণু রয়েছে তাদের আকার বুধের চেয়েও অনেক ছোট, তাই তাদের কারো গায়ে হাওয়া থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বিশাল বড় গ্রহদের মধ্যে কয়েকটার বড়সড় উপগ্রহ আছে; তবে একমাত্র শনির উপগ্রহ টাইটান ছাড়া আর কারো ওপর তেমন কোন বায়ুমণ্ডলের খবর পাওয়া যায় নি। বড় আকারের গ্রহগুলোর ওপরটা গ্যাসের আবরণ, ভেতরটা মনে হয় তরল গ্যাস; সম্ভবত একেবারে ভেতরে আছে ছোটখাট কঠিন কেন্দ্র।

আমাদের কাছাকাছি বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এসব মোটামুটি উজ্জ্বল গ্রহকে মানুষ খালি চোখে দেখছে বহুকাল থেকে। অতি প্রাচীন কালে সপ্তাহের দিনগুলোর নামও রাখা হয়েছিল এই গ্রহদের নামে। ইউরেনাসকে খালি চোখে কোনমতে দেখা যায়; এর আবিষ্কার হয় ১৭৮১ সালে। নেপচুনকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখা যায়; এর আবিষ্কার হয় ১৮৪৬ সালে। প্লুটো এত দূরে আর এত ছোট যে তাকে দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না; এর আবিষ্কার হয় সব শেষে – ১৯৩০ সালে।

## চঞ্চল গ্রহ বুধ

বুধ গ্রহের কথা মানুষ জেনেছে বহুকাল আগে; কিন্তু বুধ সব সময় থাকে সূর্যের কাছাকাছি, তাই সূর্যের কড়া আলোর জন্য তাকে দেখতে পাওয়া মোটেই সহজ নয়। একে বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে হয়। বসন্তকালে সূর্যাস্তের পর যখন বুধ থাকে পশ্চিম দিগন্তের খুব কাছাকাছি অথবা শরৎ-হেমন্তে সূর্যোদয়ের আগে থাকে পুব দিগন্তের কাছাকাছি তখনই শুধু তাকে খালি চোখে দেখা যায়। আকাশের বুকে বুধ চলে খুব দ্রুত। পৃথিবী থেকে দূরবীনের ভেতর দিয়েও এর গায়ে কিছু কালো কালো দাগ ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যায় না; তবে চাঁদের মতো তার গায়েও কলা দেখতে পাওয়া যায়।

## বুধ গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ৪.৬০ কোটি কিমি | সর্ব নিম্ন | ৯.১৭০ কোটি কিমি |
| গড় | ৫.৭৯ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ২১.৮৯ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ৬.৯৮ কোটি কিমি | **ঘূর্ণন** | |
| **আকার** | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ৫৮.৭ দিন |
| ভর (পৃথিবী=১) | ০.০৬ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ০.২৪ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ০.৩৮ | **তাপমাত্রা:** | -১৮০° থেকে ৪৩০° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ৫.৪ | **বায়ুমণ্ডল:** | সোডিয়াম, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন |

কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে খবর নেবার আগে ধারণা করা হত চাঁদের মতো বুধেরও বুঝি আবর্তনকাল নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময়ের সমান অর্থাৎ ৮৮ দিন। তাহলে বুধের শুধু একটা দিক সূর্যের দিকে ঘোরানো থাকবে; সেদিকটায় চিরকাল হবে দিন আর উল্টো পিঠে চিরকাল থাকবে রাত। তাহলে এই অন্ধকার দিকটা হবে অতি ঠাণ্ডা, হয়তো প্লুটোর চেয়েও ঠাণ্ডা। কিন্তু ১৯৬২ সালে জ্যোতির্বিদরা নভোযান থেকে বুধের উল্টো পিঠের বিকিরণ মেপে দেখলেন সেটা তেমন ঠাণ্ডা

জায়গা নয়। আজ জানা গেছে যে বুধের আবর্তনকাল পৃথিবীর ৫৮·৭ দিনের সমান অর্থাৎ বুধের বছরের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ।

বুধের আকার ছোট বলে এর গা থেকে নিষ্ক্রমণ বেগ সেকেণ্ডে মাত্র ২·৫ মাইল; কাজেই এর ওপর বায়ুমণ্ডল নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এর ওপরকার অবস্থা অনেকটা চাঁদের মতোই। এর কোন উপগ্রহেরও খোঁজ পাওয়া যায় নি। বুধের খবরাখবর নেবার জন্য ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে মেরিনার-১০ নামে একটি নভোযান ছোঁড়া হয়। মেরিনার ১০-এর তোলা ছবি থেকে বোঝা যায় বুধের ওপরও চাঁদের মতোই অনেক পাহাড় আর খাদ আছে তবে কোন 'সাগর' নেই। বড় বড় খাদগুলোর নাম রাখা হয়েছে বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের নামে; যেমন বিটোফেন, শোপেঁ, ডিকেন্স, রুবেন্স, মার্ক টোয়েন।

বুধের গড় ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে কিছুটা বেশি; সম্ভবত তার ভেতরে আছে একটা বড়সড় লোহার কেন্দ্র; বুধের সামান্য কিছুটা চৌম্বক ক্ষেত্রও আছে। বুধ বেশ উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘোরে। যখন সূর্যের কাছে আসে তখন দিনের বেলা তার গায়ের তাপমাত্রা হয় ৪৩০ ডিগ্রি সে.; এই তাপে সীসা গলে যাবার কথা। আবার রাতে তার তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের নিচে ১৮০ ডিগ্রি সে., অর্থাৎ সেখানে ঠাণ্ডা দক্ষিণ মেরুর চেয়েও বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন বুধের ওপরকার অবস্থা দেখে মনে হয় সুদূর অতীতে কোন এক সময় একটা বিরাট বস্তু এসে অতি বেগে তার গায়ে ধাক্কা মেরেছিল; তাতে বুধ একেবারে ধ্বংস হয়ে না গেলেও তার গায়ের ওপরকার স্তরের অনেকটাই উড়ে গিয়েছে মহাকাশে। তাতে হয়তো বুধের কক্ষপথও অনেকটা বদলে গিয়েছে। সম্ভবত এই বিশাল সংঘাতটা লেগেছিল আজ থেকে ৪২০ কোটি বছর আগে। বুধের ওপর যে অসংখ্য পাথরের খণ্ড এসে পড়েছে তার ছাপ বুধের গায়ের গোল গোল খাদে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাশ থেকে আসা বস্তুর ক্রমাগত সংঘাতের ফলে বুধের ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে গলে গিয়ে তার গায়ের ওপর লাভার প্রবাহ গড়িয়ে পড়ে; সে লাভা জমে গিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু সমতলভূমি। তার ওপর আবার এসে পড়েছে প্রচুর পাথরের খণ্ড। এই ফাঁকে বুধ একটু সংকুচিতও হয়ে পড়েছে; তাই তার গায়ের চামড়া কুঁচকে যাবার মতো কিছু দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

বুধকে কখনো কখনো সূর্যের গায়ের ওপর দিয়ে চলে যেতে দেখা যায়; সে সময় সূর্যগ্রহণ দেখার মতো করে সাবধানে সে দৃশ্য দেখা চলে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, এরপর এমন ঘটবে ১৫ নবেম্বর ১৯৯৯, ৭ মে ২০০৩, তারপর ৮ নভেম্বর ২০০৬।

## শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা

একই গ্রহকে যে আমরা কখনো সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে সবার আগে জেগে ওঠা সন্ধ্যাতারা হিসেবে আবার কখনো ভোরের পুব আকাশে সবশেষে মিলিয়ে যাওয়া শুকতারা হিসেবে দেখি এ কথাটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুঝতে পেরেছিলেন বহুকাল আগেই। শুক্র গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর বেশ কাছাকাছি, তাই একে আকাশে এমন উজ্জ্বল দেখায়; আরেক কারণ হল এর ওপরকার ঘন মেঘ সূর্যের আলো অনেকটাই ঠিকরে দেয়। সূর্য আর চাঁদকে বাদ দিলে আকাশে এমন উজ্জ্বল আর কোন জ্যোতিষ্ক নেই; কখনো কখনো এর উজ্জ্বলতা হয় লুব্ধক নক্ষত্রের বিশগুণ। ঘন মেঘের আবরণের জন্য দূরবীন দিয়ে শুক্রের গায়ে তেমন কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

শুক্র যখন খুব কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয় মোটামুটি চার কোটি কিলোমিটার (আড়াই কোটি মাইল), অর্থাৎ চাঁদ যত দূরে তার চেয়ে মাত্র একশগুণ বেশি দূরে। পৃথিবী আর শুক্রের মধ্যে আকারের মিল এত বেশি যে তাদের একেবারে যমজ গ্রহ বলা যেতে পারে। তাতে মনে হবে শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্য থেকে কিছুটা কম দূরে হলেও তাদের ওপরকার অবস্থা বুঝি মোটামুটি একই রকম। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়; পৃথিবী আর শুক্রের মধ্যে তফাৎ প্রায় আকাশ-পাতাল।

### শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ১০.৭৫ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ৪.১৪ কোটি কিমি |
| গড় | ১০.৮২ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ২৫.৭০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ১০.৮৯ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| আকার | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ২৪৩ দিন |
| ভর (পৃথিবী=১) | ০.৮২ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ০.৬২ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ০.৯৫ | তাপমাত্রা: | ৪৫৯° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ৫.৩ | বায়ুমণ্ডল: | কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন (সামান্য জলীয় বাষ্প, আর্গন, কার্বন মনক্সাইড প্রভৃতি) |

শুক্রের গায়ের ওপর হাওয়া আছে অঢেল, তবে সে হাওয়া মানুষের জন্য বিষাক্ত। আদতে শুক্রের বায়ুমণ্ডল আর মেঘের ঢাকা এমন ঘন যে বাইরে থেকে দূরবীন দিয়েও সরাসরি তার গা দেখার কোন উপায় নেই। এই শতকের ত্রিশের দশকে জানা গিয়েছিল শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়েছে প্রচুর। দেখা গেল শুক্রের 'বছর' বা সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে ঘোরার সময় পৃথিবীর ২২৪.৭

দিনের সমান, তবে ঘন মেঘের আবরণের জন্য তার 'দিন' যে কত বড় তা বের করা গেল না। দূরবীন দিয়ে চাঁদের মতোই শুক্রেরও কলা দেখতে পাওয়া যায়; তবে বুধের মতোই এরও কোন উপগ্রহ নেই।

১৯৬২ সালে মেরিনার-২ নামে এক নভোযান শুক্রের কাছ দিয়ে উড়ে যায়; তা থেকে জানা যায় শুক্রের গা অতিমাত্রায় তাতানো। আর তার নেয়া হিসেব থেকে এই প্রথম জানা গেল শুক্রের নিজের অক্ষের ওপর ঘোরার সময় অর্থাৎ 'দিন' আমাদের ২৪৩ দিনের সমান অর্থাৎ তাহলে শুক্রের দিন তার বছরের চেয়ে বড়। আরো গোলমেলে ব্যাপার হল শুক্র নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে অন্যান্য গ্রহের মতো পশ্চিম থেকে পুবে নয়, পুব থেকে পশ্চিমে। শুক্রের ওপর দাঁড়িয়ে যদি আকাশের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে সূর্য উঠছে পশ্চিম দিকে আর ডুবছে পুব দিকে। শুক্র এমন উল্টোদিকে আর আর এত ধীরে ধীরে নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে কেন তার কারণ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯৭০ সালে রুশ নভোযান ভেনেরা-৭ আলতোভাবে শুক্রের ওপর নামে; তারপর বিশ মিনিট ধরে খবরাখবর পাঠাবার পর অকেজো হয়ে যায়। দেখা গেল সেই পাথর-ছড়ানো আলো-আঁধারি জগৎ বুধ গ্রহের ওপরকার মতোই অতি ভয়ঙ্কর। পরে আরো নভোযান পাঠিয়ে জানা গেছে তার ওপরকার বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড (৯৭ শতাংশ, বাকি ৩ শতাংশ নাইট্রোজেন): সে বায়ুর চাপ পৃথিবীর ওপরকার সমুদ্র-সমতলের চাপের চেয়ে প্রায় পঁচানব্বই গুণ বেশি। শুক্রের ওপর যে ঘন মেঘ তা পানির কণার নয়, ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের কণার; তা থেকে নেমে আসে সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি। আর পৃথিবীর ওপর মেঘের ওপর-সীমা মাত্র ১০ কিমি বা ৬ মাইল উঁচু, অথচ শুক্রের মেঘের ওপর-সীমা ৫০ কিমি (৩০ মাইল); সেখানে হাওয়ার বেগ ওঠে ঘণ্টায় ৩৫০ কিমি (২২০ মাইল)। অবশ্য শুক্রের গায়ের ওপর হাওয়ার বেগ বেশ কম, ঘণ্টায় মাত্র ৩-১৮ কিমি অর্থাৎ ২-১১ মাইল। শুক্রের গায়ের তাপমাত্রা ওঠে প্রায় ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস; তাতে সব পাথরও গনগনে কমলা রঙের হয়ে ওঠে। দিনে-রাতে বা বিষুবে-মেরুতে এই তাপমাত্রার তেমন কোন হেরফের হয় না।

শুক্রের মেঘের ভেতর দিয়ে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে রেডারের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে তার ওপরের প্রায় অর্ধেক এলাকা জুড়ে আছে এক বিশাল সমতলভূমি; তার মাঝে মাঝে আছে খাদ। আর আছে দুটো বিশাল পাহাড়ি এলাকা; তাদের নাম রাখা হয়েছে গ্রিক দেবীদের নামে ইশতার আর আফ্রোদিত। ইশতার উত্তর গোলার্ধে, তার আকার অস্ট্রেলিয়ার সমান; তার মাঝখানে আছে ম্যাক্সওয়েল নামে এক পাহাড়, সেটা প্রায় ১১ কিমি (৭ মাইল) উঁচু। আফ্রোদিত দক্ষিণ গোলার্ধে, তার আকার আফ্রিকার মোটামুটি অর্ধেক। খুব সম্ভব শুক্রের

ওপর জীবন্ত আগ্নেয়গিরিও আছে; তাদের উদ্গার থেকেই ওপরের বায়ুমণ্ডলে গন্ধক গিয়ে পৌঁছায়।

শুক্রের ওপরটা এমন তাতানো হয়ে উঠল কি করে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলছেন এককালে সূর্যের তেজ আজকের চেয়ে অনেক কম ছিল। তারপর এক সময় সূর্যের তেজ বেড়ে উঠল; তখন শুক্রের ওপর থেকে সব পানি বাষ্প হয়ে উড়ে মহাকাশে পালিয়ে গেল। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে খুব বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকার কারণে গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে তার ওপরটা ক্রমে ক্রমে তেতে উঠে আজকের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

শুক্রের ওপরকার হাওয়ায় ৯৭ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড কি করে হল তা নিয়েও কথা উঠেছে। জবাবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, আসলে আমাদের পৃথিবীতেও এককালে এমন বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল। ক্রমে ক্রমে তা সমুদ্রের পানিতে গলে যায় আর চুনাপাথরজাতীয় শিলায় আটকা পড়ে। তাছাড়া পৃথিবীতে গাছপালা হাওয়ার কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে তাকে ভেঙ্গে ফেলে কার্বনটা রেখে দেয় আর অক্সিজেনটা হাওয়ায় ছেড়ে দেয়। শুক্রের ওপর পানি নেই, গাছপালাও নেই, তাই সেখানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড জমে উঠেছে। অনেকে বলছেন পৃথিবীর ওপর গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া যদি ঠেকানো না যায় অর্থাৎ গাছপালা কমে যেতে থাকে আর কার্বন ডাই-অক্সাইড জাতীয় গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে ওঠে তাহলে পৃথিবীর অবস্থা একদিন শুক্রের মতোই হয়ে দাঁড়াবে।

## মঙ্গল ঃ খাল আর মানুষেরা উধাও

পৃথিবী ছাড়িয়ে সূর্য থেকে কিছুটা দূরের যে গ্রহটি সে হল মঙ্গল; আর এই মঙ্গল গ্রহেই মনে হয় মোটামুটি মানুষের বসবাসের উপযোগী তাপমাত্রা রয়েছে। পৃথিবী সূর্য থেকে যত দূরে মঙ্গল রয়েছে তার চেয়ে প্রায় আট কোটি কিলোমিটার (পাঁচ কোটি মাইল) বেশি দূরে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে তার দূরত্ব হয় মোটামুটি পাঁচ কোটি কিলোমিটার (সাড়ে তিন কোটি মাইল)। তবে দূরবীন দিয়েও মঙ্গলের ওপরটা খুব ভাল দেখা যায় না; আর তাই মঙ্গলের খাল আর মানুষ নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর বাইরের দিকের ঘোরাপথে মঙ্গল দু'বছর দু'মাস পর পর পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যায়। তবে মঙ্গলের ঘোরাপথ খুব বেশি রকম উপবৃত্তাকার, ফলে এমনি কাছে আসার সময় পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্বে বেশ হেরফের হয়। যখন মঙ্গল সবচেয়ে কাছে আসে, যেমন হয়েছিল ১৯৮৮ সালে, তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয় প্রায় ৫·৫ কোটি কিমি (৩.৫ কোটি মাইল), আবার যখন বেশ দূরে থাকে, যেমন ১৯৯৫ সালে হয়েছিল, তখন তার দূরত্ব হয়

১০ কোটি কিমি (৬ কোটি মাইল) অর্থাৎ প্রায় দু'গুণ। মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে ১৫ বা ১৭ বছর পর পর।

## মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ২০.৬৬ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ৫.৫৭ কোটি কিমি |
| গড় | ২২.৭৯ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ৩৯.৯০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ২৪.৯২ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| আকার | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) ২৪.৬ ঘণ্টা | |
| ভর (পৃথিবী=১) | ০.১১ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ১.৮৮ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ০.৫৩ | তাপমাত্রা: | -৮৭° সে. থেকে ১৭° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ৩.৯ | বায়ুমণ্ডল: | কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, আর্গন, অক্সিজেন, ক্রিপটন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি |

মঙ্গল আমাদের ৬৮৭ দিনে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে। তবে নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা ধীরে; তাই এক বছরে মঙ্গলের দিন হয় ৬৬৯টি। সূর্যের চারপাশে এর কক্ষপথ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি উপবৃত্তাকার; ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে সেখানে তাপমাত্রার তারতম্য হয় অনেক বেশি। নিজের কক্ষতলের সঙ্গে মঙ্গল তেরচা হয়ে আছে পৃথিবীর মতোই (পৃথিবী ২৩.৪°, মঙ্গল ২৫.২°)। তাই মঙ্গলে ঋতুবৈচিত্র্য ঘটে পৃথিবীর মতোই; অবশ্য সেখানে বছর আমাদের চেয়ে লম্বা, কাজেই ঋতুর দৈর্ঘ্যও পৃথিবীর তুলনায় বেশি। মঙ্গলের বেশিরভাগ জায়গা মরুভূমির মতো, লালচে-খয়েরি ধুলোমাটিতে ঢাকা। পাথরে জঙ ধরে লোহার মরচের মতো এই লাল রঙ তৈরি হয়েছে। লাল ধুলোর জন্য মঙ্গলের আকাশও লালচে দেখায়। তার উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে ঠাণ্ডা বেশি – সেখানে বরফ জমে; সে বরফে পানির বরফ যেমন আছে তেমনি আছে ঠাণ্ডায় জমাট হওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি মেরুর বরফ প্রায় উধাও হয়ে যায়, আবার পুরো শীতে বেশ কয়েক ফুট পুরু হয়ে ওঠে। মঙ্গলের গড় তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় বেশ কম। বিষুবরেখায় গ্রীষ্মের দুপুরে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সে. (৫০ ডিগ্রি ফা.)-এর ওপর যায় না; রাতে নামে তীব্র শীত। ভোরের দিকে তাপমাত্রা হতে পারে শূন্যের নিচে ১০০ ডিগ্রি সে.।

মঙ্গলের দুটো ছোট উপগ্রহ আছে: ফোবস আর ডেইমস, এ দুটোই আবিষ্কার করেছিলেন আসাফ হল (Asaph Hall) ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন খুব কাছে এসেছিল তখন। উপগ্রহ দুটোর আকার বেশ এবড়ো-থেবড়ো; দেখতে অনেকটা আলুর মতো। ফোবস চওড়ায় গড়পড়তা ২১ কিমি (১৩ মাইল), ডেইমস চওড়ায়

মাত্র ১২ কিমি (৭·৫ মাইল)। ফোবস ঘোরে মঙ্গলের মাত্র ৬,০০০ কি.মি. (৩,৭০০ মাইল ) ওপর দিয়ে, প্রতি ৭·৬ ঘণ্টায় একবার। ডেইমস ঘোরে ২০,০০০ কিমি (১২,৫০০ মাইল) ওপর দিয়ে, সোয়া দিনে একবার। এমনও হতে পারে যে এ দুটোই সুদূর অতীতে ছিল গ্রহাণু, কোনভাবে মঙ্গলের আকর্ষণে আটকা পড়ে গিয়েছে।

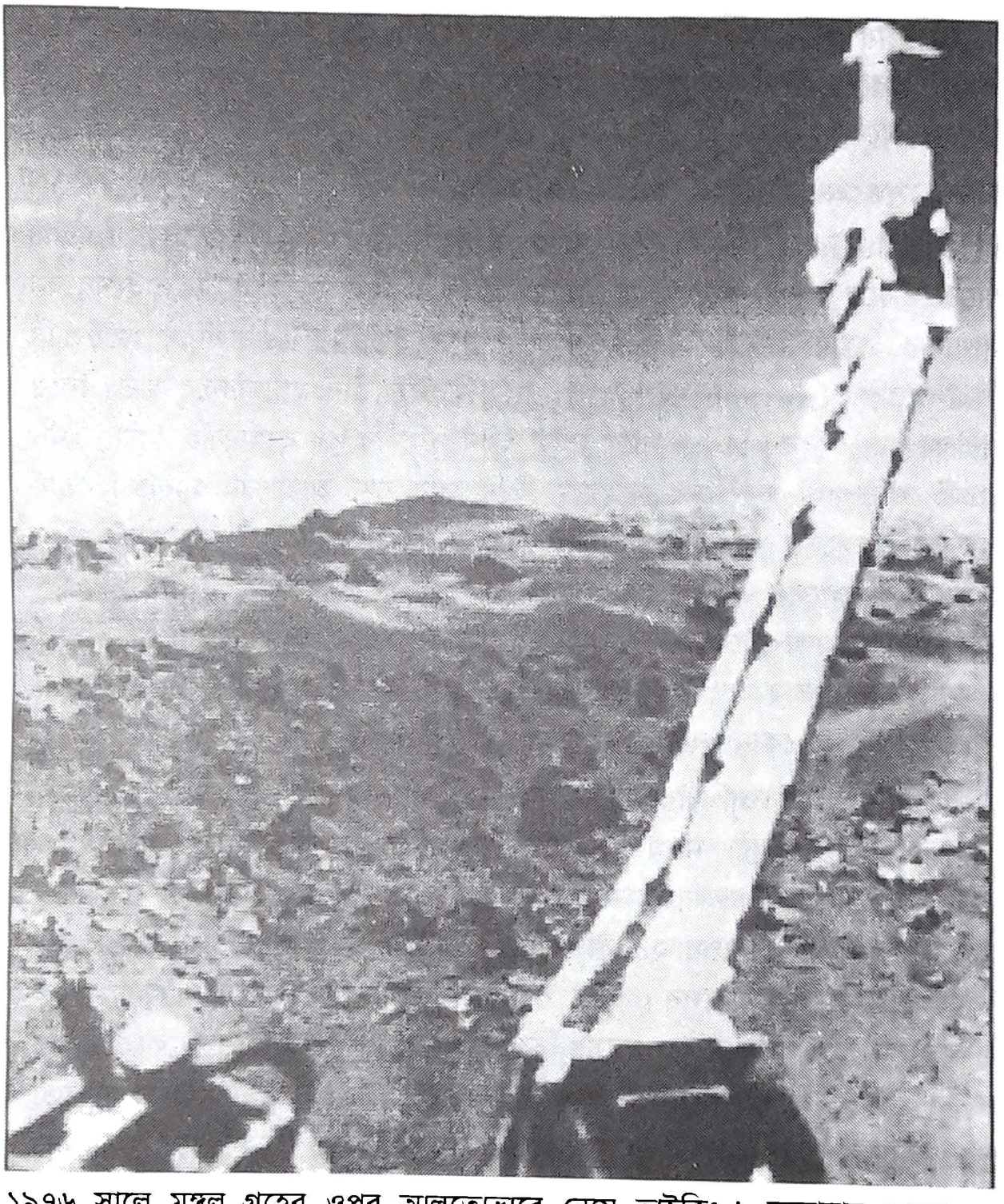

১৯৭৬ সালে মঙ্গল গ্রহের ওপর আলতোভাবে নেমে ভাইকিং-১ নভোযান মঙ্গলের ওপরকার লালচে-খয়েরি রঙের ধুলোমাটি পাথর খুবলে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে।

মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকের একটু ওপরে, কিন্তু দুটো গ্রহের স্থলভাগ প্রায় সমান, তার কারণ পৃথিবীর ওপরে প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ পানি, মাত্র

একভাগ স্থল; অথচ মঙ্গলে কোন পানি নেই, পুরোটাই স্থল। মঙ্গলের আকার পৃথিবী আর চাঁদের মাঝামাঝি; তার নিষ্ক্রমণ বেগ সেকেণ্ডে তিন মাইলের একটু ওপরে। ফলে তার ওপর বায়ুমণ্ডল রয়েছে খুব হালকা ধরনের; তাতে আছে প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড, তার চাপ পৃথিবীর ওপরকার চেয়ে একশভাগের একভাগেরও কম। মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও মনে করা হত মঙ্গল গ্রহে মানুষ বা এজাতীয় প্রাণী বাস করে। এমন কি এককালে অনেক নামকরা জ্যোতির্বিদও বিশ্বাস করতেন মঙ্গলে বিশাল সব খাল রয়েছে আর এসব খাল তৈরি করেছে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীবেরা।

উনিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস (Karl Friedrich Gauss) চাঁদে মানুষ আছে এ ধারণায় শুধু বিশ্বাস করতেন না, তারা যাতে দেখতে পায় সেজন্য সাইবেরিয়ায় বিশেষ জ্যামিতিক আকারের পাইনের বন লাগাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আরেক বিখ্যাত ইতালীয় জ্যোতির্বিদ জিওভান্নি শিয়াপারেলি (Giovanni Schiaparelli) মিলানে তাঁর মানমন্দিরে মঙ্গল নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে তখন একটি শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তিনি তার বড় আকারের মানচিত্র তৈরি করলেন। মঙ্গলের খয়েরি রঙের মরুভূমির মধ্যে তিনি কতকগুলো খাড়া খাড়া রেখা এঁকে বললেন এগুলো মঙ্গলের বুদ্ধিমান জীবদের তৈরি খাল; এর সাহায্যে তারা মেরু এলাকা থেকে উষর বিষুব এলাকায় চাষবাসের জন্য সেচের পানি নিয়ে আসে। অবশ্য তার আগেই বোঝা গিয়েছিল যে মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল যেমন হালকা তাতে তার ওপর কোন রকম সাগর থাকার সম্ভাবনা নেই।

মঙ্গল এরপর আবার পৃথিবীর কাছাকাছি আসে ১৮৯৪ সালে। পার্সিভাল লাওয়েল (Percival Lowell) নামে এক ধনাঢ্য মার্কিন জ্যোতির্বিদ ১৮৯৬ সালে অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফ নামক জায়গায় মঙ্গলকে দেখার জন্যই একটি মানমন্দির বানিয়ে ফেললেন; তারপর ২৪ ইঞ্চির শক্তিশালী প্রতিসরণ দূরবীন দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। এসব পরীক্ষা তিনি ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে যান। তিনিও মঙ্গলের গায়ের বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেন। লাওয়েলের খুব দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে আর তারা উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। অন্য বিজ্ঞানীরা অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি; তাঁরা বললেন আসলে লাওয়েল-এর দূরবীন ছিল খুবই ভাল, তবে তাঁর দেখার মধ্যেই কিছু ধাঁধা লেগেছিল।

অবশেষে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে মেরিনার-৪ নভোযান মঙ্গল গ্রহের কাছে গিয়ে তার ছবি আর খবরাখবর নিয়ে পৃথিবীতে পাঠাল। দেখা গেল মঙ্গলের গা

মোটেই পৃথিবীর মতো নয়, বরং চাঁদের মতো এবড়ো খেবড়ো, অসংখ্য খাদওয়ালা। আর বোঝা গেল মঙ্গলে আদৌ কোন খাল নেই, কোন রকম গাছপালার চিহ্নমাত্রও নেই। এতদিন যা বলা হচ্ছিল সে ছিল একেবারেই চোখের ধাঁধা। মঙ্গলের লালচে-খয়েরি ধুলোর প্রান্তর থেকে কোথাও কোথাও প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়ে নিচের কালো পাথর বেরিয়ে পড়েছে; তাকেই কেউ কেউ কাল রঙের খালের মতো বলে মনে করেছেন।

১৯৭১ সালে মেরিনার-৯ নভোযান মঙ্গলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করে আর বছরখানেক তার ওপর পর্যবেক্ষণ চালায়। তাতে দেখা গেল মঙ্গলের ওপর আছে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি – ৬০০ কিমি (৩৭০ মাইল) চওড়া, ২৫ কিমি (১৫·৫ মাইল) উঁচু; গ্রিক দেবতাদের আবাসের নামে তার নাম রাখা হল অলিম্পাস। তার চারপাশে ছড়ানো রয়েছে বিশাল সব লাভার প্রবাহ; তাতে মনে হয় ত্রিশ-চল্লিশ কোটি বছর আগেও এই আগ্নেয়গিরি জীবন্ত ছিল।

১৯৭৬ সালে দুটি ভাইকিং নভোযান আলতোভাবে নামে মঙ্গলের বুকে। দুটিই পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুদে পরীক্ষাগারে মঙ্গলের হাওয়া আর মাটির বিস্তারিত রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখে। তাতে বোঝা গেল মঙ্গলে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। সেখানকার হাওয়া আগে যা মনে করা হয়েছিল তার চেয়ে বরং আরো বেশি হালকা; তাতে কোন অক্সিজেন নেই বললেই চলে। আর হাওয়া এমন হালকা বলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সহজেই মঙ্গলের গায়ে এসে পড়তে পারে। তবে মঙ্গলে আজ কোন জীব নেই বলে যে কোনকালেই ছিল না তা অবশ্য বলা যায় না। নভোযান থেকে নেয়া ছবিতে মঙ্গলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এমন সব খাদ দেখতে পাওয়া যায় যা দেখে মনে হয় এককালে এখানে বিশাল সব নদীর প্রবাহ ছিল। এসব নদীর প্রবাহ হয়তো মঙ্গলের বুকে কোন ধরনের জীবেরও জন্ম দিয়েছিল। সেখানে যদি কোন জীবের উদ্ভব হয়ে থাকে তা হয়তো ছিল একেবারেই প্রাথমিক ধরনের। তবে প্রাণের চিহ্ন না থাকলেও মনে হয় মঙ্গলের মাটির তলায় এখনও পানি রয়েছে।

মঙ্গলের গা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কি করে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবেছেন। তার একটা কারণ হতে পারে মাধ্যাকর্ষণ কম হবার কারণে তার ওপরকার গ্যাস পালিয়ে যেতে থাকে। এদিকে মঙ্গলের ভেতরটা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসায় আগ্নেয়গিরিগুলো যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উগরে দিচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এক সময় হয়তো প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় ঢেকে দেয় মঙ্গলের আকাশ; তাতে সূর্যের আলো কমে গিয়ে তাপমাত্রা আরো নিচে নেমে যায়। সে তাপমাত্রা আর ওপরে উঠতে পারে নি।

## অবশেষে কি প্রাণের চিহ্ন?

এর মধ্যে ১৯৯৬ সালের ৭ আগস্ট আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'-র বিজ্ঞানীরা এক নাটকীয় ঘোষণায় বলেছেন মঙ্গল গ্রহে অতি প্রাচীনকালে যে প্রাণের লক্ষণ ছিল অবশেষে তার প্রমাণ মিলেছে। পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু এলাকায় ১৯৮৪ সালে একটা প্রায় দু'কেজি ওজনের পাথর পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বললেন সম্ভবত এটা মঙ্গলের গায়ের পাথর। প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে মঙ্গলের ওপর হয়তো কোন বস্তু এসে জোরে আঘাত করে; তার প্রচণ্ড তোড়ে মঙ্গলের গা থেকে কিছু বস্তু বহুদূর ছিটকে গিয়ে মহাকাশে ওঠে। সেগুলো সূর্যের চারপাশে নানা কক্ষপথে ভাসছিল; তারপর ১৩,০০০ বছর আগে কোনভাবে তার একটি খণ্ড পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে এসে দক্ষিণ মেরু এলাকায় পড়ে।

নাসার বিজ্ঞানীরা বলছেন এই পাথরটিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে তাঁরা তাতে কিছু আণুবীক্ষণিক গড়ন দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো জৈব অণু বলে মনে হয়। খুব সম্ভব আজ থেকে ৩৬০ কোটি বছর আগে মঙ্গলের গায়ে যথেষ্ট পানি ছিল; তখনই এধরনের প্রাণের উদ্ভব ঘটে। তারপর মঙ্গলের পানি শুকিয়ে যায়, তাই সেখানে প্রাণের আর বিকাশ ঘটতে পারেনি। এই ঘোষণা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও সব বিজ্ঞানী এখনও একে মঙ্গলের আদি প্রাণের নিশ্চিত প্রমাণ বলে মেনে নিতে পারছেন না। তবে ভবিষ্যতে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চয়ই আরো বিস্তৃত পরীক্ষা হবে; হয়তো তখন এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে জানা যাবে।

তবে পৃথিবীর বাইরে মানুষ যদি মহাকাশে কোথাও আস্তানা গাড়তে চায় তবে নিঃসন্দেহে মঙ্গলই হবে তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। আগামী একুশ শতকের শুরুতে এমনি আস্তানা তৈরির আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব সম্ভব আগামী বছর দশকের মধ্যেই মঙ্গলের রুক্ষ মাটিতে মানুষের পা পড়বে।

# আরো দূরের অভিযাত্রা

মানুষের ইতিহাসে মহাকাশ যুগের সূচনা হয় ১৯৫৭ সালে – যখন প্রথম স্পুৎনিক আকাশে ওঠে। তখনই কেবল মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন কাটিয়ে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছে। তারপর মহাকাশ জয়ের পথে কেবলই ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে যাওয়া: ১৯৬১ সালে প্রথম মানুষ ইউরি গাগারিন উঠেছে মহাকাশে; ১৯৬৯ সালে আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন নেমেছে চাঁদের মাটিতে। তেমনি আরেক ঐতিহাসিক মহাকাশ যাত্রা শুরু হল ১৯৭৭ সালের শেষদিকে যখন ভয়েজার-১ আর ২ নামে দুটি নভোযান সৌরলোকে অতি দূরের পাল্লায় যাত্রা করল মার্কিন মুলুকের কেপ ক্যানাভারাল থেকে।

দুটি নভোযানই ছিল হুবহু একই রকম— ৮১৫ কিলোগ্রাম ওজনের আর তৈরি হয়েছিল প্রায় ৬৫,০০০ যন্ত্রাংশ জুড়ে। সেগুলো ঠাসা ছিল নানা সংবেদী যন্ত্রে। সৌরলোকের অতিদূর এলাকায় সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সংগ্রহের কোন উপায় নেই, তাই তাতে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নভোযানের ক্রম গিয়েছিল একটু ওলট-পালট হয়ে; তাই ভয়েজার-২ যাত্রা করল আগে — ২০ আগস্ট তারিখে; তার কদিন পর ৫ সেপ্টেম্বর যাত্রা করল সাথী নভোযান ভয়েজার-১। গন্তব্য অতিদূরের দুই গ্রহ বৃহস্পতি আর শনি; যদি নাগাল মেলে তাহলে ইউরেনাস আর নেপচুনও।

বৃহস্পতি যখন আমাদের খুব কাছে আসে তখন তার দূরত্ব থাকে প্রায় ৬৩ কোটি কিলোমিটার আর শনি সবচেয়ে কাছে এলে তার দূরত্ব হয় প্রায় ১২৮ কোটি কিলোমিটার। কাজেই এদের কাছে একেবারে সরাসরি যেতেও লাগবে দু' আর চার বছর। কিন্তু ততদিনে তারাও যাবে এগিয়ে, তাই আসলে লেগে যাবে অনেক বছর সময়। এ দুটো গ্রহ বিশাল গ্যাসের পাঁজা; কাজেই এদের গায়ের ওপর নভোযানের নেমে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এরা হল প্রচণ্ড রকম ঠাণ্ডা আর তাদের ওপর রয়েছে ভয়ঙ্কর রশ্মির বিকিরণ। তবু সেসব কথা ভাল করে জানতে হলে যন্ত্রপাতি পাঠাতে হবে তাদের কাছাকাছি।

এ সময়ে মহাকাশে ঘটছিল এক আশ্চর্য যোগাযোগ। দেখা গেল অল্পদিনের মধ্যে সৌরজগতের বাইরের দিকের চারটি বড় গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুন এক লম্বা বাঁকানো রেখার ওপর এমনভাবে জোট বাঁধছে যে একটা বড় গ্রহের কাছাকাছি নভোযান পাঠাতে পারলে তার মাধ্যাকর্ষণের টানে নভোযানের বেগ বাড়িয়ে তাকে ছুট লাগানো যায় আরেক গ্রহের দিকে। বৃহস্পতির টান

নভোযানের পথ বাঁকিয়ে দেবে শনির দিকে, সেই সঙ্গে বাড়িয়ে দেবে তার বেগ; তাতে ভয়েজার আরো জোরে ছুটবে। এমনিভাবে শনির কাছাকাছি হলে শনির আকর্ষণ তাকে ঘুরিয়ে দেবে ইউরেনাসের দিকে, তারপর ইউরেনাস নেপচুনের দিকে। এভাবে ভয়েজার নেপচুনে পৌঁছে যাবে মাত্র ১২ বছরে; বড় গ্রহদের আকর্ষণ কাজে লাগাতে না পারলে সরাসরি নেপচুনে যেতে লাগত অন্তত ৩০ বছর সময়। গ্রহদের এমন যোগাযোগ ১৭৬ বছরের মধ্যে আর আসবে না।

স্থির হয় দুটি নভোযানের মধ্যে ভয়েজার-১ খোঁজ নেবে প্রধানত বৃহস্পতি আর শনির; ভয়েজার-২ আরো দূরের পাল্লার ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটোর। তবে ভয়েজার-২ রওনা দেবে আগে; অবশ্য কিছুটা সরাসরি পথে যাবার ফলে ভয়েজার-১ বৃহস্পতির কাছে পৌঁছবে আগে, তারপর যাবে শনিতে; সেখানে সে খুব কাছে থেকে শনির টাইটান নামে যে উপগ্রহে ঘন বায়ুমণ্ডল আছে তার খোঁজ-খবর নেবে। ভয়েজার-১ ঠিকভাবে কাজ করলে ভয়েজার-২ ছুটবে আরো দূরের গ্রহ ইউরেনাস আর নেপচুনের দিকে; তা না হলে সেটি শনির উপগ্রহ টাইটানের পথে রওনা হয়ে তার দিকেই বিশেষ করে নজর দেবার চেষ্টা করবে।

## গ্রহাণুদের এলাকা

মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে আছে অসংখ্য গ্রহাণু তা জানা ছিল আগে থেকেই। ভয়েজার প্রায় এক বছর ছোটার পর এই গ্রহাণুদের এলাকায় এসে পড়ে। গ্রহাণু অর্থ হল অতি ছোট গ্রহ; তাদের বেশিরভাগই খুব ছোটখাট আকারের, তবে অনেকগুলো বেশ বড়ও আছে। চারটি আছে যারা চওড়ায় চারশ' কিলোমিটারের ওপরে; তাদের নাম সিরেজ (১,০৩০ কিলোমিটার), ভেস্তা (৬০০ কিলোমিটার), পালাস (৫৫০ কিলোমিটার), আর হাইজিয়া (৪১০ কিলোমিটার)। এদের মধ্যে সিরেজের চেয়ে আকারে ছোট হলেও রঙ হালকা বলে ভেস্তাকে কখনো কখনো খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। বাইনোকুলার দিয়ে দেখা যায় চারটিকেই। শ'দুই গ্রহাণু আছে যারা চওড়ায় একশ কিলোমিটারের ওপরে ; আর ছোটখাট আকারের আছে হাজার হাজার। তবে সৌরজগতের সব গ্রহাণু মিলিয়ে ভর চাঁদের ভরের চেয়ে অনেক কম হবে।

এককালে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন সৌরজগতের এই এলাকায় কোন সময়ে একটা গ্রহ ছিল; সেটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে এসব গ্রহাণু সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানীরা মনে করেন আসলে বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণের কারণে এই এলাকায় আদৌ বড়সড় আকারের কোন গ্রহ সৃষ্টি সম্ভব হয় নি; যখনই মহাকাশে ভেসে থাকা বস্তু গ্রহ হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে তখনই বৃহস্পতির আকর্ষণ তাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। তাই সেখানে জমাট বাঁধতে পেরেছে কেবল কতকগুলো অতি ছোট গ্রহাণু।

সবচেয়ে বড় গ্রহাণু সিরেজ (Ceres) আবিষ্কার করেছিলেন ইতালীয় জ্যোতির্বিদ জি. পিয়াৎজি (G Piazzi) উনিশ শতকের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি। তিনি তারার তালিকা করতে গিয়ে দেখলেন একটা তারার মতো বস্তুর জায়গা যেন প্রতি রাতেই বদলে যাচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যে আরো তিনটি এমনি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হল: ১৮০২ সালে পালাস (Pallas), ১৮০৪ সালে জুনো (Juno), ১৮০৭ সালে ভেস্তা (Vesta)। আরেকটি, তার নাম আস্ট্রিয়া (Astræa), আবিষ্কৃত হল ১৮৪৫ সালে। আজ এমনি নাম-জানা গ্রহাণুর সংখ্যা হবে পাঁচ হাজারের ওপর। সবসুদ্ধ গ্রহাণু থাকতে পারে লাখ খানেক বা তারও বেশি। তবে তাদের বেশিরভাগই বেশ ছোট আর তাদের আকার এবড়ো থেবড়ো।

গ্রহাণুরা মোটামুটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকলেও কতকগুলো আছে এই জোটের বাইরে। তাদের মধ্যে কিছু কখনো আমাদের পৃথিবীর বেশ কাছাকাছি এসে পড়ে। এরকম একটির নাম এরস (Eros); এটি প্রথম দেখা যায় ১৮৯৮ সালে। এর আকার একটা লম্বা আলুর মতো—লম্বায় ৩৭ কিলোমিটার, চওড়ায় ১৪ কিলোমিটার। ১৯৩১ সালে এটি পৃথিবীর আড়াই কোটি কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছিল; এমনি আবারও আসতে পারে। অন্যান্য কিছু গ্রহাণু পৃথিবীর আরো কাছে আসে; পৃথিবী থেকে চাঁদ যতটা দূরে তার দ্বিগুণের চেয়ে কম দূর দিয়ে চলে যায় কিছু। তবে এদের আকার একেবারেই ছোটখাট।

কতকগুলো গ্রহাণু আছে যারা মোটামুটি বৃহস্পতির কক্ষপথেই ঘোরে, তবে বৃহস্পতির অনেকটা সামনে অথবা পেছনে, তাই বৃহস্পতি তাদের ধরে ফেলার জন্য নাগাল পায় না। কোনো কোনো ছোটখাট গ্রহাণুর কক্ষপথ অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক, অর্থাৎ খুব লম্বাটে ধরনের উপবৃত্ত। যেমন হিদালগো (Hidalgo) নামে একটি আছে যার কক্ষপথ ভেতর দিকে শুক্রের কক্ষপথ থেকে বাইরে প্রায় শনির কক্ষপথ পর্যন্ত ছড়ানো। আবার ইকারুস (Icarus) আর ফেথোন (Phæthon) নামে দুটি গ্রহাণু আছে যেগুলো একেবারে বুধের কক্ষপথের ভেতরে চলে যায়; তখন তাদের গা নিশ্চয়ই সূর্যের তাপে গনগনে গরম হয়ে ওঠে।

কিছুটা অদ্ভুত গ্রহাণু হল কাইরন (Chiron); এর আবিষ্কার ১৯৭৭ সালে। এটির ব্যাস প্রায় ৩২০ কিলোমিটার আর কক্ষ পরিক্রমার সময় প্রায় ৫১ বছর। এটি বেশির ভাগ সময় থাকে শনি আর ইউরেনাসের মাঝামাঝি কক্ষপথে। সূর্যের কাছাকাছি এলে মনে হয় এর গা যেন ধূমকেতুর মতো ঝাপসা হয়ে উঠছে; কিন্তু ধূমকেতু কখনো এত বড় হয় না। সম্ভবত সূর্যের কাছে এলে এর গায়ের বরফ বাষ্প হয়ে গ্যাসের আবরণ সৃষ্টি করে।

গ্রহাণুর এলাকা পেরিয়ে যাবার সময় বিজ্ঞানীদের একটা ভয় ছিল যদি ভয়েজারের সঙ্গে দৈবাৎ কোন গ্রহাণুর ধাক্কা লেগে যায় তবে তার যাত্রা সেখানেই সাঙ্গ হবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না; দুটি নভোযানই নিরাপদে সে এলাকা পেরিয়ে গেল।

## দানব গ্রহ বৃহস্পতি

বৃহস্পতি হল গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড়; এমন বড় যে অন্য সবগুলো গ্রহ একসঙ্গে মিলিয়ে তার অর্ধেকও হবে না। পৃথিবীর চেয়ে এগারগুণ চওড়া বৃহস্পতি অতি দূরে হলেও আকাশে খালি চোখেও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র শুক্র (এবং কখনো কখনো মঙ্গল) এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। বৃহস্পতির আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ১,৪০০ গুণ বড় হলেও ভর মাত্র ৩১৮ গুণ বেশি; এর অর্থ বৃহস্পতির ঘনত্ব পৃথিবীর মাত্র চারভাগের একভাগ; অর্থাৎ তার শরীর মূলত গ্যাস দিয়ে তৈরি।

## বৃহস্পতি গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ৭৪.০৬ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ৬২.৮৭৬ কোটি কিমি |
| গড় | ৭৭.৮৪ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ৯৭.০০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ৮১.৬০ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| **আকার** | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ৯.৮ ঘণ্টা |
| ভর (পৃথিবী=১) | ৩১৭.৮ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ১১.৮৬ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ১১.২ | তাপমাত্রা: | -১২৫° সে. থেকে ১৭° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ১.৩ | বায়ুমণ্ডল: | হাইড্রোজেন, হিলিয়াম; অতি সামান্য মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনক্সাইড, জলীয় বাষ্প |

বৃহস্পতির 'বছর' আমাদের বার বছরের কাছাকাছি, কিন্তু 'দিন' দশ ঘণ্টারও কম। দূরবীনের ভেতর দিয়ে বৃহস্পতিকে দেখায় হলদে চাকতির মতো; তার ওপর আছে নানা রকম দাগ। গ্যাসে মোড়া দেহ নিয়ে অতি বেগে নিজের অক্ষের ওপরে ঘোরার কারণে এসব দাগ দ্রুত বদলে যেতে থাকে। আর এত জোরে ঘোরার ফলে তার বিষুব এলাকা বেশ ফুলে ওঠা। বৃহস্পতির মেঘগুলোও নানা রঙে রাঙানো; তার মধ্যে রয়েছে এক বিশাল লালচে দাগ। এই লাল রঙের ঘূর্ণির এলাকা প্রথম দেখা যায় ১৬৬৪ সালে। এটা এত বড় যে এর ভেতর তিনটা পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন লম্বায় ৫০,০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি এই দাগ আসলে এক বিশাল ঝড়ের এলাকা; রঙটা সম্ভবত হাওয়ায় লাল ফসফরাস থাকার জন্য। আশপাশে আছে কতকগুলো সাদা সাদা গোল দাগ।

ভয়েজারের আগে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল পায়োনিয়ার-১০ (১৯৭৩) ও পায়োনিয়ার-১১ (১৯৭৪) নভোযান; সেসব থেকে বৃহস্পতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়েছিল। তখনই বোঝা গিয়েছিল বৃহস্পতির আশপাশে বেশ কড়া চৌম্বক

ক্ষেত্র আর বিকিরণ এলাকা আছে; আর তা থেকে বেতার তরঙ্গ বেরোয়। এক সময়ে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন বৃহস্পতি হয়তো একটা ছোটখাট তারা; তার ভেতরের তাপে উপগ্রহগুলো উষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেল বৃহস্পতির কেন্দ্রের তাপমাত্রা অন্তত ৩০,০০০ ডিগ্রি সে. হলেও তার বাইরের দিকটা প্রচণ্ডরকম ঠাণ্ডা। এখন মনে করা হয় এর ভেতরে পৃথিবীর চেয়ে কিছুটা বড় একটি পাথুরে কেন্দ্রের চারপাশে আছে প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার পুরু একটি ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর (প্রচণ্ড চাপে হাইড্রোজেন ধাতব রূপ নেয়, তবে তার তাপমাত্রা ১০,০০০ ডিগ্রি সে.-এর ওপরে, তাই সেটা কঠিন নয়, তরল); তার ওপর আছে প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার পুরু তরল হাইড্রোজেনের স্তর; তার ওপর কয়েকশ কিলোমিটার পুরু 'বায়ুমণ্ডল'।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন (৮০ শতাংশ) আর হিলিয়াম (২০ শতাংশ); তার সঙ্গে আছে হাইড্রোজেনের কিছু যৌগ, যেমন অ্যামোনিয়া আর মিথেন। ভেতরের তাপে কিছু কিছু গ্যাস ওপর দিকে উঠে স্তরে স্তরে মেঘমালা সৃষ্টি করে; তার ভেতর দিকের স্তরে হয়তো থাকে পানির বরফের কণা, ওপর দিকে অ্যামোনিয়ার কণা। বৃহস্পতির ধাতব কেন্দ্রে বিদ্যুৎ চলাচল করে, তাতেই তার তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী। আর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণেই তার চারপাশে রয়েছে প্রবল বিকিরণ এলাকা।

কিছুটা সোজা পথে ১৯৭৯-এর ৫ মার্চ ভয়েজার-১ বৃহস্পতির কাছাকাছি পৌঁছে সেখানকার প্রবল বিকিরণ এলাকার খবর দেয়; বোঝা গেল বেশি কাছে গেলে ভয়েজারের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়তে পারে; তবে বৃহস্পতির মেঘমালার ওপরে দেড় লাখ কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া মোটামুটি নিরাপদ হবে। চার মাস পর ৯ জুলাই ভয়েজার-২ গিয়ে পৌঁছায় বৃহস্পতির এলাকায়। হাওয়ার বেগ মেপে বোঝা গেল বৃহস্পতির ওপর দিয়ে সর্বক্ষণ বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ঝড়। নভোযান থেকে দেখা গেল বৃহস্পতির চারপাশে কালচে রঙের বলয়, পৃথিবী থেকে এটা দেখা যায় না; বৃহস্পতির এই বলয় মোটেই শনির বলয়ের মতো নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই বলয় মূলত তরল অ্যামোনিয়ার কণা দিয়ে তৈরি।

বৃহস্পতি তার অক্ষের ওপর ঘুরছে প্রবল বেগে, দশ ঘণ্টায় একবার। তার চারপাশে আছে ১৬টি উপগ্রহ বা চাঁদ। বড় চারটি উপগ্রহ গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো, ইয়ো আর ইউরোপা ১৬১০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন গ্যালিলিও; তাদের একেকটার চেহারা একেক রকম। বাইরের দিকের যে দুটি, ক্যালিস্টো আর গ্যানিমিড, তারা আকারে আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়। বাকি

দুটোর আকারও চাঁদের কাছাকাছি। গ্যানিমিড (ব্যাস ৫,২৮০ কিলোমিটার) আসলে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ; সে বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। ক্যালিস্টোর (ব্যাস ৪,৮২০) আকারও বুধের প্রায় সমান। এদের দুয়েরই গা খাদওয়ালা, বরফ ঢাকা; কোথাও কোথাও বরফের গায়ে কালো ময়লা জমা; ক্যালিস্টোর গায়ে খাদ অসংখ্য। এদের প্রাণহীন দেহে বহু কোটি বছর ধরে কোন রকম পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। ভেতর দিকে তার পরের উপগ্রহ ইউরোপা; এর চকচকে গায়ে কোন খাদ নেই, পাহাড় বা উপত্যকাও নেই, শুধু আছে সামান্য গভীর কিছু নিচু এলাকা। যেন অনেক ফাটলওয়ালা বিশাল এক ডিমের খোলস। ইউরোপার গায়ে যদি বরফ থাকে তাহলে তার ভেতরে যেখানে ঠাণ্ডা ওপরের মতো তেমন প্রবল নয় সেখানে তরল পানি থাকা খুবই সম্ভব।

তার পরের উপগ্রহ যে ইয়ো (Io) সে আরো আশ্চর্য। তার ওপর বরফের চিহ্নমাত্র নেই, বরং তার লালচে গা যেন ইতালীয় খাবার পিৎসার মতো টকটকে আর এবড়ো থেবড়ো। মাঝে মাঝে আছে কালচে দাগ আর আগ্নেয়গিরির উদ্গারের চিহ্ন। জানা গেল তার গায়ের অসংখ্য আগ্নেয়গিরি থেকে ফুঁসে ওঠে গন্ধক, তাই মাটিতে গড়িয়ে পড়ে অমন লাল রঙের সৃষ্টি। ভয়েজার থেকেই দেখা গেল ইয়োর ওপর গোটা দশেক আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায় ৩০০ কিমি (২২০ মাইল) পর্যন্ত ফুঁসে উঠছে গন্ধক আর গন্ধক অক্সাইড। পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোথাও এমন জীবন্ত আগ্নেয়গিরির খোঁজ পাওয়া যায় নি। তার ওপর ইয়ো ঘুরছে বৃহস্পতির মারাত্মক বিকিরণের ভেতর দিয়ে। আগে মনে করা হত শুক্রের মতো ভয়ঙ্কর জায়গা বুঝি সৌরজগতে আর কোথাও নেই। এখন দেখা যাচ্ছে ইয়ো তাকেও ছাড়িয়ে যাবার যোগাড়।

বৃহস্পতির আরো যে ১২টি উপগ্রহ আছে তারা সবাই চওড়ায় ৩০০ কিলোমিটারের কম। তাদের সম্বন্ধে খবরাখবর পাবার জন্য আমেরিকার নাসা ১৯৮৯ সালের ১৮ অক্টোবর গ্যালিলিও নামে প্রায় আড়াই টন ওজনের এক নভোযান পাঠিয়েছে বৃহস্পতির দিকে; এটি ১৯৯৫ সালের শেষদিকে বৃহস্পতির কাছে পৌঁছে ৭ ডিসেম্বর তার গায়ে নামিয়ে দিয়েছে একটি সন্ধানী যান; সেটা ঘণ্টাখানেক ধরে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে নামতে নামতে নানারকম তথ্য পাঠিয়েছে তবে ৬০০ কিলোমিটার নেমেও কোন কঠিন তল পায়নি। জানা গেছে বৃহস্পতি সূর্য থেকে যে পরিমাণ কিরণ পায় তার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি সে বিকিরণ করে। গ্যালিলিও আরো বেশ কিছুকাল বৃহস্পতির চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে সেখান থেকে তথ্য যোগাড় করতে থাকবে।

## অপরূপ শনির রাজ্যে

প্রাচীনকালে শনি ছিল আকাশের সবচেয়ে দূরের গ্রহ। জ্যোতিষীরা ভাবতেন গ্রহটি অলক্ষুণে। কিন্তু দূরবীনের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠল তার আরেক চেহারা। বৃহস্পতি হল সৌরজগতের সবচেয়ে বিশাল গ্রহ, আর দূরবীনের ভেতর দিয়ে শনিকে দেখায় অপরূপ রূপময়। শনির গায়ে বৃহস্পতির মতো অমন রঙচঙে দাগ টানা নেই কিন্তু তার চারপাশে আছে এক তুলনাহীন বলয়ের সমাবেশ।

## শনি গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ১৩৪.৯৯ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ১২৭.৭৪ কোটি কিমি |
| গড় | ১৪২.৯৪ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ১৬৫.৮০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ১৫০.৮৯ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| আকার | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ১০.৬৬ ঘণ্টা |
| ভর (পৃথিবী=১) | ৯৫.১ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ২৯.৪৬ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ৯.৪২ | তাপমাত্রা: | -১৭৬° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ০.৭ | বায়ুমণ্ডল: | হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অতি সামান্য মিথেন, অ্যামোনিয়া, ইথেন ও ফসফিন |

গ্রহ পরিবারে আয়তনের দিক দিয়ে বৃহস্পতির পরই শনির স্থান; বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর ১১ গুণ, আর শনির ৯ গুণ। ধরনের দিক দিয়েও দুটো মোটামুটি একই রকম। ভেতরে আছে একটা পাথুরে কেন্দ্রবস্তু, সম্ভবত তার তাপমাত্রা ১৫,০০০ ডিগ্রি সে.; তার ওপরে কঠিন আর তরল হাইড্রোজেনের স্তর, তারপর গভীর 'বায়ুমণ্ডল', তাতে আছে প্রধানত হাইড্রোজেন (৮৮ শতাংশ), হিলিয়াম (১১ শতাংশ) আর মিথেনজাতীয় হাইড্রোজেন যৌগ। তবে শনির গড় ঘনত্ব গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে কম, এমন কি পানির চেয়েও কম। একে এমন কম ঘনত্ব তার ওপর শনি নিজের অক্ষের ওপর ঘুরপাক খায় মাত্র সোয়া দশ ঘণ্টায় একবার; কাজেই তার বিষুব এলাকা রীতিমতো ফুলে ওঠা – বিষুবীয় ব্যাসের চেয়ে মেরুব্যাস ১০ শতাংশ কম। বৃহস্পতির মতোই শনির ওপরের স্তরের মেঘমালা অতি শীতল।

পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীন দিয়েও শনির বিষুবীয় এলাকা জুড়ে বলয় স্পষ্ট দেখা যায়। বহুকাল ধরে জ্যোতির্বিদরা তিনটি বলয় দেখতেন; তার বাইরের দুটো বেশ উজ্জ্বল, আর ভেতর দিকের একটা কিছুটা আবছা। এসব বলয় যে কী দিয়ে তৈরি তা তাঁদের কাছে ছিল এক রহস্য। সেসব কঠিন বা তরল হলে শনির প্রবল

আকর্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিত, কেননা শনির ভর পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৯৫ গুণ বেশি। তাঁরা বললেন ওগুলো সম্ভবত অসংখ্য বরফমোড়া পাথরের খণ্ডে তৈরি; সেগুলোর আকার ছোটখাট ধুলোর কণা আর নুড়ির আকার থেকে চেয়ার-টেবিলের মতো বড়। ভয়েজার থেকে দেখা গেল আসলে বলয় আছে হাজার হাজার। তাদের মধ্যে আবার আছে আড়াআড়ি রেখা। বলয়ের এমাথা থেকে ওমাথা প্রায় ২৭৫,০০০ কিমি (১৭০,০০০ মাইল); তবে পুরু কয়েকশ মিটারের বেশি নয় – কোথাও মাত্র পাঁচ মিটার।

শনির কাছে এর আগে আরো একটি নভোযান গিয়েছিল: পায়োনিয়ার-১১ (১৯৭৯); তবে তার সম্বন্ধে খবরাখবর প্রধানত ভয়েজার ১ আর ২ থেকেই পাওয়া গেল। ভয়েজার-১ শনির কাছে পৌঁছল ১২ নভেম্বর ১৯৮০ আর ভয়েজার-২ পৌঁছল ২৫ আগস্ট ১৯৮১। বৃহস্পতির মতো অতটা জোরালো না হলেও শনিরও চৌম্বক ক্ষেত্র আছে জানা গেল। শনির গা থেকে যে বিকিরণ বেরোয় তাও বৃহস্পতির মতো অতটা তীব্র নয়।

শনির ১৮টা উপগ্রহের কথা জানা গেছে; তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল টাইটান। একে পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীন দিয়েই দেখতে পাওয়া যায়। এটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্স (Christiaan Huygens) ১৬৫৫ সালে। টাইটান (ব্যাস ৫,১৫০ কিলোমিটার) আমাদের চাঁদ এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। ভয়েজার থেকে জানা গেল টাইটানের ওপর আছে প্রায় তিনশ কিলোমিটার পুরু ঘন বায়ুমণ্ডল, তার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন, আর আছে কিছু মিথেন; তার গায়ে থাকতে পারে ইথেন-এর সাগর। এই বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি ; সৌরজগতে আর কোন উপগ্রহে এমন ঘন বায়ুমণ্ডল নেই।

মাত্র ৪০০ কিলোমিটার চওড়া উপগ্রহ মিমাস-এর গায়ে আছে এক বিশাল খাদ – মিমাস যতটা চওড়া তার প্রায় তিন ভাগের একভাগ জুড়ে; মনে হয় একসময় মহাকাশের আর কোন বস্তু তার গায়ে জোরে ধাক্কা মেরেছিল। এনসেলাডাস নামে উপগ্রহের ওপরে খানিকটা অংশ খাদওয়ালা, খানিকটা বরফের মতো মসৃণ। টেথিজ যেন আগাগোড়া বরফে তৈরি; ডায়োন আর রীয়া খাদওয়ালা। বাইরের দিকের বড়সড় আকারের উপগ্রহ আয়াপেটাস প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার চওড়া; এর গায়ের খানিকটা অতি কালো আর খানিকটা বরফের মতো অতি সাদা। এর ঘনত্ব বরফের কাছাকাছি, কাজেই এর গা বরফে তৈরি হওয়া সম্ভব; কালো দাগ হয়তো কোন কারণে উপগ্রহের ত্বক থেকেই বেরিয়েছে।

১৯৯৬ সালে 'ক্যাসিনি' নামে এক নভোযান শনির দিকে যাত্রা করে; সেটা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে ২০০২ সালে; তা থেকে শনি সম্বন্ধে হয়তো আরো নতুন খবর জানা যাবে।

## দূরের গ্রহ ইউরেনাস

১৭৮১ সাল পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল সৌরজগতের সীমানা শনিতেই শেষ। কিন্তু সে বছর উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) নামে এক শৌখিন জ্যোতির্বিদ বিলেতে তাঁর নিজ হাতে তৈরি দূরবীন দিয়ে আকাশ পরীক্ষা করতে করতে নতুন গ্রহ ইউরেনাসকে আবিষ্কার করে ফেললেন। গ্রহটি রয়েছে সূর্য থেকে শনির চেয়ে দু'গুণের বেশি দূরে ; কাজেই রাতারাতি সৌরজগতের এলাকা দু'গুণের ওপর বেড়ে গেল। ইউরেনাসের ব্যাস শনির অর্ধেকেরও কম ; আয়তন পৃথিবীর ৬৭ গুণ, তবে ভর পৃথিবীর ১৪.৫ গুণ। আকাশে ঠিক কোথায় তাকাতে হবে তা জানলে একে খালি চোখে কোন মতে দেখতে পাওয়া যায়; বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে সুবিধে। তবে দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলেও এর হালকা সবুজ গোলকে তেমন কিছু দেখা যায় না।

### ইউরেনাস গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ২৭৩.৯৩ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ২৫৮.৭০ কোটি কিমি |
| গড় | ২৮৭.৫০ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ৩১৫.৬০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ৩০১.০৭ কোটি কিমি | **ঘূর্ণন** | |
| **আকার** | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ১৭.২৪ ঘণ্টা |
| ভর (পৃথিবী=১) | ১৪.৫ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ৮৪.০১ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ৪.০১ | **তাপমাত্রা:** | -২১৬° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ১.২ | **বায়ুমণ্ডল:** | হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন |

ইউরেনাস বৃহস্পতি আর শনির তুলনায় অনেক ছোট হলেও এর ব্যাস পৃথিবীর চারগুণ; তাই এটি দানব গ্রহদের দলেই পড়ে। এর এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল এটা খাড়া অবস্থা থেকে ৯৮ ডিগ্রি কাত হয়ে রয়েছে; তাই এর ঋতুগুলো অদ্ভুত ধরনের। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে ইউরেনাসের লাগে আমাদের ৮৪ বছরের সমান; তাই এর ঋতু অতি লম্বা। প্রথমে এক মেরু তারপর অন্য মেরুতে সূর্য দেখা যায় একনাগাড়ে পৃথিবীর ২১ বছর সময় ধরে; বিপরীত মেরু ততদিন থাকে অন্ধকারে। গ্রহটি নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে ১৭.২ ঘণ্টায়, তাই সেখানে এক 'বছরে' 'দিন' হয় ৪২,০০০; কখনো তার বিষুব অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা। ইউরেনাসের এমন কাত হয়ে ঘোরার কোন কারণ বিজ্ঞানীরা এখনও খুঁজে পাননি।

ভয়েজার-২ ইউরেনাসের কাছে গিয়ে পৌঁছায় ১৯৮৬-র ২৪ জানুয়ারি। দেখা গেল ইউরেনাসেরও মোটামুটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র আর কিছু বেতার তরঙ্গ বিকিরণ

রয়েছে। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল এর চৌম্বক অক্ষ যেন তার আবর্তন অক্ষের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণ করে আছে। ইউরেনাসের ওপর হালকা মেঘমালা রয়েছে, তবে তা মোটেই বৃহস্পতি বা শনির মতো নয়; আর সেসব মেঘ গ্রহের চারদিকে ঘোরে ধীরে ধীরে। ইউরেনাসের চারপাশে হালকা কালচে রঙের এগারটা বলয় রয়েছে; সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে আছে কয়েক ফুট চওড়া আকারের বস্তুখণ্ড আর প্রচুর ধুলোর কণা।

ইউরেনাসের ভেতরে তেমন কোন তাপের উৎস আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত এর ভেতর আছে একটি পাথুরে কেন্দ্র, তার ওপরে আছে পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন এসবের বরফ মেশানো গ্যাসের ঘন স্তর। তার ওপর হয়তো আছে প্রধানত হাইড্রোজেন এবং তার সঙ্গে হিলিয়াম ও অন্যান্য গ্যাস মেশানো 'বায়ুমণ্ডল'।

ইউরেনাসের পাঁচটি বড়সড় উপগ্রহের কথা আগেই জানা ছিল, ভয়েজার আরো দশটার হদিস দিল। বড় উপগ্রহদের মধ্যে ওবেরন আর টাইটানিয়া – দুটোরই ব্যাস প্রায় হাজার কিলোমিটার – বরফ ঢাকা আর খাদওয়ালা। উমব্রিয়েল কিছুটা ছোট আকারের তবে তার কালচে দেহের একপাশে একটা উজ্জ্বল এলাকা আছে; এটা কি তা এখনও বোঝা যায়নি। এরিয়েলের আকারও প্রায় একই রকম; এর ওপর বরফ, খাদ আর পানি চলার নালার মতো রয়েছে, কিন্তু এমন ছোট উপগ্রহে কখনো পানি ছিল বলে মনে হয় না। ছোটখাট উপগ্রহ মিরাণ্ডার ব্যাস মাত্র পাঁচশ কিলোমিটার, কিন্তু এর ওপরটায় আশ্চর্য রকম বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। অনেক খাদ ছাড়াও একপাশে রয়েছে প্রায় আট কিলোমিটার উঁচু এক বরফঢাকা পাহাড়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন উপগ্রহটি হয়তো বারবার কোন কিছুর প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙ্গে গিয়ে আবার জোড়া লেগেছে, তাতেই তার গায়ের ওপর অমন এবড়ো থেবড়ো গড়ন তৈরি হয়েছে।

ভয়েজার ইউরেনাসের যে দশটি ছোট উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে তাদের সবারই নাম দেয়া হয়েছে শেক্সপিয়ারের নায়ক-নায়িকাদের নামে, যেমন কর্ডেলিয়া, ওফেলিয়া, ডেসডেমোনা, পাক ইত্যাদি। আরেক মজার ব্যাপার হল ইউরেনাস আর তার ১৫টি উপগ্রহের সব কটিই ঘোরে পুব থেকে পশ্চিমে – সৌরজগতের স্বাভাবিক নিয়মের উল্টো।

## নেপচুন আর প্লুটো

ইউরেনাসকে ছাড়িয়ে ভয়েজার-২ রওনা হল নেপচুনের দিকে। এর মধ্যে তার যন্ত্রপাতিতে কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল; পৃথিবী থেকেই বিজ্ঞানীরা তার কম্পিউটার প্রোগ্রামে পরিবর্তন করে তা কাটিয়ে ওঠেন। ১৯৮৯ সালের ২৫ আগস্ট অর্থাৎ রওনা হবার এক যুগ পর ভয়েজার-২ পৌঁছল নেপচুনের কাছে।

নেপচুনের আবিষ্কার হয় বেশ অদ্ভুতভাবে। ইউরেনাস আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিদরা তার কক্ষপথ হিসেব করতে গিয়ে এক সমস্যায় পড়েন। দেখা গেল ইউরেনাস যে পথে চলাচল করার কথা ঠিক সে পথে চলছে না ; মনে হচ্ছে আরো দূরের কোন অদৃশ্য গ্রহ তার চলার পথ বদলে দিচ্ছে। এই গরমিল থেকে হিসেব কষে জন অ্যাডামস (John Adams) নামে এক ইংরেজ গণিতবিদ আর লে ভেরিয়ে (Le Verrier) নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে এই অদৃশ্য গ্রহের অবস্থান বের করলেন। লে ভেরিয়ে যে হিসেব কষেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে ইয়োহান গাল (Johann Galle) এবং হাইনরিখ ডারেস্ট (Heinrich D'Arrest) নামে দু'জন জার্মান জ্যোতির্বিদ ১৮৪৬ সালে গ্রহটি খুঁজে পান। গণিতের হিসেবের ওপর নির্ভর করে এভাবে আকাশের বুকে অজানা গ্রহ খুঁজে পাওয়া জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

## নেপচুন গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ৪৪৬.৫৬ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ৪৩১.৩০ কোটি কিমি |
| গড় | ৪৫০.৪৩ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ৪৬৮.৩০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ৪৫৪.৬১ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| আকার | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ১৬.০ ঘণ্টা |
| ভর (পৃথিবী=১) | ১৭.২ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ১৬৪.৭৯ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ৩.৮৮ | তাপমাত্রা: | -২১৮° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ১.৭ | বায়ুমণ্ডল: | হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন |

নেপচুনের কাছাকাছি এলাকায় সূর্যের আলো পৌঁছায় অতি কম। তবু তার ওপর হালকা বলয় দেখা গেল ঠিকই। নেপচুন ইউরেনাসের চেয়ে সামান্য ছোট কিন্তু অনেকটা ভারি। নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ৭২ গুণ বড় কিন্তু তার ভর ১৭ গুণ বেশি। এর গা ইউরেনাসের মতো হালকা সবুজ নয়, হাওয়ার মিথেনের কারণে নীলচে; এর অক্ষও ইউরেনাসের মতো হেলানো নয়, তবে চৌম্বক অক্ষ ৪৭ ডিগ্রি হেলানো। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন সূর্য থেকে এত দূরে নেপচুনে হাওয়ার চলাচল কম হবে ; কিন্তু দেখা গেল সেখানে হাওয়া বয় প্রচণ্ড বেগে, কোন কোন অক্ষাংশে ঘণ্টায় ২,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। তাতে বোঝা যায় এর ভেতরে বৃহস্পতি আর শনির মতোই তাপের উৎস রয়েছে। ভয়েজার থেকে দেখা গেল নেপচুনের বুকে গাঢ় রঙের বিশাল এক ঝড়ের এলাকা; তার ওপর ভাসছে মিথেনের বরফ মেশানো মেঘ। এই ঝড়ের এলাকার আকার প্রায় পৃথিবীর সমান। নেপচুন সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে আমাদের ১৬৫ বছরে আর সেখানে দিন-রাত হয় মোটামুটি ষোল ঘণ্টায় ।

নেপচুনের বড়সড় উপগ্রহ ট্রাইটন (Triton) আর একটি ছোট উপগ্রহ নেরেইদ (Nereid)-এর কথা আগে থেকেই জানা ছিল; ভয়েজার আবিষ্কার করল আরো ছ'টি ছোটখাট উপগ্রহ। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট ট্রাইটনের (ব্যাস ২,৭০০ কিমি) গায়ের তাপমাত্রা মাপা হল –২০৫ ডিগ্রি সে.; এমন ঠাণ্ডা জায়গা কোন নভোযান সৌরজগতের আর কোথাও পায়নি। ট্রাইটনের বায়ুমণ্ডল প্রধানত নাইট্রোজেন। তার গায়ের ওপর লালচে জমাট নাইট্রোজেন আর মিথেনের বরফ। তার তলায় সম্ভবত আছে তরল নাইট্রোজেনের সমুদ্র। কোথাও কোথাও বরফের ভেতরকার ফাটল থেকে অনেক উঁচুতে ছিটকে ওঠে তরল নাইট্রোজেন আর নাইট্রোজেন গ্যাসের ফোয়ারা – ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) উঁচু পর্যন্ত।

## প্লুটো গ্রহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| সূর্য থেকে দূরত্ব | | পৃথিবী থেকে দূরত্ব | |
|---|---|---|---|
| অনুসূর অবস্থা | ৪৪২.৫১ কোটি কিমি | সর্বনিম্ন | ৪২৯.০০ কোটি কিমি |
| গড় | ৫৯০.০১ কোটি কিমি | সর্বোচ্চ | ৭৫২.০০ কোটি কিমি |
| অপসূর অবস্থা | ৭৩৭.৫১ কোটি কিমি | ঘূর্ণন | |
| আকার | | ঘূর্ণনকাল (নিজ অক্ষের চারপাশে) | ৬.৪ দিন |
| ভর (পৃথিবী=১) | ০.০০৪ | সূর্যের চারপাশে আবর্তন | ২৪৭.৭ বছর |
| ব্যাস (পৃথিবী=১) | ০.১৮ | তাপমাত্রা: | -২২৩° থেকে. -২৩৩° সে. |
| গড় ঘনত্ব (পানি=১) | ১.৯৯ | বায়ুমণ্ডল: | মিথেন |

কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন ট্রাইটন গোড়ায় নেপচুনের উপগ্রহ ছিল না, সে ঘুরে বেড়াত নিজের মতো; পরে কোন সময়ে নেপচুনের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে তার উপগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সব উপগ্রহ নেপচুনের চারপাশে ঘোরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে, ট্রাইটন ঘোরে ঘড়ির কাঁটার মতো।

নেপচুনের আবিষ্কার যেমন অদ্ভুতভাবে হয়েছিল তেমনি অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার হয় দূরের গ্রহ প্লুটোর। বিজ্ঞানীরা নেপচুনের কক্ষপথ নিয়ে তেমন খুশি হতে পারছিলেন না। যেন আরো দূরের কোন গ্রহ তার কক্ষপথ কিছুটা বদলে দিচ্ছে। বিশ শতকের শুরুর দিকে জ্যোতির্বিদ পার্সিভাল লাওয়েল বললেন, দূরে আরো একটি গ্রহ আছে; তিনি তাঁর কক্ষপথও হিসেব করে বের করলেন। তবে লাওয়েল গ্রহটি খুঁজে পাননি; তাঁর মৃত্যুর ১৪ বছর পর ১৯৩০ সালে ক্লাইড টমবো (Clyde Tombaugh) নামে এক তরুণ শৌখিন জ্যোতির্বিদ এটি আবিষ্কার করেন।

দেখা গেল প্লুটো গ্রহদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম। এর আকার অতি ছোট; এমন কি এটা আমাদের চাঁদের চেয়েও ছোট। প্লুটোর আবার একটি ছোট আকারের সঙ্গী

আছে, তার নাম কেয়ারন (Charon)। ভয়েজার নভোযান থেকে মেপে জানা গেছে প্লুটোর ব্যাস ২,৩২০ কিলোমিটার (আমাদের চাঁদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) আর কেয়ারনের ১,২৭০ কিলোমিটার। গ্রহ আর উপগ্রহের মধ্যে এমন কাছাকাছি আকার আর দেখা যায় না। প্লুটো নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে ৬.৪ দিনে একবার; কেয়ারনের ঘোরার সময়ও হুবহু একই। প্লুটোর ওপর মিথেনের বরফ আর তার বায়ুমণ্ডলে খুব হালকা মিথেন আছে; সে হাওয়ার ঘনত্ব আমাদের সমুদ্রসমতলের হাওয়ার লক্ষ ভাগের একভাগ হবে।

প্লুটোর কক্ষপথ অন্য গ্রহদের কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় ১৭ ডিগ্রি কোণ করে আছে ; তাছাড়া এটি অতিমাত্রায় উপবৃত্তাকার। এর ফলে এটি যখন সূর্যের কাছাকাছি হয় তখন নেপচুনের চেয়েও তার দূরত্ব হয় কম। প্লুটোর এমন অনুসূর অবস্থা শেষ বার ঘটেছে ১৯৮৯ সালে। তাই ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্লুটো নয়, নেপচুনই সৌরজগতের দূরতম গ্রহ। এর ফলে ভয়েজারের পক্ষে নেপচুনের পর আর প্লুটোর কাছে যাবার চেষ্টা সম্ভব ছিল না, কেননা তাহলে তাকে আবার উল্টো দিকে ফেরত আসতে হত। তাই নেপচুন পেরিয়ে পুরো সৌরজগতের একটি ছবি তুলে ভয়েজার সৌরজগৎ ছাড়িয়ে রওনা দিয়েছে লুব্ধক নক্ষত্রের দিকে। আজ থেকে তিন লাখ বছর পর হয়তো সে এই নক্ষত্রের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে।

ভয়েজার তার বুকে বয়ে নিয়ে গেছে বেশ কিছু ছবি, নানা দেশের সঙ্গীত, ৫৪টি ভাষায় শুভেচ্ছা সম্ভাষণ – যদি সে নভোযান কোনদিন মহাকাশের বুকে কোন সভ্যতার কাছাকাছি পৌঁছায় আর তারা তার পাঠোদ্ধার করতে পারে! তারা তখন জানবে সূর্য নামের নক্ষত্রের পৃথিবী নামের গ্রহ থেকে একদিন মানুষ নামের এক জীব তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল – হয়তো ঘটে যাবে এক ঐতিহাসিক মহাসংযোগ!

# মাপজোখের উঁচুতলা নিচতলা

আমাদের প্রাচীনকালের মহাকাব্যের প্রণেতারা আর মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের লেখকেরা পরিমাণের বর্ণনায় বেশ দরাজ দিল ছিলেন। তাই রামায়ণের বীর হনুমানের পক্ষে গন্ধমাদন পর্বত কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই শক্ত হয় নি; মহাভারতে ভীম একবার গদা ছুঁড়লেই মারা পড়েছে লাখ লাখ সৈন্য। তবে পুঁথির লেখক যখন বলেন, "লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখি কয়েক হাজার" তখন সে কি অলঙ্কার না পরিহাস তা বোঝা ভার হয়।

এদেশের একালের রাষ্ট্রনায়ক আর নেতা-নেত্রীরাও এদিক থেকে একেবারে কম যান না। তাই কোন রাষ্ট্রপতি এমন প্রচুর খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেন যে সেসব পণ্য রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বন্দর পত্তন আর জাহাজ তৈরির নির্দেশ জারি হয়। আবার আর কেউ বাংলাদেশের 'বিপুল' উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে 'এশীয় বাঘ'দের দলে এদেশের নাম লেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

সাধারণ সব হিসেব নিয়েই যেখানে আমাদের এমন হিমশিম অবস্থা সেখানে আজকাল বিজ্ঞানীদের যেসব বড়, সূক্ষ্ম আর জটিল হিসেব নিয়ে কারবার করতে হয় তার হাল কি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। হিসেবের ব্যাপারটা এমন গোলমেলে বলেই বোধ হয় এদেশে গণিতের চর্চা ক্রমেই কমে আসছে। বিজ্ঞান বলতেই কারো কারো মুখ শুকিয়ে আসে, গণিতের কথা শুনলে তো আর কোন কথাই নেই। অথচ গণিত যে জ্ঞানের রাণী এ আর কে না জানে। গণিতের জ্ঞান ছাড়া সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন অচল তেমনি বিজ্ঞানের গবেষণাও মোটেই এগোতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন জানতে হলে তাকে প্রকাশ করতে হবে সঠিক হিসেব দিয়ে, রোজকার সাদামাটা হিসেবে সেখানে কাজ চলবে না। আর এই সঠিক হিসেব, সূক্ষ্ম হিসেব গণিতের সাহায্য ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়।

আমাদের সাদামাটা জীবনে যেসব হিসেব নিয়ে কারবার করতে হয় তা তেমন জটিল নয়। আর সে হিসেবে এমন কিছু সূক্ষ্মতারও দরকার হয় না। আমাদের বাড়ি থেকে মামাবাড়ি বড়জোর আধমাইল দূরে; শহর বেশি হলে ক্রোশখানেক দূর। আমাদের ছোট সংসারে সারা মাসে চাল লাগে মোটামুটি চল্লিশ কেজি, খাবার তেল ছ'লিটার, নুন দেড় কেজি। এসব হিসেব বোঝা সহজ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের জানতে হয় যেমন পনের কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্যের কথা, তেমনি বহু লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরের গ্যালাক্সির কথাও। তাঁদের কারবার এক মিটারের বহু লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ চওড়া পরমাণু নিয়ে; আবার কত শত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটল তা নিয়েও। আমাদের জন্য এসব হিসেবের হদিস করা সব সময় সহজ হয় না।

বিজ্ঞানীদের এমন সব বিশাল বড় আর অতি ছোট সংখ্যা নিয়ে কারবার করতে হয় যে সেসব সংখ্যা লেখার কিছু সহজ কায়দা বের করতে হয়েছে। বড় সংখ্যা বোঝাতে অনেকগুলো শূন্য ব্যবহার করতে হয়; তাকে সংক্ষেপে লেখা যায় ঘাত দিয়ে। একটি ছোট গুণ দেখলে ঘাত-এর ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ১০-কে ১০ দিয়ে গুণ করলে হয় ১০০; তাকে লেখা যায় $১০^{২}$। অর্থাৎ ঘাত দিয়ে লিখলে শূন্যগুলোর বদলে ১০-এর ওপরে একটু ছোট অক্ষরে ঘাত-এর সংখ্যা লিখলেই চলে। তেমনি ১০ × ১০ × ১০-কে লেখা যায় $১০^{৩}$ বা ১,০০০। এসব ছোটখাট সংখ্যা লেখার বেলায় এভাবে লেখার সুবিধে তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু ধরা যাক আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স মোটামুটি ১,৫০০,০০,০০,০০০ (১৫-র পর নটা শূন্য) বা দেড় হাজার কোটি বছর। এত বড় একটা সংখ্যা লেখা যেমন শক্ত সেটা পড়াও তেমনি সহজ নয়। এক লক্ষ (১,০০,০০০) বোঝাতে ১-এর পেছনে পাঁচটি শূন্য লিখতে হয়, কাজেই তাকে ১০-এর ঘাত হিসেবে লেখা যায় $১০^{৫}$। এভাবে মহাবিশ্বের বয়স হয়ে দাঁড়ায় ১৫ × $১০^{৯}$ বছর। এখানে সংখ্যাটা লেখা আর পড়া বেশ সহজ হয়ে গেল।

আবার খুব ছোট সংখ্যা লেখার সময় একই কৌশল কাজে লাগানো যায়; কেবল ঘাতের সামনে দিতে হয় একটি বিয়োগ চিহ্ন। এমনি ঋণাত্মক ঘাত দিয়ে বোঝা যায় কতবার দশ দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। যেমন $১০^{-১}$ অর্থ হল ১-কে ১০ দিয়ে একবার ভাগ করা হয়েছে অথবা ০.১; $১০^{-২}$ অর্থ হল $১০^{-১}$-কে আবার ১০ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ ০.০১। এই নিয়মে এক লক্ষ ভাগের একভাগ (০.০০০০১) বোঝাতে গেলে লিখতে হবে $১০^{-৫}$। প্রকৃতির অতিছোট মাপের জগতে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর মোটামুটি ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২ (দশমিকের পর ২৬টা শূন্য তারপর ২) কিলোগ্রাম। তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর হয়ে দাঁড়াবে ২ × $১০^{-২৭}$ কিলোগ্রাম। এটা লেখা যেমন সহজ, পড়াও তেমনি শক্ত নয়।

এই নিয়মে ১০-কে লেখা যায় $১০^{১}$ হিসেবে (অর্থাৎ এখানে একটি শূন্য আছে)। $১০^{১}$ অর্থাৎ ১০-কে ১০ দিয়ে ভাগ করলে হয় $১০^{০}$ অথবা ১; কাজেই ১-কে লেখা যায় $১০^{০}$ হিসেবে (অর্থাৎ এখানে কোন শূন্য নেই)। এভাবে $২^{০}$, $৮^{০}$ এসবেরও মান হয়ে দাঁড়ায় ১।

## মাপের ধাপে ওপরে ওঠা

ধরা যাক আমরা বড় আর ছোট রাশির হিসেব করার জন্য একটা মাপকাঠির সিঁড়ি তৈরি করে নিলাম। এই সিঁড়িতে একধাপ ওপরে উঠলে সব মাপজোখ হয় দশগুণ বড়। আবার একধাপ নিচে নামলে মাপ দশগুণ ছোট হয়ে যায়।

এই মাপকাঠির সিঁড়িতে মনে করা যাক সবচেয়ে নিচের ধাপটা দিয়ে $১০^{০}$ বা এককের ধাপ বোঝায়—অর্থাৎ ১ মিটার। এই ধাপে সব জিনিসের মাপ আমাদের চেনাজানা জগতের নানা জিনিসের মতো। যেমন মানুষ, গরু, ছাগল, চেয়ার-টেবিল, বাড়ি-ঘর। এর পরের তলায় $১০^{১}$ বা ১০-এর ধাপে উঠলে দেখাবে দশগুণ বড় সব জিনিস; অবশ্য তাতে আমাদের পরিচিত জগতের চেহারায় তেমন কিছু হেরফের ঘটবে না। কিন্তু ধরা যাক এরপর আমরা উঠে গেলাম ৪-এর ধাপে। আগে যেখানে আমরা দেখছিলাম এক মিটার সেখানে এখন দেখতে পাচ্ছি দশ কিলোমিটার ($১০^{৪}$ মিটার); অর্থাৎ শুধু আমাদের ঘর-বাড়ি নয়, পুরো শহরের চেহারাটাই এবার আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

এরপর যদি উঠে যাই ৮-এর তলায় তাহলে জমিনের তলার এক মিটারের জায়গায় এখন দেখা যাবে $১০^{৮}$ (১০,০০,০০,০০০) মিটার বা এক লক্ষ কিলোমিটার। আমাদের পৃথিবী হল চওড়ায় মোটামুটি ১৩,০০০ কিলোমিটার; কাজেই এবার সারা পৃথিবীটাই আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ১৯৬১ সালে প্রথম নভোযানে মহাকাশে উঠে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাবার সময় ইউরি গাগারিন পৃথিবীকে যেমন দেখতে পেয়েছিল আমরাও দেখব তেমনি দৃশ্য।

বহুকাল ধরে মানুষ ভাবত আমাদের এই পৃথিবীটা হল সমগ্র বিশ্বজগতের কেন্দ্র। এছাড়া অন্য কিছু ভাবাও ছিল তাদের জন্য শক্ত। সকালে পুব দিকে সূর্য উঠে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সারা আকাশ পেরিয়ে সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়; তারার জগতে চলাচল করে গ্রহেরা – এসব দেখে মনে হয় পৃথিবীটা বিশ্বজগতের কেন্দ্র না হয়ে যায় না। কিন্তু আমাদের মাপজোখের সিঁড়িতে ১৩-র ধাপে উঠে গেলে এই আপাত দেখাটাই যে সব নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৃথিবী থেকে তের বছর ধরে বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে মহাকাশে বিশাল দূরে গিয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম সৌরজগতের সরাসরি ছবি তুলে পাঠায় ভয়েজার-২ নভোযান। এই ছবিতে স্পষ্ট দেখা গেল সৌরজগতের সূর্য আর তার চারপাশে ঘোরা গ্রহদের দৃশ্য – যার কথা আজ থেকে ২,৩০০ বছর আগে বলেছিলেন গ্রিক পণ্ডিত আরিস্টার্কাস, পোল্যাণ্ডে আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে বলেছিলেন কোপার্নিকাস, আর ইতালিতে সাড়ে তিনশ বছর আগে বলেছিলেন গ্যালিলিও। সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া গ্রহদের মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ মাত্র। এটি নিজের অক্ষের ওপর দিনরাত লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে, তাতেই মনে হয় বুঝি সূর্যই ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। পৃথিবীর ওপর আছে বায়ুমণ্ডলের একটা হালকা আবরণ। আর তাই সূর্যের চারপাশে ঘোরাপথে প্রতি বছর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ওপর যে হাজার হাজার টন বস্তুর বর্ষণ ঘটছে তার আঘাত থেকে পৃথিবী বেঁচে যাচ্ছে।

এরপর আরো ওপরে উঠে যাওয়া যাক ১৭-র ধাপে। এখানে উঠে দেখা যাচ্ছে সূর্যের চারপাশেই যে কেবল গ্রহজগৎ আছে তা নয়; এমনি গ্রহজগৎ আছে আরো নানা নক্ষত্রের চারপাশে। তাদের কারো কারো গ্রহজগতে প্রাণ সৃষ্টির পরিবেশ থাকাও বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে এমনি প্রাণের সন্ধান আজ করে চলেছেন। তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি আজ পৌঁছে যাচ্ছে মহাকাশের দূরতম প্রান্তে।

এর পর যদি আরো ওপরে উঠে পড়া যায় ২২-এর ধাপে তখন দেখা যাবে আকাশ ভরা তারার জগতে আমাদের এমন সাধের সূর্য যেন এক অতি নগণ্য নক্ষত্র। আর এসব নক্ষত্র এক বিশাল প্যাঁচানো গ্যালাক্সির অংশ, যাকে বিজ্ঞানীরা কিছুটা আদর করে বলেন 'আমাদের গ্যালাক্সি'। এই প্যাঁচানো গ্যালাক্সির একটি শাখার বুকে কেন্দ্র থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দূরে আছে আমাদের সূর্য। গ্যালাক্সির চারপাশে একবার ঘুরে আসতে সূর্যের লাগে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে গ্যালাক্সির চারপাশে তার এখনও বিশ বার ঘুরপাক খাওয়া হয় নি।

২৪-এর ধাপে উঠলে বোঝা যায় আসলে মহাবিশ্বে আমাদের গ্যালাক্সিও মোটেই একা নয়, তার আশেপাশে রয়েছে আরো অনেকগুলি গ্যালাক্সি; তাদের কিছু কিছু আমাদের গ্যালাক্সির মতোই পেঁচানো আকারের, তবে বেশিরভাগ আঁটসাঁট উপবৃত্তাকার তারার দঙ্গল। এসব গ্যালাক্সি মিলিয়ে যে জোট তাকে বলা হয় গ্যালাক্সিদের স্থানীয় দল। ২৫-এর ধাপে উঠলে বোঝা যায় আসলে এমনি গ্যালাক্সির দল মহাবিশ্বে ছড়ানো আছে বহু লক্ষ।

আমাদের সিঁড়ির শেষ ধাপটি হল ২৬-এর তলা। এখানে উঠলে সমগ্র মহাবিশ্বকে দেখা যায় একসঙ্গে। এবার সূর্যকে দূরের কথা পৃথকভাবে কোন গ্যালাক্সিও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে শুধু গ্যালাক্সিদের দলগুলোকে। তারা সবাই বিপুল বেগে পরস্পর থেকে দূরে ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলা কি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে না তাতে একদিন ক্ষান্তি আসবে তা অনেকটা নির্ভর করবে গ্যালাক্সিদের মাঝে মাঝে অদৃশ্য বস্তু কি পরিমাণ আছে তার ওপরে।

## নিচের দিকে নামা

এবার মনে করা যাক দশের মাত্রার সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামছি নিচের দিকে। আমাদের শূন্যতল থেকে যদি নামা যায় এক ধাপ নিচে, তাহলে তাকে বলা যাক -১ তলা। এখানে মাপকাঠির একক আমাদের চিরাচরিত মিটার নয়, মিটারের এক-দশমাংশ অর্থাৎ ০.১ মিটার; তা হোক, তবু তাতে আমাদের চেনাজানা পৃথিবীর চেহারায় তেমন একটা হেরফের ঘটছে না। কাজেই আমরা বরং একচোটে -৫ তলায় চলে যাই; সেখানে ০.০০০০১ ($১০^{-৫}$) মিটার মাপের বস্তুগুলোকেও বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যায়ে মানুষের দেহের

কোষগুলোকে যাদের সাদা চোখে দেখা যায় না তাদেরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; অথচ এরকম হাজার দশেক কোষ একসঙ্গে করলে তা একটা পিনের ডগারও সমান হবে না। কোষের ভেতরকার কাজকর্মও বেশ ভালই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোষের বাইরের দিকে আছে দুটো দেয়াল; তার ভেতর দিয়ে খাবার-দাবার থেকে শুষে নেয়া নানা পুষ্টিকর রাসায়নিক বস্তু ঠিকই ঢুকতে পারছে, তবে আটকে যাচ্ছে নানা রকম রোগজীবাণু। কোষের ভেতরে মাইটোকণ্ড্রিয়া নামে এক ধরনের বরবটির বীজের মতো বস্তু খাবারের পুষ্টি উপাদান থেকে সৃষ্টি করছে দেহ চালু রাখার জন্য শক্তি।

আরো এক ধাপ নিচের দিকে নামা যাক। দেহকোষের কাজকর্ম চালু রাখে যে কোষকেন্দ্রক তা এবার চোখে পড়ছে। আমাদের দেহের সব রাসায়নিক কাজকর্মের নীলনক্শা আঁকা থাকে এই কেন্দ্রকের ভেতরে। নীলনক্শাগুলো লেখা ডি.এন.এ. (ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লেয়িক অ্যাসিড) নামে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো চেহারার অণুতে; সেসব সংকেত আবার কেন্দ্রকের ভেতর ভাগ করা থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম তন্তুর নথিতে। প্রতিটি অতি খুদে ক্রোমোজোমে থাকে প্রায় চার সেন্টিমিটার লম্বা ডি.এন.এ. তন্তু। অর্থাৎ একটা কোষকেন্দ্রকে যে পরিমাণ ডি.এন.এ. থাকে তার প্যাঁচ খুলে পৃথক করলে প্রায় দু' মিটারের মতো লম্বা হবে।

মায়ের ডিম্বকোষের ২৩টি ক্রোমোজোমের সঙ্গে বাবার ২৩টি ক্রোমোজোম মিলিত হয়ে তৈরি হয় একটি নিষিক্ত কোষ, তাতে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম। তারপর সেই একটি কোষ দু'ভাগ হয়ে হয় দুটি, তারপর চারটি, এমনি করে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেহকোষ; আর তার প্রতিটিতেই থাকে হুবহু একই রকম ডি.এন.এ.-র রাসায়নিক সংকেত। কিন্তু ভ্রূণ যখন ধীরে ধীরে বড় হয় তখন তার কোনো কোষ ডি.এন এ.-এর নীলনক্শা থেকে পড়ে নেয় খানিকটা নির্দেশমালা, আর হয়ে যায় বৃক্ককোষ, আবার আর কোনো কোষ পড়ে অন্য নির্দেশমালা, হয়তো হয়ে যায় হাড়ের কোষ, আবার কোনো কোষ হয় চামড়ার কোষ। এভাবেই দেহের নানা রকম কোষ আর কলার উদ্ভব হয়।

-৬-এর ধাপে শুধু যে আমাদের দেহকোষই চোখে পড়ে তা নয়, দেখতে পাওয়া যায় নানা রকম ব্যাক্টেরিয়া বা রোগজীবাণু। এদের আবার নানা ধরনের চেহারা – কোনটা গোল বলের মতো, কোনটার চেহারা বেলুনের মতো, কোনোটার চেহারা আঁকাবাঁকা; এদের একেক জাত একেক ধরনের রোগ ছড়ায়। তবে ব্যাক্টেরিয়াদের তবু তো আজকাল নানা রকম অ্যাটিবায়োটিক দিয়ে কাবু করা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো কাবু করা যায় নি এদের জ্ঞাতিভাই ভাইরাসদের। –৮-এর ধাপে নেমে গেলে ভাইরাসদের চেহারা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসন্ত, সর্দি, এইড্স্ এমনি কত রকম রোগের ভাইরাস যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কারো কারো দেহসজ্জা অতি চমৎকার; কিন্তু আমাদের দেহে একবার ঢুকতে পারলে তারা দেহকোষের

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে ফেলে, তারপর তাকে দিয়ে নিজের দরকার মতো রাসায়নিক বস্তু তৈরি করিয়ে নিতে থাকে। সব চেয়ে ছোট ভাইরাসদের মধ্যে পড়ে সাধারণ সর্দির ভাইরাস; এরা চওড়ায় মাত্র ২ × ১০$^{-৮}$ মিটারের মতো।

এখান থেকে −১০-এর ধাপে নামলে আমরা পৌঁছে যাই অণু-পরমাণুর জগতে। আজ থেকে মোটামুটি একশ বছর আগে বিজ্ঞানীরা দেখেন অণু-পরমাণুর এলাকায় পৌঁছলে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের রোজকার জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে আর কাজ চলে না। সেখানে সব নতুন নতুন নিয়ম-কানুনের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ছেলেবেলায় আমাদের পরমাণুর আকার বোঝাতে প্রায়ই সৌরজগতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হত – সৌরজগতের কেন্দ্রে যেমন আছে সূর্য আর তার চারপাশে ঘুরছে নয়টি গ্রহ, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি কেন্দ্রক আর তার চারপাশে ঘুরছে কটি ইলেকট্রন। আজ এই অতি সরল ছবি দিয়ে আর কাজ চলছে না। আমাদের অনেক বড় হয়ে যাওয়া জগতে পরমাণুর কেন্দ্রক বা ইলেকট্রন কোন কিছুকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব পারমাণবিক কণিকা মানুষের আগেকার ধারণার মতো ধরা-ছোঁয়া যায় এরকম গোলকের মতো নয়, যেন সব অদৃশ্য ভৌতিক বস্তু।

এই সিঁড়ি দিয়ে −১৫-র ধাপে নেমে অবশেষে আমরা প্রোটনের হদিস পাই। প্রোটন হল পরমাণুকেন্দ্রকের ভেতরকার ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণিকা যেগুলো পরমাণুর চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া ইলেকট্রনদের তাদের কক্ষপথে আটকে রাখে। তারপর আসে কোয়ার্কদের এলাকা। কোয়ার্ক হল এমন সব কণিকা যেগুলো দিয়ে তৈরি প্রোটন এবং অন্যান্য পরমাণুকণিকা। তারও নিচে আসে ইলেকট্রনদের এলাকা।

## আরো গভীর থেকে গভীরে

এখানেই কি আমাদের বস্তুর গভীরে ঢোকার অভিযানের শেষ হচ্ছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, না, এখানেই শেষ নয়। তাঁরা চলেছেন আরো গভীর থেকে গভীরে। আর যত গভীরে যাওয়া যাচ্ছে তত নতুন নতুন রহস্যের উদ্ঘাটন ঘটছে। ক্রমাগতই নতুন নতুন বিস্ময় সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতির বুকের গোপন কন্দরে রহস্যের অভিযাত্রার যেন কিছুতেই আর শেষ নেই।

আর শেষ নেই বলেই বিজ্ঞান আজো ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। রহস্যের পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলেছে মানুষ। আর মানুষ যে তার বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতির এত সব রহস্যের কথা জানতে পারছে এটাই বুঝি এ বিশ্বের সব চেয়ে বড় বিস্ময়!

# স্বর্গ-নরক কত দূর

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে মাথার ওপরকার আকাশটা ছিল স্তরে স্তরে ভাগ করা। ইহলোকে পুণ্যফলের বলে পরলোকে সাত তবক আসমান এক এক করে পেরিয়ে যাবার ভাগ্য হলে অবশেষে পৌঁছনো যায় স্বর্গে। সেখানেই থাকেন দেবতারা; ঈশ্বরেরও আসন সেখানেই। সেখান থেকেই তিনি পৃথিবীর ওপর কোথায় কি ঘটছে সেসব খেয়াল রাখেন, গ্রহ-নক্ষত্র যেন ঠিকমতো চলাচল করে তার তদারক করেন।

সেকালের মানুষদের কাছে বিশ্বের গণ্ডি ছিল অতি ছোট; চেনা-জানা আর প্রায় অচেনা কিছু দেশ নিয়ে পরিচিত পৃথিবীটা চ্যাপটা থালার মতো ভাসত অথই সাগরের বুকে। প্রাচীন গ্রিকরা ভাবত পৃথিবীর উত্তরের সীমানায় আছে এক বিশাল পাহাড়। সূর্য দেবতা যখন সারা দিন আলো ছড়িয়ে অস্ত যান তখন তিনি আসলে বিশ্রাম নেন ওই পাহাড়ের ওপারে সাগরের গায়ে। সেকালে আকাশের অতি দূর প্রান্তে স্বর্গের দূরত্বও তত বেশি ছিল না; পুণ্যবানেরা সহজেই পৌঁছে যেতে পারতেন সেখানে। নরকও ছিল অনেকটা কাছাকাছি।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দেশে জন্মেছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) নামে এক অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর কাছে এই চ্যাপটা পৃথিবীর ধারণা ঠিক যুতসই মনে হল না। তিনি একটা বই লিখলেন, নাম 'স্বর্গ বিষয়ে'; তাতে তিনি বললেন পৃথিবীটা আসলে বলের মতো গোল, তার খানিকটা মাটিতে আর খানিকটা পানিতে ঢাকা আর তার চারপাশে রয়েছে হাওয়া। এই মতের স্বপক্ষে তিনি যেসব যুক্তি দেখালেন সেগুলো আজো আমাদের স্কুলের বইতে লেখা থাকে। যেমন বন্দরে যখন দূর থেকে জাহাজ আসতে থাকে তখন প্রথমে তার মাস্তুল দেখা যায়, তারপর ধীরে ধীরে জাহাজের বাকি অংশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাতে বোঝা যায় পৃথিবীর ওপরটা সমতল নয়, বাঁকানো। তিনি আরো বললেন, চাঁদে যখন গ্রহণ লাগে তখন সেটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে। এই ছায়াটা সব সময় গোল দেখায়, কাজেই পৃথিবী একটা বলের মতো না হয়েই যায় না।

কিন্তু সে সময়ের লোকেদের অ্যারিস্টট্‌লের কথা বিশ্বাস করা শক্ত হল। তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না পৃথিবী গোল বলের মতো হলে তার উল্টো পিঠের লোকেরা নিচের দিকে পড়ে যায় না কেন। পৃথিবী যে তার চারপাশে সব কিছুকে টেনে ধরে রাখে এ ধারণা তখনও কারো মাথায় আসে নি। এমন কি তার প্রায় দু'হাজার বছর পর কলম্বাস যখন পৃথিবীর উল্টোপিঠ দিয়ে ভারতে যাবার আয়োজন করছিলেন তখনও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না সত্যি সত্যি এভাবে পৃথিবীর উল্টো পিঠে যাওয়া যাবে কিনা। অবশেষে ষোল শতকে

ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান-এর জাহাজ সত্যি সত্যি পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে এলো। পৃথিবী যে গোল তা নিয়ে কারো মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

## পৃথিবীটা কত বড়

পৃথিবী যে বলের মতো গোল একথাটা সাধারণ মানুষদের বুঝতে অসুবিধে হলেও গ্রিসের বিজ্ঞানীরা কিন্তু সেকালেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন এই বলটা আসলে কত বড় সেটা বের করার কায়দা নিয়ে। এমন বিশাল বড় এক বলের মাপজোখ করা সহজ

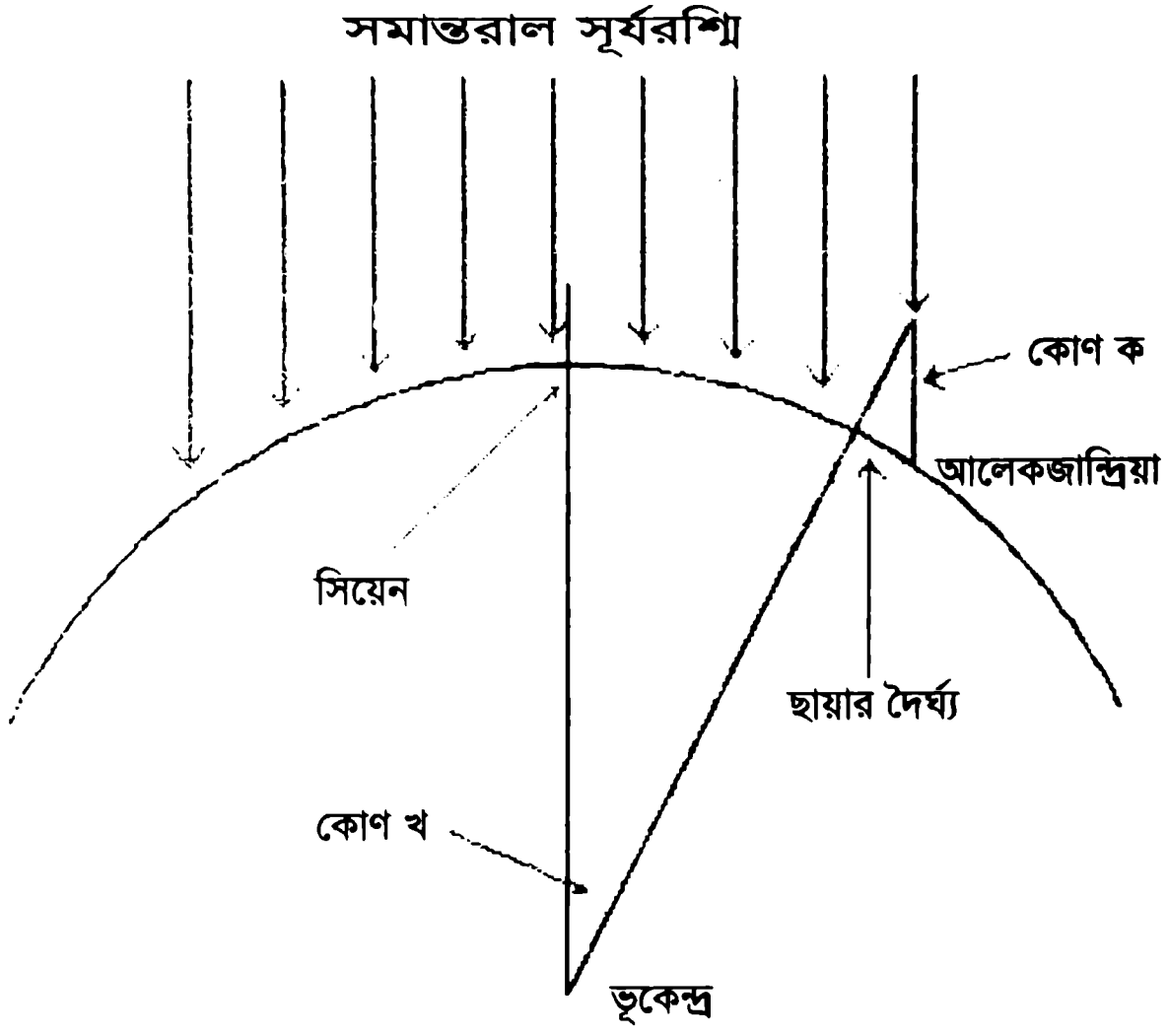


গ্রিক বিজ্ঞানী এরাটোস্তেনিস জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি এবং ব্যাসের মান বের করে ফেলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় ২১ জুন তারিখে ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে পাওয়া গেল ক কোণ = ৭ ডিগ্রি। আবার জ্যামিতির নিয়মে ক কোণ = পৃথিবীর কেন্দ্রে খ কোণ। এ থেকে এরাটোস্থেনিস দেখালেন পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। আজকের হিসেবের সঙ্গে এই মাপ আশ্চর্যরকম মিলে যায়।

ব্যাপার নয়। সহজ হত যদি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে এসে তার পরিধির মাপ নেওয়া যেত। কিন্তু সেকালের গ্রিক পণ্ডিতদের জন্য সে ছিল সাধ্যের অতীত। তা বলে তাঁরা হাল ছেড়ে দেন নি; অঙ্কের হিসেব দিয়ে সে মাপ বের করেছেন।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রিসের এক উপনিবেশ ছিল মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায়; সেখানে বাস করতেন সেকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এরাটোস্থেনিস (আ. ২৭৬-১৯৬ খ্রি. পূ.)। তিনি শুনেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার ৫,০০০ স্টেডিয়া (পুরাকালের মিসরীয় দৈর্ঘ্যের মাপ) দক্ষিণে নীলনদের উজানে সিয়েন নামে এক শহর আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বড় দিনের দুপুরে সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে; তাই তখন খাড়া কোন লাঠি দাঁড় করালে মাটিতে তার ছায়া পড়ে না।

এরাটোস্থেনিস দেখলেন এমন কাণ্ড আলেকজান্দ্রিয়ায় কখনো ঘটে নি। বছরের ঐ দিনে ভর দুপুরে সেখানে সূর্য থাকে খাড়া মাথার ওপর থেকে সাত ডিগ্রি (অর্থাৎ পুরো বৃত্তের প্রায় ৫০ ভাগের একভাগ) দক্ষিণে। এ থেকে তাঁর মাথায় এলো এক আশ্চর্য বুদ্ধি। তিনি বললেন, পৃথিবীটা বলের মতো গোল বলেই এমন ঘটছে। আলেকজান্দ্রিয়া আর সিয়েন-এ একই সময়ে খাড়াভাবে পোঁতা দুটি কাঠিকে বাড়িয়ে দিলে পৃথিবীর কেন্দ্রে ৭ ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়। এটা পুরো বৃত্তের ৫০ ভাগের একভাগ; কাজেই পুরো পৃথিবীর পরিধি হবে দুটি শহরের মধ্যেকার দূরত্বের পঞ্চাশ গুণ অর্থাৎ ২,৫০,০০০ স্টেডিয়া। সেকালের মিসরের এক স্টেডিয়া আজকের হিসেবে ১/১০ মাইল; কাজেই এরাটোস্থেনিস-এর এই হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে ২৫,০০০ মাইল বা ৪০,০০০ কিলোমিটার। আমাদের আধুনিক হিসেবের সঙ্গে এটা আশ্চর্য রকম মিলে যায়।

এই হিসেব থেকে আরেকটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। সে হল এতদিন যা মনে হত তার চেয়ে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীটা আসলে অনেক অ-নে-ক বড়। তাহলে আমাদের জানাশোনা এলাকার বাইরে রয়েছে আরো কত অজানা জিনিস! সে সব জিনিসকে হাতের নাগালে না পেলেও তাদের সম্বন্ধে খবরাখবর কি নেওয়া যায় না? হয়তো যায় — যদি খাটানো যায় এরাটোস্থেনিসের মতো জ্যামিতির নিয়ম। জ্যামিতিকে তাই সেকালে মনে হত এক আশ্চর্য বিদ্যা।

জ্যামিতির এমনি আরেক নিয়ম হল প্যারালাক্স বিচ্যুতি (parallax) বা দিগ্‌ভেদ (লম্বন)। ছোট্ট একটু পরীক্ষা করলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। একটা হাত সামনে বাড়িয়ে একটা আঙ্গুল উঁচু করে ধরুন। তারপর প্রথমে ডান চোখ বন্ধ করে তারপর বাঁ চোখ বন্ধ করে দূরের কোন কিছুর দিকে তাকান। বাঁ চোখ দিয়ে দেখার সময় আঙ্গুলটা যেখানে ছিল ডান চোখ দিয়ে দেখার সময় মনে হবে সেখান থেকে লাফিয়ে একটু যেন বাঁ দিকে সরে গিয়েছে। আবার বাঁ চোখ বন্ধ করে দেখলে ঘটবে তার উল্টোটা। এই যে দু'চোখের মধ্যেকার দূরত্বের কারণে পর পর ডান ও বাঁ চোখ দিয়ে দেখার সময় কাছের আর দূরের বস্তুর আপাত স্থানচ্যুতি এরই নাম প্যারালাক্স বিচ্যুতি।

## জ্যামিতি দিয়ে চাঁদের হিসেব

হাতের আঙ্গুল দু'চোখে যে কোণ তৈরি করে আরো দূরের বস্তু তার চেয়ে ছোট কোণ তৈরি করে; এজন্যই প্যারালাক্স বিচ্যুতি বা দিগ্‌ভেদ সৃষ্টি হয়। দূরের বস্তু যত দূরে থাকবে তার তত ছোট কোণ তৈরি হবে। এই কোণের মাপ থেকে ঐ বস্তুর দূরত্ব বের করা যেতে পারে। নৌবাহিনীতে অনেক দূরের জাহাজের দূরত্ব এভাবেই মাপা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে দু'চোখের বদলে ব্যবহার করা হয় কিছুটা দূরে দূরে বসানো দু'সেট প্রতিফলক আয়না। এই আয়নার সেট দু'পাশে যত সরিয়ে বসানো হবে দিগ্‌ভেদের কোণ তত বড় হবে; দূরত্বের হিসেবও তত নিখুঁতভাবে করা যাবে। দুই আয়নার কোণের তারতম্য থেকে দূরত্বের হিসেব যন্ত্রটি আপনা আপনি সূক্ষ্মভাবে করে দেয়।

সমুদ্রের জাহাজের দূরত্বের হিসেব এভাবে করা গেলেও পৃথিবীর বাইরের কোন বস্তুর, যেমন চাঁদের, দূরত্বের হিসেব এই যন্ত্র দিয়ে করা হল দুঃসাধ্য। তার কারণ এক্ষেত্রে দিগ্‌ভেদের কোণ হয়ে যায় অতি ছোট। আমরা আগেই দেখেছি দুটো চোখের মধ্যেকার দূরত্ব যদি বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে দিগ্‌ভেদের কোণ বেড়ে যায়। এখানেও বিজ্ঞানীরা আরেক বুদ্ধি খাটালেন। আকাশের তারাদের পটভূমিতে চাঁদের ছবি তুললেন পৃথিবীর দু'প্রান্ত থেকে, তারপর তুলনা করে দেখলেন কোণের কতটা পার্থক্য ঘটছে। দেখা গেল পৃথিবীর ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে ছবি নিলে চাঁদের দিগ্‌ভেদ কোণ হয় ১°২৪'৫"। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ৩০.১৪ গুণ; অর্থাৎ ৩,৮৪,৪০৩ কিলোমিটার বা ২,৩৮,৮৫৭ মাইল।

এরপর বিজ্ঞানীরা মাপলেন চাঁদের কৌণিক ব্যাস। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আর চাঁদের কৌণিক ব্যাস এই দুটি হিসেব থেকে পাওয়া গেল চাঁদের ব্যাসের মাপ। দেখা গেল চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের মোটামুটি চারভাগের একভাগ; তাহলে চাঁদের ওপরকার আয়তন দাঁড়ায় পৃথিবীর ওপরকার আয়তনের প্রায় ষোল ভাগের একভাগ অর্থাৎ মোটামুটি আফ্রিকা মহাদেশের মতো।

একই ভাবে মাপা হল সূর্যের দূরত্ব। অবশ্য চাঁদের তুলনায় সূর্য অনেক বেশি দূরে বলে তার মাপ নিতে আরো বেশি সমস্যা হল। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪,৯৪,৫০,০০০ কিলোমিটার (৯,২৮,৭০,০০০ মাইল) অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের ৩৮৫ গুণ বেশি। সূর্য এত দূরে বলেই আকারে অনেক বেশি বড় হওয়া সত্ত্বেও তাকে আমাদের কাছে প্রায় চাঁদের সমান বলে মনে হয়। সূর্যের দু'প্রান্ত থেকে আমাদের চোখ পর্যন্ত সরলরেখা টানলে তার মাঝামাঝি কোণ হয় মোটামুটি আধ ডিগ্রি; চাঁদের বেলাতেও তাই। আসলে সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় ১০৯ গুণ। সোনার থালার মতো দেখতে সূর্য যে আসলে

অনেক বড় একথা প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতেরা বুঝতে পেরেছিলেন। সে দেশে অ্যানাক্সাগোরাস (আ. ৫০০-৪২৮ খ্রি. পূ.) নামে এক পণ্ডিত বলতেন, সূর্য অতি বড় এক আগুনের গোলা, এত বড় যে হয়তো সারাটা গ্রিস দেশের সমান! আর এমন ধরনের অলক্ষুণে কথা শেখাবার অপরাধে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল, ভয় দেখানো হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের।

প্যারালাক্স পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে জ্যোতির্বিদরা সৌরজগতে গ্রহদের দূরত্বও বের করেছেন। অতি দূরের গ্রহ প্লুটোর গড় দূরত্ব পাওয়া গেছে সূর্য থেকে ৫৯০০১ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব তার চেয়ে প্রায় চল্লিশগুণ বেশি।

## অতি বিশাল তারার রাজ্যে

প্যারালাক্স পদ্ধতি সৌরজগতের মাপজোখ নেবার জন্য তো বেশ কাজে লাগল; সে কি সৌরজগতের বাইরে বিশাল তারার জগতেও কাজ দেবে? আমাদের কাছাকাছি তারাদের মাপ নেবার জন্য এই কৌশল কাজে লাগানো যায়। তবে সৌরজগতের তুলনায় এখানে আবার দূরত্বের মাপ এত বড় হয়ে ওঠে যে এই নিয়ম কাজে লাগাতে কিছু নতুন কৌশল খাটাতে হয়।

সূর্যের তুলনায় আমাদের সবচেয়ে কাছের তারারাও এমন দূরে যে পৃথিবীর ওপরকার সবচেয়ে দূরের দুটি জায়গা অর্থাৎ পৃথিবীর এপিঠ ওপিঠ থেকে ছবি নিয়েও আকাশে তারার রাজ্যে তাদের কোনরকম প্যারালাক্স বা দিগ্‌ভেদের হদিস পাওয়া যায় না। তবে একটা কৌশল শেষ পর্যন্ত বেরলো। বিজ্ঞানীরা সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথকে এই মাপের জন্য কাজে লাগালেন। পৃথিবী বিশাল এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ১২ মাসে একবার করে ঘুরপাক খায়। এই কক্ষপথের দু' প্রান্ত থেকে ছ'মাস পর পর যদি কোন তারার ছবি তোলা যায় তাহলে কি সেই দুই ছবির মধ্যে কোন প্যারালাক্সের হদিস পাওয়া যাবে না?

১৮৩৮ সালে ফ্রিডরিশ বেসেল (Friedrich Bessel) নামে এক জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছ'মাস পর পর দু'রাতে এভাবে আকাশে তারাদের ছবি তুললেন। প্রথম প্রথম তিনি কোন তারার বিচ্যুতি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হয়তো যেসব তারার ছবি তিনি পরীক্ষা করছিলেন সেগুলো খুব বেশি দূরের তারা। তারপর এক সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ৬১ সিগ্‌নি নামে একটি তারা (অর্থাৎ হংস মণ্ডলে ৬১ ক্রমিকের উজ্জ্বল তারা) যেন রয়েছে ছ'মাস আগের চেয়ে সামান্য কিছুটা ভিন্ন জায়গায়। তারপর আরো ছ'মাস কেটে গেল। ৬১ সিগ্‌নি ফিরে গেল ঠিক তার আগের জায়গায়। সন্দেহ রইল না যে গরমিলটা ঘটেছিল প্যারালাক্সের কারণেই।

৬১ সিগ্‌নির যে প্যারালাক্স বিচ্যুতি পাওয়া গেল সে অতি সামান্য; বছরে মাত্র ০৬ সেকেণ্ড কোণ (৫০০ মাইল দূর থেকে একজন মানুষকে দেখলে তার এটুকু বিচ্যুতি ঘটবে)। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেব অতি নিখুঁত; তাতে ভুল ধরার উপায় নেই। পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাস আগেই জানা ছিল; এই সামান্য বিচ্যুতি থেকে হিসেব পাওয়া গেল তারাটি রয়েছে ১·০৩ × ১০$^{১৪}$ কিমি দূরে; অর্থাৎ সূর্য যত দূরে তার চেয়ে এর দূরত্ব ৬,৯০,০০০ গুণ বেশি! তখনকার দিনে এত বেশি দূরের কোন জিনিসের কথা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও ছিল শক্ত।

জ্যোতির্বিদরা এত দূরের সব তারাদের দূরত্বের হিসেব করার জন্য আজকাল আলোক-বছরের একক ব্যবহার করেন। আলো হল এ বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগামী — প্রতি সেকেণ্ডে চলে ৩০০,০০০ কিলোমিটার পথ। এই বেগে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে এক সেকেণ্ডের সামান্য বেশি সময়; সূর্য থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে লাগে প্রায় ৮ মিনিট। অথচ ৬১ সিগ্‌নি থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে প্রায় ১১ বছর। আজ যদি অকস্মাৎ এই তারার আলো নিভে যায় তাহলে সে খবর পেতেও আমাদের ১১ বছর কেটে যাবে।

এই দূরত্বের হিসেব থেকে বেসেল বললেন, ৬১ সিগ্‌নিকে পৃথিবী থেকে অতি মিটমিটে তারা বলে মনে হলেও এটি আসলে সূর্যের চেয়ে মাত্র ৩০ শতাংশ ছোট আর সামান্য কম উজ্জ্বল একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড। তারপর অবশ্য প্যারালাক্স পদ্ধতিতে আরো অনেক তারার দূরত্ব বের করা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যে তারাটি পাওয়া গেছে সেটি আলফা সেণ্টরি, মাত্র ৪·৩ আলোক-বছর দূরে। একে দেখা যায় শুধু দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। অবশ্য বেশির ভাগ তারাই রয়েছে এর চেয়ে আরো অনেক বেশি দূরে; এত দূরে যে পৃথিবীর কক্ষপথের এপার-ওপার থেকেও তাদের বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেসব তারার হদিস পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আবার রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। উজ্জ্বল দানবতারা আর্দ্রা (Betelgeuse, দূরত্ব ৫২০ আলোক-বছর) আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪০০ গুণ বড় আর ৩,৬০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল; আবার মিনমিনে বামন ভ্যান মানেন-এর তারা (দূরত্ব ১৩ আলোক-বছর) আকারে আমাদের পৃথিবীর মাত্র তিন-চতুর্থাংশ আর উজ্জ্বলতায় সূর্যের ১০,০০০ ভাগের একভাগ।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল নিজের হাতে তৈরি দূরবীনের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল সাদা চোখে অদৃশ্য যে সব তারা দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলে আকাশে ফুটে ওঠে সেগুলো প্রায় সবই দেখা যায় আকাশের উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো ছায়াপথ নামে যে আলোর চাঁদোয়া তার ভেতরে; কাজেই এটা হয়তো নিছক একটা ধোঁয়াটে পথ নয়, আসলে এই এলাকার মধ্যে লুকিয়ে আছে অসংখ্য

তারার মেলা। আজ আমরা জেনেছি, এই ছায়াপথে প্রায় ৪০,০০০ কোটি তারা এক বিশাল কুমোরের চাকের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।

## আরো নানা কৌশল

প্যারালাক্স পদ্ধতির সাহায্যে এ বিশ্ব যে সত্যি কত বিশাল সে সম্বন্ধে মানুষের একটা মোটামুটি ধারণা হল। তাছাড়া এ কৌশল দিয়ে মোটামুটি কাছের তারাদের দূরত্ব ভালমতোই মাপা যায়। কোন তারা যদি এক সেকেণ্ড কোণের (এক আর্ক সেকেণ্ড) প্যারালাক্স সৃষ্টি করে তাহলে তার দূরত্ব হয় ৩·২৬ আলোক-বছর ; এই দূরত্বকে বলা হয় 'পারসেক' (parsec)। একে ব্যবহার করা হয় তারাদের দূরত্বের একক হিসেবে। এক পারসেক ৩০·৮৬ লক্ষ কোটি কিলোমিটার বা ২,০৬,২৬৫ জ্যোতির্বিদ্যা এককের সমান। কিছু তারা আছে আরো অনেক দূরে। এমন তারা যদি থাকে কয়েকশ আলোক-বছরের চেয়ে বেশি দূরে তাহলে তার দিগ্‌ভেদ এত কম যে সে মাপের সাহায্যে আর দূরত্বের হিসেব করা সম্ভব হয় না। সেরকম ক্ষেত্রে তাদের দূরত্ব মাপার জন্য ব্যবহার করতে হয় অন্য কৌশল।

আজকাল জ্যোতির্বিদরা মহাকাশে নানা বস্তুর দূরত্ব বের করার জন্য ডজনখানেক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। সৌরজগতের ভেতরকার কোন বস্তু যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু এদের দূরত্ব বের করার একটা উপায় হল পৃথিবী থেকে শক্তিশালী রেডার রশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে তারপর সে রশ্মি ফিরে আসতে কতটা সময় লাগছে তার মাপ নেয়া: এভাবে সে বস্তুর দূরত্ব বেশ সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। এই পদ্ধতি ৫০ জ্যোতির্বিদ্যা একক (সূর্য-পৃথিবী দূরত্ব) পর্যন্ত কাজ দেয়।

কাছাকাছি তারাদের বেলায় পৃথিবীর কক্ষপথের দু'পাশ থেকে ছ'মাস পর পর ছবি নিয়ে তাদের তুলনা করে দেখা যায় পটভূমির অন্যান্য বস্তুর তুলনায় তারার স্থান কতটা বদলেছে, তারপর সেই স্থান বদলের ভিত্তিতে তারাটা কত দূরে আছে তা জানা যায়। এ পদ্ধতি মোটামুটি ৪ থেকে ১০০ আলোক-বছর দূরের তারাদের বেলায় ভাল কাজ দেয়। এর চেয়ে বেশি দূরের তারা হলে (যেমন আমাদের গ্যালাক্সি বা ম্যাজেলানের মেঘ নীহারিকার তারাদের বেলা) মূলধারার অন্যান্য তারার সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রকৃত উজ্জ্বলতা বের করা হয়, তারপর তার সঙ্গে আপাত উজ্জ্বলতা মিলিয়ে দেখা হয়। এভাবে তারার দূরত্ব বের করা যায়। এ পদ্ধতি ১০০ থেকে ২,০০,০০০ আলোক-বছর দূরের তারার বেলায় ভাল কাজ দেয়।

তারা যদি থাকে আরো দূরে (যেমন আমাদের কাছাকাছি গ্যালাক্সিতে দু'কোটি আলোক-বছর দূর পর্যন্ত) তাহলে শেফালি বিষম তারাদের কাজে লাগানো হয়। এ ধরনের তারার আলোর ছন্দোময় কম-বেশি হওয়ার সময়ের সঙ্গে তার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সমানুপাতিক। অর্থাৎ যে শেফালি বিষম তারার আলোর কম-বেশি

হওয়ার সময় লম্বা তার প্রকৃত উজ্জ্বলতা বেশি; আবার যার আলোর কম-বেশি হওয়ার সময় সংক্ষিপ্ত তার প্রকৃত উজ্জ্বলতা কম। এ ধরনের তারাদের প্রকৃত উজ্জ্বলতার সঙ্গে তাদের আপাত উজ্জ্বলতার তুলনা করলে তাদের দূরত্বের একটা মাপ পাওয়া যায়। শেফালি বিষম তারা সচরাচর আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় হাজারগুণ উজ্জ্বল হয়, তাই তাদের অতি দূর থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। আর এজন্যই এসব তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে মহাকাশে দূরত্ব বের করার একটা বড় উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নীলচে অতিদানব তারাদের একটা বিশেষত্ব হল তাদের সবারই প্রকৃত উজ্জ্বলতা মোটামুটি একই রকম। তাই অতি দূরের কোন গ্যালাক্সিতে একটি নীলচে অতিদানব তারার আপাত উজ্জ্বলতা আর আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির একটি নীলচে অতিদানবের উজ্জ্বলতার তুলনা করলে দূরের অতিদানবের দূরত্ব বের করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি শেফালি বিষম তারার পদ্ধতির মতো অতটা নির্ভরযোগ্য নয়, তবে নীল অতিদানব তারারা সাধারণত শেফালি বিষম তারাদের থেকে বেশি উজ্জ্বল, তাই আরো বেশি দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি ১০ কোটি আলোক-বছর দূর পর্যন্ত কাজ দেয়।

সবচেয়ে উজ্জ্বল যেসব বর্তুলাকার তারাস্তবক তাদের সবার উজ্জ্বলতাও মোটামুটি একই; এই তথ্যটি কাজে লাগিয়ে ২০ কোটি আলোক-বছর দূর পর্যন্ত তারাদের দূরত্ব বের করা যায়। তার চেয়ে বেশি দূরত্ব বের করার জন্য ব্যবহার করা হয় অতিনবতারার উজ্জ্বলতা আর গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিজোটের উজ্জ্বলতা। এসব পদ্ধতি ৩০০ কোটি আলোক-বছর দূরত্ব পর্যন্ত কাজে লাগে।

তিনশ কোটি আলোক-বছরের চেয়ে বেশি দূর হলে গ্যালাক্সির আলোর ডপলার সরণ ব্যবহার করে তার দূরত্ব বের করা যায়। মহাবিশ্বে সব গ্যালাক্সি চতুর্দিকে বিপুল বেগে ছুটে চলেছে; যে গ্যালাক্সি যত দূরে তার ছুটে চলার বেগ তত বেশি। আলোর বর্ণালিরেখার বিচ্যুতি থেকে জানা যায় গ্যালাক্সিটি কত জোরে ছুটে চলেছে আর সেটা আমাদের কাছ থেকে কত দূরে রয়েছে। এভাবে ১০ কোটি থেকে ১,০০০ কোটি আলোক-বছর বা তার চেয়েও বেশি দূরের গ্যালাক্সিদের দূরত্ব বের করা যায়।

এককালে স্বর্গ ছিল মানুষের কাছাকাছি; জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান মানুষের যত বাড়ছে স্বর্গ যেন ক্রমে ক্রমে ততই তার নাগালের বাইরে বহু দূরে সরে যাচ্ছে।

# আকাশ জুড়ে তারার মেলা

আকাশে যে অসংখ্য তারা দেখা যায় তাদের দেখে দেখে চিনতে পারা সহজ কথা নয়। তাই তারাদের চেনার সুবিধের জন্য আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিকরা তাদের মধ্যে এক ধরনের ছবি কল্পনা করে তারামণ্ডলের নাম দিতে শুরু করেন। প্রাচীন ভারতেও জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা তারামণ্ডল বা রাশির ছবি কল্পনা করে তাদের নানা রকম নাম দিয়েছিলেন। তখনকার এসব পণ্ডিতের অবশ্য ধারণা হয় নি যে মণ্ডলের তারারা আসলে আছে বিভিন্ন রকম দূরত্বে; তাঁরা ভাবতেন তারামণ্ডলগুলো সাজানো রয়েছে আকাশের উঁচুতে একটা বিশাল গোলকের গায়ে। তারারা যে সূর্যের চেয়ে অনেক দূরে এমন একটা ধারণা অবশ্য তাঁদের ছিল।

অবশেষে সতের শতকে গ্যালিলিওর পরীক্ষা আর কেপলারের হিসেব-নিকেশ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল পৃথিবী হল সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া একটি গ্রহ আর তারারা হচ্ছে সূর্যের মতো বিশাল আগুনের গোলা। তারাদের উজ্জ্বলতা সূর্যের মতো এটা ধরে নিয়ে তাদের দূরত্ব বের করার চেষ্টা শুরু হল। এভাবে হিসেব করে নিউটন বললেন লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের দূরত্ব সূর্যের চেয়ে দশ লক্ষগুণ বেশি। এটা আসল দূরত্বের দ্বিগুণ, তবু তারাদের দূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা এতে পাওয়া গেল।

১৮৩৮ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ ফ্রিডরিশ বেসেল প্রথম প্যারালাক্স বিচ্যুতি বা দিগ্‌ভেদ থেকে ৬১ সিগনি তারার দূরত্ব বের করলেন ; তার পর পরই আলফা সেণ্টরি আর ভেগার দূরত্বও এভাবে বের করা হল। বোঝা গেল তারারা আমাদের কাছ থেকে এত দূরে যে সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে বহু বছর লেগে যায়। সেই থেকে তারার দূরত্ব মাপার জন্য আলোক-বছরের মাপ ব্যবহার করা শুরু হল। এক আলোক-বছর মোটামুটি ৯·৫ লক্ষ কোটি কিলোমিটার (৫·৯ লক্ষ কোটি মাইল)। এরকম আরেক মাপ হল 'পারসেক'; এ হল এমন এক দূরত্ব যেখানে থাকলে তারার প্যারালাক্স বিচ্যুতি হয় এক সেকেণ্ড কোণ (এক ডিগ্রির ৩,৬০০ ভাগের একভাগ)।

গ্রিকরা কিন্তু মোটেই বুঝতে পারেন নি যে তাঁদের দেখা তারামণ্ডলগুলোর চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। ১৭১৮ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালি (Edmond Halley) প্রথম বুঝতে পারেন যে গ্রিকদের সময়ের তুলনায় বেশ কতকগুলো উজ্জ্বল তারা যেমন লুব্ধক আর স্বাতীর (Arcturus) জায়গা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। আজ আমরা জানি সব তারাই কম-বেশি জায়গা বদলায়; কাজেই এখন তারামণ্ডলগুলো যেমন দেখাচ্ছে ক্রমে ক্রমে একদিন তাদের সে চেহারা আর থাকবে না।

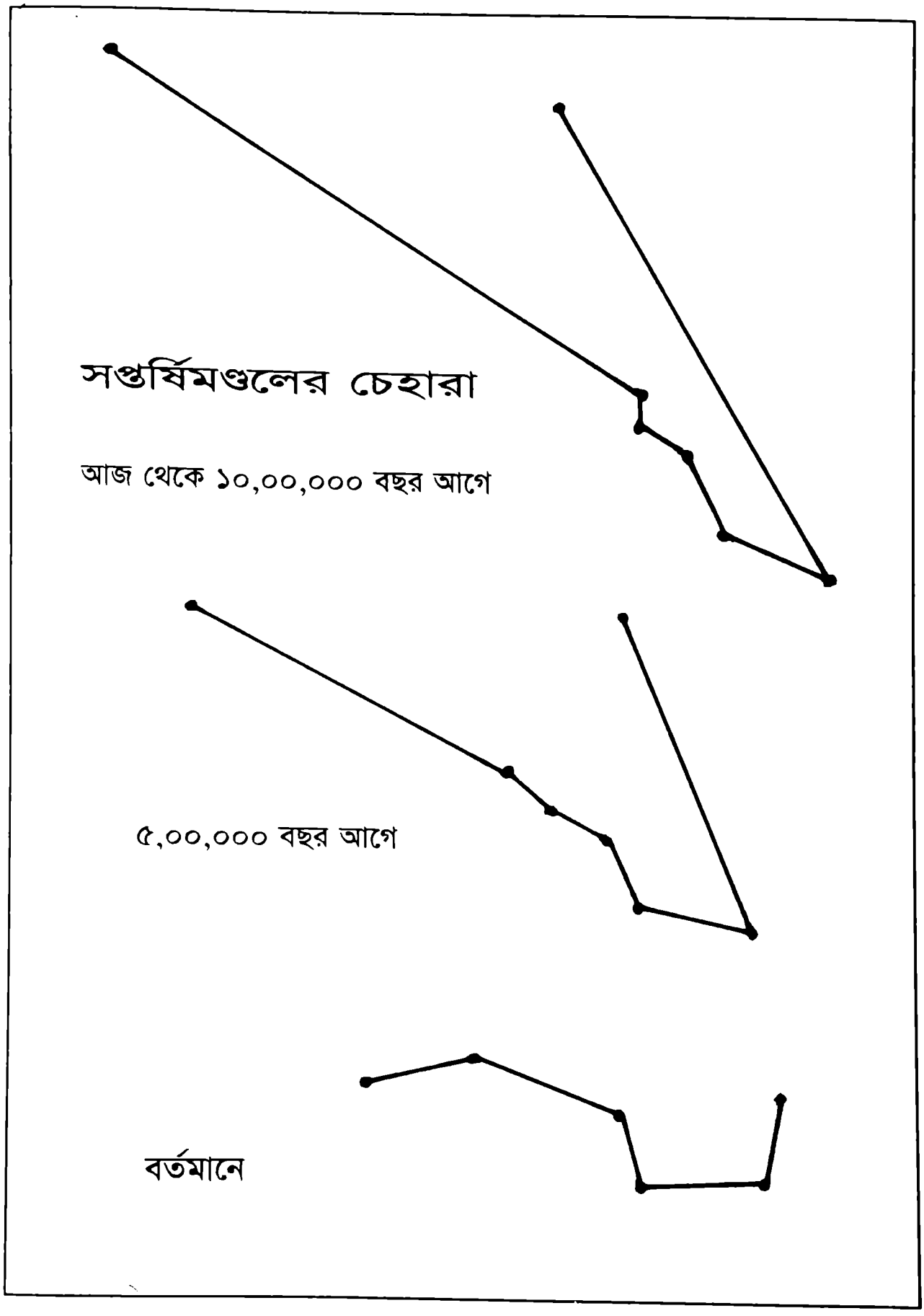


তারাসমাবেশ চিরকাল একরকম থাকে না। আজ ধ্রুবতারা চিনতে সাহায্য করে উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল; তার দশ লাখ আর পাঁচ লাখ বছর আগেরকার চেহারা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। আগামী দিনে তার চেহারা আরো বদলে যাবে।

## তারার আলোয় নানা খবর

খালি চোখে তারারা সাদা বিন্দুর মতো, কিন্তু বাইনোকুলার বা দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলে তাদের গায়ে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ এমনি নানারকম আভা দেখতে পাওয়া যায়। এসব আভা থেকে বিজ্ঞানীরা তারার গড়ন, তাপমাত্রা এমনি নানা বিষয়ে জানতে পারেন। শীতের আকাশে তাকালে দেখা যাবে কালপুরুষ (Orion) তারামণ্ডল; এর ডানদিকে পায়ের কাছের তারা বাণরাজা (Rigel) নীলচে-সাদা অথচ কাঁধের তারা আর্দ্রা (Betelgeuse) কমলা-লাল। আমাদের সূর্য হল হলদে। আসলে সূর্যের চেয়ে বাণরাজা বেশি উষ্ণ, আবার আর্দ্রা বেশি ঠাণ্ডা। সবচেয়ে কম উষ্ণ তারারা হল লাল রঙের; উষ্ণতা যত বাড়ে ক্রমে ক্রমে তাদের রঙ হয়ে দাঁড়ায় হলদে আর সাদা; সবচেয়ে উষ্ণ তারারা নীলচে সাদা – যেমন লুব্ধক। স্বাতী, জ্যেষ্ঠা (Antares) এসব তারার রঙ কমলা অথবা লালচে, এসব দানব বা অতিদানব তারার আকার বিশাল আর আলো অতি উজ্জ্বল। উষ্ণতা কম বলে আর্দ্রার আয়তন হয়ে উঠেছে বিশাল; তার ব্যাস প্রায় ৪০ কোটি কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর পুরো কক্ষপথটাই তার ভেতরে ঢুকে যাবে।

বুটিজ (মেষপালক) তারামণ্ডলে স্বাতী নক্ষত্রের ব্যাস আমাদের সূর্যের প্রায় ২৫ গুণ। আবার অতিদানব তারা আর্দ্রা আর জ্যেষ্ঠা এর চেয়ে আরো প্রায় দশগুণ বড়। এদের আমাদের সূর্যের জায়গায় বসিয়ে দিলে তারা শুধু যে পৃথিবীকে গিলে খাবে তা নয়, মঙ্গলের কক্ষপথও ছাড়িয়ে যাবে। মিউ সেফাই নামে একটা অতিদানব তারা আছে, তার ব্যাস সূর্যের চেয়ে প্রায় তিন হাজার গুণ বেশি; সে এত বড় যে সূর্যের জায়গায় বসালে তার কিনারা শনির কক্ষপথ ছাড়িয়ে আরা বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবে।

লাল দানব আর অতিদানব তারাদের গায়ের তাপমাত্রা সূর্যের চেয়ে কম কিন্তু তাদের গায়ের ওপরকার এলাকা অনেক বড়, তাই তাদের বেশি উজ্জ্বল দেখায়। যেমন স্বাতীর গায়ের তাপমাত্রা ৪,২০০ ডিগ্রি সে., অথচ হলদে-সাদা সূর্যের ৫,৫০০ ডিগ্রি সে.; তবু স্বাতীর গা থেকে বিচ্ছুরিত হয় প্রায় একশটা সূর্যের সমান তেজ। আরো ঠাণ্ডা অতিদানব আর্দ্রা-র গায়ের ওপরকার তাপমাত্রা মাত্র ৩,০০০ ডিগ্রি সে., অথচ সে আলো দেয় স্বাতীর চেয়েও প্রায় একশগুণ বেশি।

তারার উজ্জ্বলতা মোটামুটি দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; এক হল তার ব্যাস, আরেকটা তার উষ্ণতা। লাল তারার চেয়ে নীল তারার উষ্ণতা বেশি, তাই একই রকম ব্যাস হলেও নীল দানব বা অতিদানবের আলো বহুগুণে বেশি হবে। আসলে নীল তারা আর্দ্রার মতো এমন বড় আকারের হয় না, তবে নীলচে-সাদা অতিদানব বাণরাজা আর্দ্রার মাত্র দশভাগের একভাগ ব্যাস নিয়েও দ্বিগুণ আলো বিলায়।

বাণরাজার গায়ের তাপমাত্রা ১০,০০০ ডিগ্রি সে., আর্দ্রার চেয়ে তিনগুণেরও বেশি; তবে অতি উষ্ণ নীল অতিদানব জেটা পাপ্পিস (Zeta Puppis)-এর তাপমাত্রা এর চেয়েও চারগুণ বেশি।

তারাদের আয়তনের আরেক প্রান্তে পড়ে বামন তারারা; তাদের কোন কোনটির আয়তন সূর্যের আয়তনের মাত্র কয়েক শতাংশ। এসব তারার আকার এত ছোট যে তাদের দূরবীন ছাড়া মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেণ্টরি আর আরেক কাছাকাছি তারা 'বার্নার্ডের নক্ষত্র' পড়ে লাল বামনের দলে; এদের গায়ের তাপমাত্রা আর্দ্রার মতোই, তবে ব্যাস সূর্যের ব্যাসের মাত্র দশ-ভাগের একভাগের মতো। এরা আলো ছড়ায় সূর্যের তুলনায় মাত্র দশ হাজার ভাগের এক ভাগ।

তবে লাল বামনরাই যে তারাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তা নয়, তার চেয়েও ছোট আছে সাদা বামন। এদের ব্যাস লাল বামনদের প্রায় দশ-ভাগের এক ভাগ, তবে উষ্ণতা বেশি বলে আলো ছড়ায় প্রায় একই রকম। একটা সাদা বামনের আয়তন প্রায় পৃথিবীর মতোই, তবে ভর অতি বেশি — প্রায় সূর্যের সমান। তাতে তার বস্তু ঘন হয়ে ওঠে সবচেয়ে ভারি ধাতুর চেয়েও বেশি। এসব তারা হল আমাদের সূর্যের মতো তারাদের বার্ধক্য পেরিয়ে একেবারে অন্তিম দশা।

আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের সঙ্গী হিসেবে আছে একটা সাদা বামন তারা; সে লুব্ধককে পঞ্চাশ বছরে একবার ঘুরপাক খায়। প্রভাস (Procyon), শীতের আরেক উজ্জ্বল তারা, তারও এক সাদা বামন সঙ্গী আছে, সেটা চল্লিশ বছরে একবার করে ঘুরপাক খায়। কিন্তু লুব্ধক আর প্রভাস নিজেরাই এমন উজ্জ্বল যে তাদের পাশে এই সঙ্গীদের বড়সড় দূরবীন দিয়েও দেখা বেশ শক্ত।

তারাদের আয়তন আর উজ্জ্বলতার একটা বড় নিয়ামক হল তার ভর অর্থাৎ তাতে কতটা গ্যাস আছে। তবে ভরেরও একটা ওপর-সীমা আছে। তারার ভর যদি হয় একশটা সূর্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি তাহলে সেটা এমন উষ্ণ আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে নিজে নিজেই ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে যায়। আমাদের থেকে ৬,৫০০ আলোক-বছর দূরে ইটা ক্যারিনি (Eta Carinae) নামে এমনি এক অতিদানব তারা আছে যা শক্তি বিকিরণ করছে সূর্যের চেয়ে ৫০ লক্ষ গুণ বেশি। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এর আয়ু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে; আর কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই এক বিশাল আলোর ফুলঝুরি ছিটিয়ে তারাটির মৃত্যু ঘটবে।

তারার ভরের যেমন ওপর-সীমা আছে, তেমনি আবার এক নিচের সীমাও আছে ; সূর্যের ৬ বা ৭ শতাংশের চেয়ে কম ভর হলে তার কেন্দ্রে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটবার মতো তাপ বা চাপ সৃষ্টি হয় না। গত ক'বছরে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু কিছু

বস্তুর খোঁজ পেয়েছেন যারা এই নিচের সীমায় বা তার ঠিক নিচে রয়েছে; এদের বলা হয় বাদামি বামন (brown dwarf)। এদের উষ্ণতা লাল বামনদের চেয়েও কম আর আয়তন বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি; তবে ভর বৃহস্পতির চেয়ে অনেক বেশি। এরা অনেকটা গ্রহ আর তারার মাঝামাঝি; তবে আকার অতিমাত্রায় ছোট আর বিকিরণের পরিমাণ সামান্য বলে আকাশে এদের খুঁজে পাওয়া শক্ত।

## আকাশে তারার জোট

দূরবীন আবিষ্কার হবার আগে বিজ্ঞানীরা খালি চোখেই আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকেও তাঁরা আকাশের অনেক রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন। কোপার্নিকাস, তাইকো, কেপলার এঁদের সব গবেষণা হয়েছিল এমনি ধরনের পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করেই। কিন্তু সতের শতকের শুরুতে দূরবীনের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদদের জন্য যেন এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে দিল। তাঁরা যেমন চাঁদ আর সূর্যের গায়ে নানা নতুন জিনিস দেখতে পেলেন তেমনি আকাশের বুকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক নতুন তারা তাঁদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। তাঁরা দেখলেন বেশিরভাগ তারা একা একা না থেকে যেন কয়েকটা মিলে একসঙ্গে জোট বেঁধে রয়েছে।

ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল আকাশে এমনি কয়েকশ যুগল তারার খোঁজ পেলেন। তিনি তাদের অবস্থান চিহ্ন দিয়ে রাখতে লাগলেন; তারপর বেশ ক'বছর পর আবার দেখলেন তাদের অবস্থান। দেখা গেল অন্তত ছয়টি ক্ষেত্রে তাদের একটি যেন অন্যটির চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরা যে সত্যি সত্যি যুগল তারা তাতে আর সন্দেহ রইল না। তার মধ্যে একটি হল মিথুন রাশির উজ্জ্বল নক্ষত্র বিষ্ণুতারা (Castor); দেখা গেল এতে আসলে রয়েছে দুটি নীলচে-সাদা তারা। হার্শেল হিসেব করলেন তারা পরস্পরের চারপাশে ঘুরপাক খায় মোটামুটি ৩৫০ বছরে একবার; আজ জানা গেছে হিসেবটা ৪৫০ বছরের একটু ওপরে। দেখা গেল এদের সঙ্গে কাছাকাছি আরেকটি আছে লাল বামন। তারপর তাদের আলো পরীক্ষা করে বোঝা গেল আসলে প্রত্যেকের সঙ্গে আছে আবার একটি করে যুগল। তাহলে দাঁড়াল বিষ্ণুতারা আসলে ছয়টি তারার এক জুটি; পরস্পর আকর্ষণের টানে সবাই একজোট হয়ে রয়েছে।

যুগল তারাদের মধ্যে কিছু আছে যাদের পরস্পর ঘোরার সময় লম্বা ; তাদের দূরবীন দিয়ে আলাদাভাবে দেখা যায়। আবার কিছু আছে যেগুলোর ঘোরার সময় মাত্র কয়েক দিন; তাদের দূরবীন দিয়ে পৃথক করা যায় না, তবে পৃথক করা যায় তাদের আলোর বর্ণালিবিশ্লেষণ করে। হার্শেলের সময় থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জেনেছেন আকাশের বেশিরভাগ তারাই আসলে দুটি বা তার বেশি তারার জোট;

আমাদের সূর্যের মতো একক তারাই বরং ব্যতিক্রম। অবশ্য সূর্যের জুটি তারা না থাকলেও তার চারপাশে একটি গ্রহ পরিবার আছে।

আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা আলফা সেন্টরি সেটাও একটি তারাজোট। খালি চোখে আলফা সেন্টরিকে দেখায় উজ্জ্বল হলদে-সাদা তারা হিসেবে। তবে দূরবীন দিয়ে দেখা যায় সূর্যের মতো দুটি তারা একটা অন্যটার চারপাশে ৮০ বছরে একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এছাড়া আবার আছে লাল বামন একটা তৃতীয় তারা যেটা অন্য দুটির চেয়ে আমাদের সামান্য একটু (০.১ আলোক-বছর) কাছের দিকে, আর অন্য দুটিকে ঘুরপাক খাচ্ছে সম্ভবত ১০ লাখ বছরে একবার।

যুগল তারাদের মধ্যে আবার দেখা যায় নানা রঙের খেলা। বিশেষ করে দু'রঙের দুটি তারাকে যখন পাশাপাশি দেখা যায় তখন সবচেয়ে চমৎকার লাগে। হংসমণ্ডলে হাঁসের ঠোঁটে যে তারাটি তার নাম আলবিরিও (Albireo বা Beta Cygni), সেটি এ ধরনের। একটা কমলা আর অন্যটা নীল-সবুজ এই তারা যুগলকে ছোটখাট দূরবীন দিয়েও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের আকাশে আরেকটু উত্তর দিকে দেখা যাবে এপসাইলন লাইরি (Epsilon Lyrae)-কে। বাইনোকুলার দিয়ে দেখলে মনে হবে একই রকম নীল-সাদা দুটি তারার জুটি; কিন্তু দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখা যায় তার প্রত্যেকটি আবার যুগল তারা।

যুগল তারার দুটি তারার মধ্যেকার দূরত্ব আর তাদের পরস্পরের চারপাশে ঘোরার সময় থেকে বিজ্ঞানীরা তারার ভর সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারেন। সবচেয়ে বড় বড় যুগল তারার হদিস পাওয়া গেছে একশৃঙ্গী (Monoceros, the unicorn) তারামণ্ডলে। এর প্রতিটি তারার ভর সূর্যের ভরের ৫৫ গুণ; এমন কি যেটি বেশি উজ্জ্বল তার ভর সূর্যের একশ' গুণও হতে পারে।

আকাশে কোথাও কোথাও দেখা যায় অনেকগুলো তারা একসঙ্গে জোট বেঁধে আছে; একেক জোটে আছে কয়েক ডজন থেকে কয়েক হাজার তারা। এসব জোটকে বলা হয় তারাস্তবক। এমনি একটা জোট দেখতে পাওয়া যায় বৃষমণ্ডলে ষাঁড়ের মুখের ওপর, তার নাম রোহিণী (Hyades) জোট। এসব তারাকে বাইনোকুলার দিয়ে ভাল দেখতে পাওয়া যায়। তবে ষাঁড়ের উজ্জ্বল চোখ লাল দানব রোহিণী বা আলদাবরান (Aldebaran) এই জোটের মধ্যে পড়ে না। ষাঁড়ের কাঁধের ওপর আছে আরেক জোট— পূর্ণ চাঁদের চেয়ে বড় একটি ধোঁয়াটে এলাকা হিসেবে। এ হল কৃত্তিকা বা 'সাতভাই' (পশ্চিমী দেশে বলে 'সাত বোন') – জ্যোতির্বিদদের দেয়া নাম এম৪৫। খালি চোখেও এর মধ্যে ছয়সাতটি তারা দেখা যায়; বেশ ভাল দেখা যায় বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে তাকালে। কয়েকশ' উজ্জ্বল তারা – তার বেশিরভাগ তরুণ নীল দানব – সেখানে জ্বলজ্বল করছে।

তারাস্তবক আবার আছে দু'ধরনের। তার একটা হল মুক্ত স্তবক (open cluster) – যেমন আমাদের থেকে প্রায় ৪১৫ আলোক-বছর দূরের কৃত্তিকা; এরকম স্তবকে তারারা ছড়ানো থাকে কিছুটা এলোমেলোভাবে। আরেক রকম আছে বর্তুলাকার স্তবক (globular cluster); এগুলো সাধারণত মুক্ত স্তবকের চেয়ে অনেক বড় আকারের হয়। এরকম স্তবকে কখনো কখনো একসঙ্গে থাকে কয়েক লাখ তারা আর ছড়িয়ে থাকে আকাশের প্রায় একশ আলোক-বছর ব্যাসের এলাকা জুড়ে। এসব স্তবক আবার হয় দু'রকম – গোলাকার আর উপবৃত্তাকার। বর্তুলাকার স্তবকে সাধারণত থাকে পুরনো তারারা; তাদের কোন কোনটা হাজার কোটি বছরের পুরনো। এসব স্তবক ছড়ানো থাকে যেন গ্যালাক্সির চারপাশে একটা গোল ছটার মতো; অথচ মুক্ত স্তবকে সচরাচর থাকে নতুন তারারা আর এরা থাকে গ্যালাক্সির প্যাঁচানো শাখায় শাখায়।

## তারার আলোর রকম ফের

তারারা যে সবাই সমান উজ্জ্বল তা নয় – সে আমরা আকাশের দিকে খালি চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারি। কোন তারা বেশ উজ্জ্বল আবার কোনটা অতিমাত্রায় মিনমিনে – দেখাই যায় না প্রায়। আমাদের দেখার আড়ালেও আছে অনেক তারা, সেগুলোকে দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। তারাদের উজ্জ্বলতার মাপ নেবার জন্য আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সেই গ্রিকদের সময় থেকেই জ্যোতির্বিদরা একটা মানদণ্ড তৈরির চেষ্টা শুরু করেছিলেন। সূর্য ডুবে যাবার পর প্রথম যেসব তারা ফুটে ওঠে অর্থাৎ খালি চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল যেসব তারা দেখা যায় তাদের উজ্জ্বলতাকে ধরা হল এক মাত্রা, আর সবচেয়ে শেষে যেসব তারা ফুঠে ওঠে অর্থাৎ সবচেয়ে কম উজ্জ্বল তারাদের উজ্জ্বলতা ধরা হল ছয় মাত্রা। অন্য সব তারাকে সে অনুযায়ী ফেলা হল অন্যান্য মাঝামাঝি মাত্রায়।

আধুনিক কালে জ্যোতির্বিদরা ১ মাত্রার তারার চেয়ে ঠিক ১০০ গুণ কম উজ্জ্বল তারাকে ধরেন ৬ মাত্রা হিসেবে। এসব তারা রয়েছে আমাদের দৃষ্টিশক্তির একেবারে প্রান্তসীমায়। এভাবে ১-এর চেয়ে ২.৫১ গুণ কম উজ্জ্বল তারাকে ধরা হয় ২ মাত্রা, তার চেয়ে ২.৫১ গুণ কম উজ্জ্বল তারাকে ৩ মাত্রা; এভাবে চলে ৬ মাত্রা পর্যন্ত। আজকাল এমন অনেক তারাকে দূরবীন দিয়ে দেখা যায় যারা আগে ছিল একেবারেই দৃষ্টিসীমার বাইরে। তাদের জন্য ৬-এর ওপরের সংখ্যাও ব্যবহার করতে হচ্ছে। যেমন ৬-এর চেয়ে ২.৫১ গুণ কম উজ্জ্বল তারাদের ধরা হয় ৭ মাত্রা, তারপর ৮ মাত্রা – এভাবে। পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় মোটামুটি ২৫ মাত্রার তারা পর্যন্ত। হাব্‌ল মহাকাশ দূরবীন দিয়ে দেখা যায় তার চেয়েও একশ' গুণ কম উজ্জ্বল তারা; এই মাপে তার মাত্রা হবে ৩০।

আকাশের আরো বেশি উজ্জ্বল যেসব বস্তু তাদের জন্য এই মাত্রার হিসেবটাকে উল্টো দিকে বাড়িয়ে দেয়া যায়। তাতে সেসব মাত্রা হয়ে দাঁড়ায় শূন্য বা তারও নিচে। যেমন আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের উজ্জ্বলতা দাঁড়ায় −১.৪৬। যখন সবচেয়ে জ্বলজ্বলে দেখায় তখন বৃহস্পতি আর শুক্রের উজ্জ্বলতা হয় যথাক্রমে −২.৯ আর −৪.৭। পূর্ণ চাঁদের উজ্জ্বলতা −১২.৭ আর সূর্যের −২৬.৮।

এগুলো সবই হল আপাত উজ্জ্বলতার হিসেব, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সচরাচর আমরা এদের কতটা উজ্জ্বল দেখি তার মাপ। তারাদের উজ্জ্বলতার আরেকটা হিসেব হল পরম উজ্জ্বলতা অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট মানের দূরত্ব থেকে দেখলে কাকে কতটা উজ্জ্বল দেখাত তার মাপ। আজকাল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ দূরত্ব হিসেবে ধরেন ১০ পারসেক (আগেই বলা হয়েছে 'পারসেক' হল এমন দূরত্ব যেখানে থাকলে তারার প্যারালাক্স বিচ্যুতি হয় এক সেকেণ্ড কোণ)। এভাবে দেখলে সূর্যের উজ্জ্বলতার পরম মান দাঁড়ায় মাত্র +৪.৮; অর্থাৎ ১০ পারসেক দূর থেকে খালি চোখে দেখলে সূর্যকে মোটেই তেমন উজ্জ্বল তারা বলে মনে হবে না। একই দূরত্ব থেকে লুব্ধককে দেখলে তার মান হবে +১.৪। অথচ আর্দ্রা আর বাণরাজার উজ্জ্বলতা হয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে −৭ আর −৮। আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল যেসব তারা তাদের পরম উজ্জ্বলতা হতে পারে −১০, আর সবচেয়ে মিনমিনে লাল দানব তারাদের পরম উজ্জ্বলতার মান হয় +১৮।

## বিষম তারা

খালি চোখে তারাদের দেখতে সব সময় এক রকম মনে হলেও আসলে অনেক ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই তারার উজ্জ্বলতার বেশ হেরফের হয়। এটা জ্যোতির্বিদরা সতের শতকের গোড়ার দিকেই প্রথম লক্ষ্য করেন। তিমিমণ্ডলে ওমিক্রন সেটি নামের এক তারা কিছুদিন অদৃশ্য থাকার পর আবার তাকে দেখা গেল; একে আজকাল বলা হয় 'মার' (Mira অর্থাৎ অপরূপ)। এটা একটা লাল দানব তারা; বিশাল বেলুনের মতো এগার মাসে একবার ফুলে ওঠে, আবার চুপসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বলতাও কমে বাড়ে – দুই বা তিন মাত্রা থেকে নেমে আসে দশ মাত্রার কাছাকাছি, আবার ওঠে ওপরে। মার-এর মতো তারাদের বলা হয় দীর্ঘ কালমাত্রার বিষম তারা (variable star); এদের কারো উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দু'মাসে, কারো বা আরো বেশি সময় ধরে – সেটা দু'বছরও হতে পারে। এ ধরনের বিষম তারা হাজার হাজার দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণত লাল অতিদানব তারাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার যথেষ্ট কম-বেশি হতে দেখা যায়। তার একটা কারণ হল অতিমাত্রায় ফেঁপে ওঠা বিশাল বপুর কারণে তাদের গড়ন তেমন সুস্থিত নয় – অনেকটা যেন নড়বড়ে গোছের। তবে তাদের

উজ্জ্বলতার কমা-বাড়া তেমন নিয়মিত নয়। কয়েক বছরের মধ্যে আর্দ্রার উজ্জ্বলতায় শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশি কম-বেশি ঘটতে পারে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেরও উজ্জ্বলতার কম-বেশি হয়, তবে সেটা তত প্রকট নয়।

১৭৮২ সালে জন গুডরিক (John Goodricke) নামে ১৮ বছর বয়সী এক শৌখিন জ্যোতির্বিদ লক্ষ্য করেন বিটা পার্সি বা মায়াবতী (Algol) নামে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বদলে যাচ্ছে। গুডরিক জন্মেছিলেন কালা আর বোবা হয়ে; কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে মায়াবতীকে লক্ষ্য করতে করতে তিনি আবিষ্কার করলেন এর উজ্জ্বলতার কম-বেশি ঘটছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর – এই সময়টা ২ দিন ২১ ঘণ্টা। এক সময় দেখা যায় মায়াবতীর উজ্জ্বলতা কমতে শুরু করেছে; পাঁচ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়; তারপর আবার পাঁচ ঘণ্টায় আগের অবস্থায় ফেরত আসে। এরপর প্রায় আড়াই দিন উজ্জ্বলতা একই রকম থাকে, তারপর আবার কমতে শুরু করে। গুডরিক ভাবলেন এর চারপাশে কোন গ্রহ ঘুরছে, তাই গ্রহণ লেগে তার আড়ালে পড়ে যাওয়ায় আলোর এরকম ওঠা-নামা ঘটছে।

তখন ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা যায় নি। কিন্তু তার প্রায় একশ' বছর পর বর্ণালিবীক্ষণ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা গেছে যে, মায়াবতীর গ্রহণ লাগার কারণ আসলে গ্রহ নয়, নক্ষত্র। এ ধরনের তারাদের বলা হয় গ্রহণ-লাগা বিষম তারা (eclipsing binaries)। অর্থাৎ মায়াবতী আসলে একটা যুগল তারা। জুটির মধ্যে একটা হল নীলচে-সাদা, তার সঙ্গীর চেয়ে ২৫ গুণ উজ্জ্বল ; কিছুটা বড় আকারের অন্য তারাটা কমলা রঙের। যখন উজ্জ্বল তারাটির প্রায় চার-পঞ্চমাংশ ঢেকে যায় তখন উজ্জ্বলতা সবচেয়ে কম হয়; খানিক পর উজ্জ্বল তারাটি কম উজ্জ্বল তারাকে ঢেকে দেয়, তবে সে সময়ে আলোর হেরফের এত কম হয় যে পৃথিবী থেকে খালি চোখে সেটা বোঝা যায় না।

আকাশে গ্রহণ-লাগা বিষম তারা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়; তাদের আলোর কম-বেশি হয় সাধারণত কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহে। তবে এপসাইলন অরিগি নামে একটি তারা আছে তার গ্রহণ লাগে ২৭ বছর পর পর আর তা চলে প্রায় দু'বছর ধরে। এই নক্ষত্রে এর পরের গ্রহণ লাগবে ২০০৯ সালে।

গুডরিক বিটা লাইরি ও ডেল্টা সেফি নামে আরো দুটি বিষম তারা আবিষ্কার করেছিলেন। ক্রমাগত রাতের আকাশে তারা দেখতে গিয়ে নিউমোনিয়া লেগে মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয়, তাই এদের আলোর কম বেশি হবার কারণ তিনি ঠিকমতো ধরতে পারেন নি। আজ আমরা জানি বিটা লাইরি একটা গ্রহণ-লাগা বিষম তারা; তারা দুটি এত কাছাকাছি যে পারস্পরিক প্রবল

আকর্ষণের টানে এদের দুয়েরই আকার হয়ে গিয়েছে ডিমের মতো লম্বাটে। ডেল্টা সেফির আয়তনে প্রায় ১০ শতাংশ কম-বেশি হয়, তাতে তার উজ্জ্বলতারও হেরফের ঘটে। দেখা গেল ডেল্টা সেফির মতো তারাদের বিশেষ এক জাতে ফেলা যায়; তার নাম দেয়া হয়েছে শেফালি বিষম তারা (Cepheid Variables), আর এদের সাহায্যে আকাশে খুব দূরের তারাদের দূরত্ব বের করা যায়।

শেফালি বিষম তারারা আসলে অতিকায় দানব তারা, এদের গায়ের রঙ সাদা অথবা হলদে। লাল দানব বা সাধারণ অতিদানবদের আয়তনের কম-বেশি হওয়া যেমন কিছুটা এলোমেলো, এদের কম-বেশি হওয়া তেমনি ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বেঁধে, সাধারণত কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর পর। ডেল্টা সেফির কম-বেশি হবার সময় পাঁচ দিনের একটু ওপরে, আর উজ্জ্বলতা যখন বেশি হয় তখন এর সব চেয়ে কমের তুলনায় উজ্জ্বলতা হয় দ্বিগুণ। আরেক বিখ্যাত শেফালি তারা হল ধ্রুবতারা ; এর উজ্জ্বলতার কম-বেশি হওয়া এত সামান্য যে খালি চোখে তা টের পাওয়া যায় না। মনে হয় ধ্রুবতারার কম-বেশি হওয়া ক্রমে ক্রমে থেমে যাচ্ছে; কিছুদিন পর হয়তো একবারেই থেমে যাবে।

১৯১২ সালে হেনরিয়েটা লিভিট (Henrietta Leavitt) নামে এক মার্কিন জ্যোতির্বিদ শেফালি বিষম তারাদের সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। সে হল তাদের আলোর কম-বেশি হওয়ার সময় সরাসরিভাবে নির্ভর করে তাদের উজ্জ্বলতার পরম মানের ওপর। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাদের কম-বেশি হবার সময় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য তারাদের যে উজ্জ্বলতা আমরা দেখি সে হল তাদের আপাত উজ্জ্বলতা আর এটা নির্ভর করে সেই তারা কত দূরে রয়েছে তার ওপর। কাজেই বিজ্ঞানীরা তারার পরম উজ্জ্বলতা আর আপাত উজ্জ্বলতার তুলনা করে তার দূরত্ব বের করতে পারেন। যেমন ডেল্টা সেফি আলো দেয় ২,০০০ সূর্যের সমান, কিন্তু খালি চোখে একে খুব মিনমিনে তারা মনে হয় কারণ এটি রয়েছে ১,৩০০ আলোক-বছর দূরে। শেফালি তারাদের সাহায্যেই ছায়াপথ গ্যালাক্সির আয়তন এবং অন্যান্য গ্যালাক্সির দূরত্ব বের করা সম্ভব হয়েছে।

## নবতারার আলোর মশাল

সারা পৃথিবীতেই জ্যোতির্বিদরা বাইনোকুলার, দূরবীন, ক্যামেরা এসব নিয়ে রাতের পর রাত আকাশের তারাদের পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। এমনি আকাশের দিকে দেখতে দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে অকস্মাৎ তারার রাজ্যে বিপুল বিস্ফোরণের হদিস পেয়ে যান। প্রতি বছর দু'তিনটি মিনমিনে তারা যেন হঠাৎ হাজার গুণ, কখনো বহু লক্ষগুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এদের বলা হয় নবতারা (nova) ; তার কারণ এককালে জ্যোতির্বিদরা ভাবতেন বুঝি একটি নতুন

তারারই জন্ম হল। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে হংসমণ্ডলে নোভা সিগনি নামে একটি নবতারা এমনি দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তখন তাকে ঐ মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা পুচ্ছ বা দেনেব (Deneb)-এর প্রায় সমান দেখায়। তবে ক'দিন পরেই তার ঔজ্জ্বল্য আবার নিভে গেল; এখন তাকে সাধারণ দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানীরা সে তারাটি আগে কি অবস্থায় ছিল তার হদিস করার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল আগের সব তারা মানচিত্রে সেটা এমন ছোটখাট আকারের দেখাত যে তার দিকে এতদিন কারো নজরই পড়েনি। বোঝা গেল সেটা নবতারা অবস্থায় প্রায় চারকোটি গুণ বড় হয়ে উঠেছিল; সে অবস্থায় সূর্যের চেয়ে তার আলোর বিকিরণ হয়ে উঠেছিল প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি। পথে প্রচুর ধুলোর বাধার জন্যই তাকে পৃথিবী থেকে ততটা বড় দেখায় নি।

বিজ্ঞানীরা পরে জেনেছেন আসলে নোভারা হল কাছাকাছি যুগল তারা; তার একটি সাদা বামন আরেকটি লাল দানব অথবা লাল দানবে পরিণত হচ্ছে এমন তারা। এই দানব থেকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে সাদা বামনের চারপাশে একটা আঙটার মতো তৈরি করে। ক্রমে ক্রমে এই আঙটা থেকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে সাদা বামনের গায়ে; এক সময় এই গ্যাসে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে বিপুল গ্যাস জ্বলে ফুঁসে ওঠে। একই নোভা এভাবে কিছুদিন বিরতি দিয়ে বার বার ফুঁসে উঠতে পারে।

নোভার চেয়ে আরো বড় আকারের তারা বিস্ফোরণ ঘটে অতিনবতারার (supernova)। ছোটখাট গ্যালাক্সির মতো আলো বিকিরণ করে সেটা সাধারণ নোভার চেয়ে বহু শতগুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের গ্যালাক্সিতে ১৬০৪ সালের পর সুপারনোভা বিস্ফোরণ আর দেখা যায় নি; তবে কাছাকাছি বৃহৎ ম্যাজেলান মেঘ নীহারিকায় ১৯৮৭ সালে একটি অতিনবতারা দেখা দেয়, সেটা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে কয়েক মাস ধরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।
অতিনবতারা আবার দু'রকম। একরকম টাইপ-১, এদের যুগল তারায় দেখতে পাওয়া যায়। এরা হুবহু নবতারার মতোই তবে আকারে আরো অনেক বড়সড়। এই যুগলের মধ্যে লাল দানব থেকে সাদা বামন তারায় এত বেশি গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে যে সমগ্র তারাটিই বিস্ফোরণের ফলে চারপাশে ছিটকে ওঠে। টাইপ-২ অতিনবতারা হল বড় আকারের তারার মৃত্যুকালীন বিস্ফোরণ। ইটা ক্যারিনি নামে একটি দানব তারা জীবনের শেষ প্রান্তে আজ এমন টলমলে অবস্থায় রয়েছে যে, মনে হয় এটি আগামী দশ হাজার বছরের মধ্যেই অতিনবতারায় পরিণত হবে – আর বিপুল বিস্ফোরণে ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে ছিটকে পড়বে চারপাশে।

# তারার ভিড়ে একটি তারা

শীতের আকাশে একটা দেখার মতো জিনিস হল কালপুরুষ তারামণ্ডল; ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত রাতের আকাশ আলো করে থাকে এই মণ্ডলটি। এই মণ্ডলের তারাগুলো মিলে তৈরি করেছে যেন এক শিকারীর ছবি – তার ডান কাঁধে রয়েছে লাল অতিদানব তারা আর্দ্রা, নীল-সাদা অতিদানব বাণরাজা রয়েছে তার বাঁ পায়ে। তিনটে একই রকম তারা আছে তার কোমরবন্ধে, তা থেকে ঝুলে আছে তলোয়ার। তলোয়ারের কাছাকাছি আছে আবছামতো কালপুরুষ নীহারিকা; বাইনোকুলার দিয়ে তাকে ভাল দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের কাছ থেকে প্রায় ১,৫০০ আলোক-বছর দূরের এই নীহারিকাটি আসলে এক বিশাল ধুলো আর গ্যাসের পুঞ্জ; তার মাঝখানে আছে কিছু আনকোরা নতুন তারা, তাদের আলোতেই নীহারিকাটি দেখতে পাওয়া যায়। এর কেন্দ্রের আশপাশে সৃষ্টি হচ্ছে আরো অসংখ্য নতুন নতুন তারা। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে আমাদের সূর্য আর তার কাছাকাছি সৌরজগতের এলাকাও দেখতে ছিল এরকমই।

কালপুরুষ নীহারিকার যেটুক এলাকা দেখা যায় সেটাই তার সব নয়, তার আড়ালে আরো বিশাল এলাকা জুড়ে আছে ধুলো আর গ্যাসের পাঁজা; অবলাল রশ্মির আলোতে ছবি তুললে তা ভাল দেখা যায়। সমগ্র কালপুরুষ নীহারিকা ছড়ানো প্রায় পনের আলোক-বছর চওড়া এলাকা জুড়ে; আর তাতে যে পরিমাণ গ্যাস আছে তাতে হাজার হাজার তারার জন্ম হতে পারে। সে গ্যাসের প্রায় পুরোটাই হাইড্রোজেন, অল্প আছে হিলিয়াম। এই মৌলগুলো তারার দেহের মূল উপাদান।

এই ধুলো আর গ্যাসের পাঁজায় হয়তো কোনভাবে এসে লাগে একটা ঘাত তরঙ্গ। ঘাত তরঙ্গ আসতে পারে কোন দানব তারার অতিনবতারা বিস্ফোরণ থেকে। তাতে নীহারিকার একটা অংশে কিছু ধুলো আর গ্যাস জোট বেঁধে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই বিশাল জোট ক্রমে ক্রমে যত সংকুচিত হয় তত তার উষ্ণতা বাড়ে। অবশেষে একসময়ে তার ভেতরটা এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তাতে সেখানে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়। এই পারমাণবিক বিক্রিয়াই সেই থেকে তারার সারাটা জীবনকাল তার বুকে ক্রমাগত শক্তির যোগান দিয়ে যেতে থাকে।

সূর্য যে গ্যাসের পুঞ্জ থেকে তৈরি হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধে পারমাণবিক বিক্রিয়ার পর্যায়ে যেতে লেগেছে হয়তো পাঁচ কোটি বছর। আরো ভারি তারাদের জমাট বেঁধে এ পর্যায়ে যেতে সময় লাগে তার চেয়ে কম।

সবচেয়ে ভারি তারাদের হয়তো লাগে মাত্র ১০,০০০ বছর, আবার খুব কম ভরের তারাদের লাগে সূর্যের চেয়ে দশগুণ পর্যন্ত বেশি সময়। কালপুরুষের মতো নীহারিকার বুকে জন্ম নেয় একটি দুটি তারা নয়, একসঙ্গে বড় রকম তারার জোট। বৃষমণ্ডলে 'সাতভাই' জোট এমনি এক তরুণ তারাজোটের নমুনা; এদের জন্ম হয়েছে হয়তো মাত্র বিশ-ত্রিশ লাখ বছর আগে। সচরাচর এভাবে যেসব জোট তৈরি হয় তার বিভিন্ন তারা পরে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যায়। সূর্যও হয়তো একসময়ে কোন তারাজোটের অংশ ছিল, এখন জোটের অন্য সব তারা দূরে সরে পড়েছে।

## তারাদের মূল ধারা

একটি তারা যখন মোটামুটি সুস্থিত হাইড্রোজেন জ্বলার পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তাকে বলা হয় মূলধারার তারা। আমাদের সূর্য এই পর্যায়ে পৌঁছেছে আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। মূলধারার তারাদের উজ্জ্বলতা মূলত নির্ভর করে তাদের ভরের ওপরে। সবচেয়ে ভারি তারারা হয় সবচেয়ে উজ্জ্বল। ভর যদি দু'গুণ বাড়ে তাহলে উজ্জ্বলতা বাড়ে দশগুণেরও বেশি।

তারারা খুব ভারি হলে তাদের ভর হয় সূর্যের চেয়ে প্রায় একশগুণ বেশি, আবার সবচেয়ে হালকা তারার ভর হয় সূর্যের ভরের আট শতাংশের মতো। মূলধারার সবচেয়ে ভারি তারাদের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি বলে তাদের রঙ নীলচেও বেশি; এগুলো আমাদের সূর্যের চেয়ে বহু লক্ষগুণ বেশি উজ্জ্বল। আবার অন্যদিকে মূলধারার নকশায় নিচের দিকে সবচেয়ে কম যাদের ভর আর উষ্ণতা সেই লাল বামনরা হয় সূর্যের চেয়ে প্রায় ১০,০০০ গুণ কম উজ্জ্বল। তারাদের মধ্যে কম ভরের তারার সংখ্যাই আসলে বেশি, তবে সেগুলো আকারে ছোট আর কম উজ্জ্বল বলে তাদের তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। মূলধারার সবচেয়ে বড় তারারা সূর্যের চেয়ে বহুগুণে বড় হলেও সেগুলো দানব বা অতিদানব তারা নয়; আসলে তারারা বুড়ো না হলে তেমন দানব অবস্থায় পৌঁছায় না।

তারার ভরের ওপর শুধু যে তার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে তা নয়, নির্ভর করে তার উষ্ণতা কত হবে, আয়তন কত বড় হবে আর সেটা কতদিন টিকবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার তারার প্রকৃত উজ্জ্বলতা আর উষ্ণতা মেপেছেন। সবচেয়ে কম উষ্ণ তারাদের রঙ হয় লাল, আর সবচেয়ে উষ্ণ তারাদের হয় নীল। তারাদের উজ্জ্বলতা আর রঙের বৈশিষ্ট্য যদি একটা লেখচিত্রে বসানো যায় তাহলে দেখা যায় বেশিরভাগ তারা পড়ছে বাঁ থেকে ডান দিকে একটি ইংরেজি এস অক্ষরের মতো বাঁকানো রেখার ওপরে (হের্ৎস্প্রুং-রাসেল নকশা)। এটাই হল তারাদের মূলধারা। আমাদের গ্যালাক্সির ৯০ শতাংশ তারা পড়ে এই মূলধারায়।

কোন তারা যখন নীহারিকার গ্যাসের পুঞ্জ থেকে জমাট বেঁধে পারমাণবিক বিক্রিয়ার স্তরে পৌঁছায় আর তেজ বিলাতে শুরু করে তখন ভরের ওপর নির্ভর

করে উজ্জ্বলতা আর উষ্ণতা অনুসারে মূলধারায় তার জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সূর্যের মতো ভরের তারাদের রং হয় হলুদ আর মূলধারায় টেকে সাধারণত ১,০০০ কোটি বছর। সূর্যের চেয়ে চারভাগের একভাগ যেসব তারার ভর তাদের রঙ হয় লাল আর উজ্জ্বলতা হয় সূর্যের তুলনায় মাত্র এক শতাংশ, তবে তারা মূলধারায় টেকে প্রায় ১০,০০০ কোটি বছর। অথচ সূর্যের চেয়ে বেশি ভরের তারারা উষ্ণ আর উজ্জ্বল হয় বেশি আর মূলধারায় টেকে কম সময়।

তারারা যে নানা রঙের আলো ছড়ায় এ থেকে বিজ্ঞানীরা এদের দেহের উপাদানের হদিস করতে পারেন। যে কোন উজ্জ্বল আলো একটা তেকোণা কাচের ভেতর দিয়ে পেরোলে রঙধনুর মতো নানা রঙে ভেঙ্গে যায়। লম্বা ঢেউগুলো পড়ে লাল প্রান্তে আর ছোট ঢেউগুলো নীল প্রান্তে। বিজ্ঞানীরা স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবিশ্লেষ যন্ত্রের সাহায্যে আলোর রঙ বিশ্লেষণ করে সেসব কি উপাদানে তৈরি তার হদিস করতে পারেন। সূর্য এবং অন্যান্য তারার বর্ণালিতে নানা রঙের ওপর সুতোর মতো আড়াআড়ি কতকগুলো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এসব দাগ তৈরি হয় তারার ওপরকার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা গ্যাস বর্ণালির আলো শুষে নেবার কারণে। জোসেফ ফ্রাউনহোফার (Joseph Fraunhofer) নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী ১৮১৪ সালে প্রথম এসব রেখার হদিস পান, তাঁর নামে এদের বলা হয় ফ্রাউনহোফার রেখা। প্রত্যেক মৌলের জন্য বিশেষ ধরনের রেখার সৃষ্টি হয়; তাই বর্ণালিতে রেখা পরীক্ষা করে সূর্য বা তারার দেহ কি দিয়ে তৈরি তা জানা যায়। এভাবে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন সূর্যের গায়ে আছে মোটামুটি ৯০ শতাংশ হাইড্রোজেন আর ১০ শতাংশ হিলিয়াম; অন্যান্য মৌল আছে এক শতাংশের কম। বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা তারাদের উপাদানের হদিস করা ছাড়াও তাদের গায়ে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে কিনা এবং তারা কোন্ দিকে কত বেগে সরে যাচ্ছে এমনি আরো নানা কথা জানতে পারেন।

## আমাদের সূর্য একটি তারা

আমাদের সূর্য যে একটা তারা একথা মানুষ জেনেছে বহুকাল আগে। সূর্য আমাদের পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। এর ব্যাস প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার (৯ লক্ষ মাইল) অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ১০৯ গুণ; আয়তন বড় ১৩ লক্ষ গুণ; ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩৩০,০০০ গুণ বেশি। পানির তুলনায় এর গড় আপেক্ষিক ঘনত্ব হল ১.৪ (ভেতরের দিকে তার চেয়ে অনেক বেশি, বাইরের দিকে অনেক কম)। গায়ের তাপমাত্রা মোটামুটি ৫,৫০০ ডিগ্রি সে.; কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় ১.৬ কোটি ডিগ্রি সে.। পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কি.মি. বা ৯.৩০ কোটি মাইল; সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৮.৩ মিনিট।

সূর্যকে এমনিতে দেখে বোঝা যায় না কী প্রচণ্ড আর নিরবচ্ছিন্ন ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে এই গ্যাসের গোলকটার ভেতরে আর তার গায়ে সেই ঝড়ের কিছু চিহ্ন

বহন করছে কত মসীলিপ্ত এলাকা। সূর্য যে শুধু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আলো আর তাপ দেয় তাই নয়, এটি আমাদের এমন কাছাকাছি যে এই নক্ষত্রটিকে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আমরা বিশ্ব রহস্যের নানা গোপন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারি। সূর্যের তেজ বিকিরণে সামান্য মাত্র হেরফের ঘটলে তা আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়ায় বেশ বড় রকম ছাপ ফেলতে পারে। তাই এর গায়ে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সময়মতো তার হদিস পাওয়া আমাদের জন্য জরুরি। পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় সূর্যের গায়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, আর এর পরও যে ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সূর্যের ওপর নজর রাখা একদিক দিয়ে খুবই সহজ; তবে আবার খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো খুবই বিপজ্জনকও। সূর্যকে দেখতে হলে তার চেহারা আয়না বা দূরবীন দিয়ে কোন সাদা দেয়াল বা পর্দার ওপর ফেলাই নিরাপদ। খালি চোখে বা যে কোনরকম যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সূর্যের দিকে সরাসরি তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। দেয়ালে ছায়া ফেলে সূর্যের গায়ে সবচেয়ে সহজে যা দেখা যায় তা হল সৌরকলঙ্ক। কখনো এসব কলঙ্ক ফুটে ওঠে দল বেঁধে, কখনো নেহাৎ একটি বা দুটি; তারা কখনো থাকে দু'চারদিন, কখনো মাসের পর মাস। সূর্য যখন থাকে দিগন্তের খুব কাছে তখন বড়সড় কলঙ্কগুলো খালি চোখেও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের কলঙ্কগুলোও এত বড় যে তার ভেতরে অনায়াসে বেশ ক'টা পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে।

দূরবীন আবিষ্কার হবার বহু আগে থেকেই মানুষ সৌরকলঙ্ক দেখে আসছে। ১৮৮ সালের এক চীনা বিবরণে বলা হয়েছে: "সূর্য দেখাচ্ছিল কমলা রঙের। তার মাঝখানে ছিল একটা কালো রঙের বাষ্পের মতো, যেন একটা বড় মাছি সেখানে ভনভন করছে। কয়েক মাস পর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।" আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীরাও সৌরকলঙ্ক দেখার কথা লিখে রেখে গেছেন। ৮৪০ সালের এক বিবরণে বলা হয়েছে: "খলিফা আল-মু'তাসিমের রাজত্বকালে ২২৫ হিজরি সালে সূর্যের মাঝামাঝি এলাকায় একটা কালো দাগ দেখা দিল ... এই দাগটি ৯১ দিন ধরে সূর্যের গায়ে ছিল।"

সৌরকলঙ্ক দেখা দেবার মধ্যে যে একটা নিয়ম আছে এটা প্রথম দেখান জার্মানির একজন ওষুধের দোকানের কর্মী, তাঁর নাম হাইনরিখ শোয়াবে (Heinrich Schwabe)। তিনি ছোট একটা দূরবীন দিয়ে ১৭ বছর ধরে সূর্যের গায়ে সৌরকলঙ্ক পরীক্ষা করে ১৮৪৩ সালে বললেন সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ১০ বছর পর পর চক্রাকারে কমে বাড়ে। পরে অন্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন আসলে চক্রটা মোটামুটি ১১ বছরের; তবে চক্র থেকে চক্রে সময়ের বেশ কিছুটা হেরফের হয়, সৌরকলঙ্কের সংখ্যাতেও যথেষ্ট কম-বেশি ঘটে। চক্রের সর্বনিম্ন পর্যায়ে বেশ

ক'মাস সূর্যের বুকে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না; সর্বোচ্চ পর্যায়ে বহু কলঙ্কের দাগ ফুটে ওঠে। তখনকার কলঙ্কের সংখ্যাও সব সময় একরকম থাকে না, যেমন ১৮০৪ আর ১৮১৬ সালে সর্বোচ্চ সৌরকলঙ্ক ছিল ৫০-এর নিচে, আবার ১৯৫৭ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যাটা ছিল ১৯০।

১৮৫৩ সালে রিচার্ড ক্যারিংটন (Richard Carrington) নামে আরেক শৌখিন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ শোয়াবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সৌরকলঙ্কের সাহায্যে সূর্যের নিজের অক্ষের ওপর ঘুরপাক খাওয়ার সময় হিসেব করার চেষ্টা করলেন। সূর্য নিজের অক্ষের ওপর ঘোরার ফলে সৌরকলঙ্ক তার গায়ে একপাশে দেখা দিয়ে ক্রমে ক্রমে তার গায়ের ওপর দিয়ে পেরিয়ে অন্য প্রান্তে মিলিয়ে যায়। ক্যারিংটন দেখলেন বিষুবরেখার কাছে সূর্য একবার ঘুরে আসতে লাগে প্রায় ২৫ দিন, কিন্তু বিষুবরেখা আর মেরুর মাঝামাঝি জায়গায় এই সময় দাঁড়ায় ২৭·৫ দিন। এর চেয়ে উত্তরে সচরাচর সূর্যকলঙ্ক দেখা যায় না। তবে অন্যভাবে হিসেব করে দেখা গেছে মেরুর কাছাকাছি এলাকায় সূর্যের ঘোরার সময় প্রায় ৩৬ দিন। সূর্য কঠিন বস্তু না হয়ে গ্যাস দিয়ে তৈরি বলেই তার বিভিন্ন এলাকায় ঘোরার সময়ে এমন তারতম্য হয়। সাধারণত একই সৌরকলঙ্ক একপাকের বেশি সময় ধরে টিকে থাকে না। ১৯৪৩ সালে একগুচ্ছ কলঙ্ক একনাগাড়ে সাত মাস দেখা গিয়েছিল।

আজ বিজ্ঞানীরা জেনেছেন সৌরকলঙ্ক আসলে সূর্যের গায়ে কিছুটা ঠাণ্ডা গ্যাসের এলাকা; ওপরকার উত্তপ্ত আলোকমণ্ডলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা এলাকা বলে এদের কালো রঙের দেখায়। কলঙ্কের ভেতরকার প্রচ্ছায়া (umbra) এলাকার তাপমাত্রা হয় মোটামুটি ৪,০০০ ডিগ্রি সে., অর্থাৎ কমলা রঙের দানব তারা স্বাতীর মতো উষ্ণ। এর চারপাশে অপেক্ষাকৃত হালকা উপচ্ছায়া (penumbra) এলাকা প্রচ্ছায়া অঞ্চলের চেয়ে মোটামুটি ১,০০০ ডিগ্রি বেশি উষ্ণ। বড় বড় কলঙ্কজোট সূর্যের বুকে ১,০০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো হতে পারে।

সূর্যের ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হয় প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র। আবার বিষুব এলাকায় আর মেরু এলাকায় ঘোরার বেগের তারতম্যের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র বেঁকেচুরে গিয়ে অনেকটা পুব-পশ্চিম মুখো হয়ে পড়ে; তারপর এক সময় এই চৌম্বক ক্ষেত্র সূর্যের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। যেখানে যেখানে এভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র গা ফুঁড়ে বেরোয় সেখানে ভেতর থেকে তাপ বেরিয়ে আলোকমণ্ডলে পৌঁছবার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, তাতেই সেখানকার গ্যাস কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আর সৃষ্টি হয় সৌরকলঙ্কের। সেখান থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র যখন মিলিয়ে যায় তখন সৌরকলঙ্কও অদৃশ্য হয়ে যায়।

বড় বড় সৌরকলঙ্কগুলো দেখা দেয় জোড়ায় জোড়ায় পুব-পশ্চিমে সাজানো — অশ্বখুর চুম্বকের উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মতো। তার এক মেরুতে চৌম্বক ক্ষেত্র

সূর্যের গা থেকে বেরিয়ে আসে, আরেক মেরুতে ভেতরে ঢোকে। সৌরকলঙ্কের ১১ বছরের চক্রে সূর্যের একই গোলার্ধের সব কলঙ্ক জুটিতেই দেখা যায়— যে কলঙ্কটি সামনে থাকে তার চৌম্বকমেরু থাকে এক রকম আর পেছনের কলঙ্কের মেরু থাকে আরেক রকম। পরের ১১ বছরের চক্রে আবার এটা উল্টে যায়। এসব তথ্য পরীক্ষা করে ১৯১২ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ হেল বললেন, আসলে সৌরকলঙ্কের চক্রের সময় ১১ বছর নয়, ২২ বছর।

সৌরকলঙ্ক ছাড়াও সূর্যের গায়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিশাল সৌরছটা (solar flare)। ১৮৫৯ সালে সূর্যকে পরীক্ষা করতে করতে রিচার্ড ক্যারিংটন আকস্মিক সৌরছটার দেখা পান। তিনি দেখলেন দুটি সাদা আলোর এলাকা অকস্মাৎ বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। তার পরের রাতে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে নানা উৎপাতের লক্ষণ দেখা দিল, বহু জায়গায় রাতের আকাশে অরোরা বা মেরুজ্যোতি দেখার খবর পাওয়া গেল। এ থেকেই প্রথম বোঝা গেল সূর্যের ওপরকার বিচ্ছুরণ পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলে। কেন বা কিভাবে তা ঘটে সেটা জানা গেছে অনেক পরে।

## সূর্য-পৃথিবী এক সুতোয়

আজ আমরা জানি সৌরকলঙ্কের ওপর যখন কোন কারণে অকস্মাৎ চৌম্বক শক্তি ছাড়া পায় তখনই সৌরছটা দেখা দেয়। সেখান থেকে তখন ছিটকে বেরোয় বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক কণা — তার বেশিরভাগই প্রোটন আর ইলেকট্রন। এসব কণা যখন পৃথিবীতে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে তার বেশিরভাগ জড়ো হয় মেরু এলাকায়। সেখানে উঁচু বায়ুমণ্ডলে এসে পড়লে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উঁচুতে সবুজ আর লাল রঙের ছোপ দেয়া একটা আলোর ঝালর যেন আকাশে ঝুলতে থাকে।

সূর্য থেকে এমনি বৈদ্যুতিক কণা এসে পড়ার ফলে পৃথিবীর ওপরে যেসব পরিবাহী থাকে, যেমন বিজলির তার বা তেলের পাইপ, তাতেও সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ; তার ফলে বিজলি বা টেলিফোন লাইনে বিপর্যয় ঘটে, তেলের পাইপের ক্ষয় বেড়ে যায়। যেসব দেশ বা এলাকা উত্তর দিকের অক্ষাংশে পড়েছে যেমন কানাডা, আলাস্কা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সেসব জায়গায় এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। কখনো কখনো সূর্যের প্রচণ্ড বিচ্ছুরণের ফলে দেশের বিশাল এলাকায় বিজলি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে।

সূর্যের সৌরকলঙ্ক দেখা দেবার সঙ্গে তাল রেখে আরেক ধরনের ব্যাপার ঘটে, তাকে বলা হয় সূর্যশিখা (prominence); চৌম্বক বলরেখা বরাবর সূর্যের গায়ের ওপর অনেক উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে বিশাল গ্যাসের শিখা। পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময়

এদের দেখতে সুবিধে; অন্য সময় সূর্যের গা কোনভাবে ঢেকে দিয়ে সূর্যকে দেখলে শিখা দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে সূর্যের বিকিরণের কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। ১৬৪৫ থেকে ১৭১৫ সালের মধ্যে সূর্যের গায়ে তেমন কোন সৌরকলঙ্ক বা মেরুজ্যোতি দেখা দেয়নি; ওয়াল্টার মণ্ডার (E. Walter Maunder) নামে একজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ উনিশ শতকের শেষে এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; সেজন্য এর নাম রাখা হয়েছে 'মণ্ডার মিনিমাম' অর্থাৎ মণ্ডারের সর্বনিম্ন মাত্রা। দেখা গেল ঠিক এ সময়েই পৃথিবীর তাপমাত্রা থেকেছে অস্বাভাবিক রকম কম; এ সময়ে অনেক জায়গায় ফসল নষ্ট হয়, হিমবাহের এলাকা বেড়ে যায়, ইউরোপের নদীগুলো শীতে জমে যেতে থাকে। ১৬৮৪ সালে বিলেতের টেমস নদী পুরো দু'মাস বরফ-জমা থাকে, তখন তার ওপর বরফের মেলা বসে। এই সময়টার নাম দেয়া হয়েছে 'খুদে বরফের যুগ'। এই অস্বাভাবিক শীতের সঙ্গে সৌরকলঙ্ক কম থাকার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তোলে।

আজকাল বিজ্ঞানীরা মহাকাশে বিশেষ ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ বসিয়ে সেখান থেকে সূর্যের বিকিরণ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করছেন। তা থেকে দেখা গেছে ১৯৮০ সালের পর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যখন সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন মাত্রার দিকে যেতে থাকে তখন সূর্যের উজ্জ্বলতা যেন তত কমে যায়; ১৯৮৬-র পর যখন সৌর-কলঙ্কের সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উজ্জ্বলতাও বেড়ে ওঠে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে সূর্যের উজ্জ্বলতা ০·১ শতাংশ কমে গিয়েছিল; এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০·১ ডিগ্রি সে. কমে যেতে পারে। অবশ্য গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড জমে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যদি কোন কারণে কয়েকটি সৌরকলঙ্কের চক্রে সূর্যের উজ্জ্বলতা ০·৫ শতাংশ কমে যায়, তাহলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০·৫ ডিগ্রি সে. নেমে যেতে পারে; এ অবস্থায় আরেকটা খুদে বরফের যুগ এসে পড়া বিচিত্র নয়। এজন্যই সূর্যের ওপর নজর রাখাটা আরো বেশি জরুরি।

সূর্যের বিকিরণে আজ যেসব পরিবর্তন ঘটছে তা খুব সামান্য। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামী বেশ কয়েক কোটি বছরের মধ্যে সূর্যের দেহে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে না; তবে দূর ভবিষ্যতে যে বড় রকম পরিবর্তন ঘটবে সে একরকম নিশ্চিত। সূর্যের বয়স বাড়ছে; তার ফলে আগামী কয়েকশ' কোটি বছরে ক্রমে ক্রমে তার উজ্জ্বলতা হবে দ্বিগুণ আর আয়তন হবে আজকের চেয়ে ৫০ শতাংশের মতো বেশি। তার অনেক আগেই তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের সব বরফ গলে যাবে, বেশিরভাগ ফসলী জমি হয়ে যাবে মরুভূমি; পৃথিবী মানুষ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। আজ থেকে ৫০০ কোটি বছরে সূর্যের কেন্দ্রের সব

হাইড্রোজেন জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাতে ভেতরকার কেন্দ্রটা চুপসে যাবে আর বাইরের স্তরের হাইড্রোজেনে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হবে। তখন সূর্যের মৃত্যুর প্রক্রিয়া চালু হবে – সূর্য বেরিয়ে আসবে তারাদের মূলধারা থেকে।

এসব পরিবর্তনের ফলে সূর্য থেকে আগের চেয়ে বেশি তেজ বেরোতে থাকবে আর ওপরকার স্তরের গ্যাসগুলো ঠেলে উঠবে বাইরের দিকে। সূর্যের আয়তন যত বাড়তে থাকবে তত তার ওপরটা ঠাণ্ডা আর লাল হয়ে উঠবে। সূর্য তখন হয়ে দাঁড়াবে স্বাতীর মতো একটি লাল দানব; আজকের চেয়ে বহুগুণে বড় হয়ে তার বেড় বুধের কক্ষপথ ছাড়িয়ে যাবে আর উজ্জ্বলতা বেড়ে উঠবে বহু শতগুণ। লালদানব সূর্যের বাইরের দিকের স্তরটা হবে অতি হালকা — এমনকি পৃথিবীর হাওয়ার চেয়েও হালকা। তার ভেতরে ৫ কোটি কিলোমিটার নেমে গেলে তবে পাওয়া যাবে সূর্যের ভেতরকার সেই ৩০,০০০ কিলোমিটার ব্যাসের সাদা গনগনে হিলিয়াম কেন্দ্র। সেটা আয়তনে হবে ইউরেনাস বা নেপচুনের চেয়েও ছোট; আর এমন ঘন যে এক ঘন সিন্টিমিটার বস্তুর ভর দাঁড়ায় বহু টন। ভেতরের কেন্দ্র লালদানবের তুলনায় আয়তনে অতি ছোট হলেও মূল সূর্যের ভরের অর্ধেকই থাকবে সেখানে। এই লালদানবের তাতে পৃথিবীর সব সমুদ্র আর জলাশয়ের পানি বাষ্প হয়ে যাবে; সব পাথর গনগনে লাল হয়ে উঠবে।

এভাবে ত্রিশ-চল্লিশ লাখ বছর কেটে যাবার পর ভেতরের হিলিয়াম কেন্দ্রটি সংকুচিত হতে হতে তার উষ্ণতা উঠবে ১০ কোটি ডিগ্রি সে.; তখন তার হিলিয়ামে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে — হিলিয়াম থেকে তৈরি হবে কার্বন আর অক্সিজেন। কার্বনের ছাই জমা হতে থাকবে কেন্দ্রে, কেন্দ্র আরো সংকুচিত হতে থাকবে, আর হিলিয়াম জ্বলা ততই বাইরের দিকে এগোতে থাকবে। লালদানব তখন আরো ফেঁপে উঠে গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে।

এর মধ্যে সূর্য এমন বড় হয়ে যাবে যে লাখ খানেক বছর পর তার বাইরের দিকের স্তর ছিটকে উঠবে ওপর দিকে। বিশাল এক ধোঁয়ার বলয় গ্রাস করবে সমগ্র সৌরজগতকে। এ ধরনের গ্যাসপুঞ্জকে বলা হয় গ্রহ-নীহারিকা (planetary nebula)। আমাদের গ্যালাক্সিতে হাজারখানেক তারার চারপাশে এ ধরনের নীহারিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধোঁয়ার বলয়ের মাঝখানে থাকে একটি অতি ছোট মিনমিনে তারা — মরা লালদানবের অবশেষ। বহু লক্ষ বছর পর এই কেন্দ্রটি আরো সংকুচিত হয়ে পরিণত হয় একটি সাদা বামনে; গনগনে সাদা অথচ অতি ছোট এই তারা। আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি বছরই মোটামুটি একটা করে এমনি সাদা বামন তৈরি হচ্ছে। সূর্য যখন সাদা বামন হবে তখন তার ভর হবে এখনকার প্রায় অর্ধেক কিন্তু আয়তন হবে পৃথিবীর মতো; বাকি ভর তার গা থেকে উবে যাবে মাঝপথেই।

সাদা বামনদের ভেতরে প্রচণ্ড চাপে পরমাণুগুলো কাছাকাছি এসে এমন ঘন হয়ে ওঠে যে সে ঘনত্ব হতে পারে পানির চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি; এমন ঘন জিনিসের কথা পৃথিবীতে বসে কল্পনা করাও শক্ত। এদের ভেতরে কোন পারমাণবিক বিক্রিয়া নেই, কাজেই কোন শক্তি সৃষ্টিও হয় না। বহু শত কোটি বছর পর তার তাপের পুঁজি শেষ হয়ে গেলে সাদা বামন চোখের আড়ালে চলে যাবে।

## আরো ভারি তারা

সূর্যের চেয়ে পাঁচ বা ছয় গুণ বেশি ভরের তারাদের পরিণতি হয় সূর্যের মতোই, তবে আরো কম সময়ে; তার কারণ আরো অনেক কিছুর মতোই তারাদের জীবনকাল নির্ভর করে তাদের ভরের ওপরে। সবচেয়ে ভারি তারাদের জীবনকাল হয় সবচেয়ে কম, তার কারণ বেশি তেজ বিকিরণ করতে গিয়ে তাদের বস্তুর পুঁজি তাড়াতাড়ি জ্বালাতে হয়। লুব্ধকের মতো যে তারার ভর সূর্যের দ্বিগুণ তার জীবনকাল সূর্যের দশ ভাগের একভাগ। তেমনি সবচেয়ে ভারি তারাদের জীবনকাল হয় মাত্র বিশ-ত্রিশ লাখ বছর।

ভারি তারারা বাঁচে কম দিন, আর তাদের মৃত্যু হয় বেশ ঘটা করে বিরাট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এরা প্রথমে পরিণত হয় অতিদানব তারায়; তার আয়তন সাধারণ দানবের চেয়ে খুব বেশি নয়, তবে উজ্জ্বলতা অনেক বেশি। সাধারণ তারারা যখন দানবে পরিণত হয় তখন তাদের ভেতরে পারমাণবিক বিক্রিয়া হিলিয়াম থেকে কার্বন তৈরির পর্যায় পেরিয়ে আর বেশি দূর এগোয় না; কিন্তু অতিদানবদের কেন্দ্র এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে পারমাণবিক বিক্রিয়া এর পরও চলতে থাকে। ক্রমেই আরো ভারি মৌল তৈরি হতে থাকে; অবশেষে সিলিকন থেকে লোহা তৈরি হয়ে জমে ওঠে, তারপর সে বিক্রিয়া থামে (তারার কেন্দ্রে প্রচণ্ড তাপে লোহা কঠিন থাকে না, গ্যাস হয়ে যায়)।

লোহার স্তরে যাবার পর আর পারমাণবিক বিক্রিয়া চলতে পারে না; শক্তি সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারাটি অকস্মাৎ প্রবলভাবে ভেতরের দিকে ধসে পড়ে আর তৈরি হয় এক অতিনবতারা। কয়েক সপ্তাহ ধরে সেই নবতারা আকাশে জ্বলতে থাকে দশ কোটি সূর্যের সমান আলো ছড়িয়ে; একটিমাত্র নবতারার আলো – তাই যেন একটা পুরো গ্যালাক্সির আলোর সমান।

# জন্ম-মৃত্যুর ভৈরব নৃত্য

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ভাল আর মন্দের একটা ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তেমনি ভাল-মন্দের প্রতিফলের জন্য স্বর্গ-নরক, বেহেশ্‌ত-দোজখের ধারণাও তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল সেই পুরাকাল থেকেই। স্বর্গ হল সকল সুখের আকর ; সেখানে থাকবে শীতল পানির কুলু কুলু নহর, মধু আর দুধের সরোবর, সবুজ বৃক্ষরাজি, সুমিষ্ট ফলের সমারোহ, পাখির কাকলি, মনোরম মলয় – এমনি নানা সুখের উপকরণ। আর নরক হল তার বিপরীত – আগুনের কুণ্ড, গা ঝলসে দেয়া প্রচণ্ড তাপের হলকা, গভীর অন্ধকার আর বিপুল ঝড়ের তাণ্ডব অর্থাৎ পাপীদের জন্য চরম শাস্তির নিশ্ছিদ্র আয়োজন। স্বর্গের ধারণার সঙ্গে পৃথিবীর কোন কোন এলাকার অবস্থার কিছুটা তুলনা করা যায়; পৃথিবীর চেয়ে বেশি সুখের জায়গা মহাকাশে কোথাও এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সবচেয়ে কঠিন নরকের অগ্নিকুণ্ড যদি কোথাও খুঁজে পেতে হয় তাহলে আমাদের পৃথিবীর বাইরেই তাকাতে হবে।

আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের বিশাল আগুনের কুণ্ড হল সূর্য। দানব গ্রহ বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৩১৮ গুণ ভারি; আবার সূর্য তার চেয়ে হাজারগুণেরও বেশি ভারি। সব মিলিয়ে সূর্য আমাদের পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড় আর ভারি ৩,৩৩,০০০ গুণ। আর সূর্য নামের এই বিশাল আগুনের কুণ্ডটি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জ্বলছে প্রচণ্ড তাপ ছড়িয়ে। সূর্যের গায়ের তাপমাত্রা ৫,৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস; তাতে সব ধাতুই বাষ্প হয়ে যায়। তার আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা বহু লক্ষ ডিগ্রি, ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। মহাকাশে সূর্যের মতো এমন আগুনের কুণ্ড যে কত আছে তার হিসেব করাও শক্ত। রাতের আকাশে আমরা যত তারা দেখি তার প্রতিটি এক একটি সূর্য। আর সারা পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্রের বালুতটে যত বালির কণা আছে মহাকাশে তারার সংখ্যা হবে তার চেয়ে ঢের বেশি।

## অসংখ্য সূর্যের মেলা

পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে যেমন আছে নানা জাত — তাদের কেউ মোটা কেউ সরু, কেউ অতি লম্বা আবার কেউ বেঁটেখাটো, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ, তেমনি তারাদের মধ্যেও আছে প্রচুর রকমফের। আবার মহাকাশে এত যে তারা সেগুলো সব যার যার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই, বিরাট বিরাট জোট বেঁধে আছে গ্যালাক্সি বা তারাপুঞ্জের আকারে। আমরা রাতের আকাশে উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো যে ছায়াপথ

দেখি সেটি আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সির একটা অংশ ; একে বলা যাক 'ছায়াপথ গ্যালাক্সি'। বিজ্ঞানীরা এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির তারাদের যে হিসেব করেছেন তাতে দেখা যায় এতে তারার সংখ্যা হবে খুব কম করেও ১০,০০০ কোটি ; আজ অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন সংখ্যাটা আরো বেশি — ৪০,০০০ কোটির কাছাকাছি (৪ X ১০$^{১১}$)। আবার আমাদের গ্যালাক্সিই মহাকাশে একমাত্র গ্যালাক্সি নয়, মহাবিশ্বে ছড়ানো আছে এধরনের অসংখ্য গ্যালাক্সি; তাদের সংখ্যাও হবে মোটামুটি ১০,০০০ কোটি (১০$^{১১}$)।

আমাদের গ্যালাক্সি হল একটা প্যাঁচানো গ্যালাক্সি। আবার কিছু গ্যালাক্সি আছে ডিমের মতো লম্বাটে বা উপবৃত্তের আকারের ; আর কিছু গ্যালাক্সি আছে এলোমেলো খাপছাড়া গড়নের। আমাদের গ্যালাক্সির আকার বোঝাবার জন্য একজন বিজ্ঞানী একটা উপমা দিয়েছেন। ধরা যাক দুটি লংপ্লেয়িং রেকর্ডকে আঠা দিয়ে গায়ে গায়ে জুড়ে দেয়া হল; তারপর দু'পাশে মাঝখানে দুটি পোচ করা ডিম বসানো হল। তাহলে সবটার যে আকার হবে গ্যালাক্সির চেহারা অনেকটা সে ধরনের। অর্থাৎ কুমোরের চাকতির মতো একটা গোল চাক্তি, তার মাঝখানটা কিছু পুরু, কিনারার দিকটা বেশ পাতলা; আর সেটা অনেকটা সাইক্লোনের ঘূর্ণির মতো প্যাঁচানো। আমাদের গ্যালাক্সি চওড়ায় প্রায় এক লাখ আলোক-বছর আর তার মাঝখানটা পুরু প্রায় ১০,০০০ আলোক-বছর। সূর্য রয়েছে গ্যালাক্সির একটি শাখায়, কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বছর দূরে; এ এলাকায় গ্যালাক্সি পুরু মাত্র ৩,০০০ আলোক-বছর। সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরপাক খায় মোটামুটি পঁচিশ কোটি বছরে একবার; এই ঘোরাপথে একই সমতল থেকে তার ওপর-নিচে সামান্য ওঠানামা ঘটে।

উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি যেমন হতে পারে মাত্র কয়েক হাজার তারা নিয়ে বেশ ছোটখাট আকারের তেমনি আবার হয় এমন বিশাল যাতে থাকতে পারে ৫০ লক্ষ কোটি নক্ষত্র। প্যাঁচানো গ্যালাক্সির ব্যাস সাধারণত আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির চেয়ে দশগুণের বেশি বড় বা চারগুণের বেশি ছোট হয় না। এমনি প্যাঁচানো গ্যালাক্সির চেয়ে উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি সংখ্যায় অনেক বেশি; তবে তাদের গড় আকার যেহেতু ছোট তাই আকাশে প্যাঁচানো গ্যালাক্সিই বেশি আছে বলে মনে হয়। এলোমেলো চেহারার গ্যালাক্সির সংখ্যা হয়তো আরো বেশি তবে তাদের দেখতে পাওয়া সহজ নয়। গ্যালাক্সির ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে বয়ে যায় ঘাত তরঙ্গ; তাতেই নীহারিকার ধুলো আর গ্যাসের পাঁজা ঘনীভূত হয়ে নতুন নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির পালা শুরু হয়। এমনি নতুন নক্ষত্রের আলোতে তার চারপাশের নীহারিকা আলোকিত হয়ে ওঠে — যেমন এখন ঘটছে আমাদের চোখের সামনে কালপুরুষ নীহারিকায়। সবচেয়ে বড় নতুন নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতা হয় সূর্যের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি, সেগুলো নীলচে আলো দেয় আর টেকে মাত্র বিশ-ত্রিশ লাখ

বছর। এমনি সব নতুন নক্ষত্র গ্যালাক্সির যে শাখায় থাকে তাতেও দেখা দেয় নীলচে আভা।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৃষ্টির গোড়ার দিকে যখন প্রথম সব গ্যালাক্সি তৈরি হচ্ছিল তখন তার সবগুলোই ছিল প্যাঁচানো গ্যালাক্সি। তখন মহাবিশ্বের আকার ছিল আজকের তুলনায় মাত্র এক শতাংশের মতো, অথচ বস্তুর পরিমাণ ছিল আজকের মতোই। কাজেই কাছাকাছি থাকার কারণে গ্যালাক্সিদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগতে শুরু করে। দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে ধাক্কা লাগলে তাদের সে ঠেলাঠেলি বহু কোটি বছর ধরে চলতে থাকে; আর তার ফলে দুটি প্যাঁচানো গ্যালাক্সির তারার দঙ্গল একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি তৈরি হয়।

## তারার রাজ্যে সূর্য

আমাদের গ্যালাক্সিতে যে তারার রাজ্য তাতে আকার বা উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে সূর্য একেবারে হেলাফেলার নয় ; সবচেয়ে বড় আর উজ্জ্বল পাঁচ শতাংশ তারার মধ্যেই পড়ে আমাদের সূর্য। সূর্যের আরেক বৈশিষ্ট্য হল তার কোনো জুটি তারা নেই। গ্যালাক্সিতে আমাদের কাছাকাছি আর যেসব তারা দেখা যায় তার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশই জুটি তারা অর্থাৎ দুটি, তিনটি বা তার বেশি তারা একসঙ্গে জোট বেঁধে তাকে। এসব জুটির বেশির ভাগই যুগল তারা অর্থাৎ দুটি তারা মাঝামাঝি কোনো বিন্দুর চারপাশে ঘুরপাক খায়; কখনো বা তারার জুটি তৈরি হয় তিনটি বা তারও বেশি তারা মিলে। তারারা আমাদের কাছ থেকে কত দূরে তার হিসেব করার জন্য আলোক-বছরের মাপ ব্যবহার করা হয়। এমনিতে শুনতে মনে হয় আলোক-বছর হল সময়ের হিসেব, কিন্তু আসলে হিসেবটা দূরত্বের — এক বছরে আলো যতটা পথ ছুটতে পারে সেই দূরত্ব; সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে এক আলোক-বছর তার চাইতে প্রায় ৬৩,০০০ গুণ বড়।

জুটি তারার একটি দৃষ্টান্ত হল আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি তারা জুটি আলফা সেন্টরি। এটি তিন তারার একটি জোট আর রয়েছে আমাদের কাছ থেকে ৪·৩ আলোক-বছর দূরে। অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে চার বছরের বেশি সময় লাগে। এই তিনটি তারাকে বলা হয় আলফা সেন্টরি এ, বি ও সি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি আলফা সেন্টরি-এ সূর্যের চেয়ে সামান্য ভারি আর প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল। বি তার চারপাশে ঘোরে ইউরেনাস সূর্যের চারপাশে যত দূর দিয়ে ঘোরে প্রায় ততটা দূর দিয়ে। এটির ভর সূর্যের ভরের প্রায় ৯০ শতাংশ তবে উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার মাত্র ৪০ শতাংশ। আলফা সেন্টরি সি-কে অনেক সময় প্রক্সিমা সেন্টরিও বলা হয়; তার কারণ পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি ০.১ আলোক-বছর কম, তাই এটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি তারা। এটি বিশাল এক কক্ষপথে অন্য দুটি তারাকে ঘুরপাক খায় দশ লক্ষ বছরে একবার।

আলফা সেণ্টরি এ আর বি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারপাশে ঘোরে আমাদের ৮০ বছরে একবার। এরা যখন সবচেয়ে কাছাকাছি আসে তখন তাদের দূরত্ব হয় প্রায় ১৬০ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব তার প্রায় দশগুণ; আর যখন তারা সবচেয়ে দূরে দূরে থাকে তখন তাদের দূরত্ব হয় ৫৩০ কোটি কিলোমিটার। এই জুটির তৃতীয় তারা প্রক্সিমার আলো অন্য দুটির তুলনায় অতি মিটমিটে আর এটি আছে তাদের থেকে সূর্য-পৃথিবী দূরত্বের তুলনায় ১২,০০০ গুণ বেশি দূরে। আলফা সেণ্টরির মতো তারা জুটির পাশে কি পৃথিবীর মতো গ্রহের উদ্ভব হতে পারে? বিজ্ঞানীরা বলছেন সে সম্ভাবনা খুব কম। কেননা, জুটির নানা আকারের তারার টানাপাড়েনে সেখানে কোনো গ্রহের পক্ষে টিকে থাকা শক্ত হবে। শুধু যেসব যুগলতারার মধ্যে দূরত্ব অন্তত ১০ জ্যোতির্বিদ্যা একক (অর্থাৎ সূর্য-পৃথিবী দূরত্বের সমান) তাদেরই গ্রহজগৎ থাকা সম্ভব। অবশ্য সূর্যের মতো একক তারাদেরই গ্রহজগৎ থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

আমাদের কাছাকাছি একটি গ্যালাক্সি শরৎ-হেমন্তের মেঘহীন আকাশে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়; এটি হল অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি। একে দেখতে ছোট একটা লম্বাটে থালার মতো, কিন্তু আসলে এটাও আমাদের গ্যালাক্সির মতোই প্যাঁচানো গ্যালাক্সি; আর এর আয়তন ছায়াপথ গ্যালাক্সির চেয়েও বড়। এর বুকে আছে সম্ভবত এক লক্ষ কোটি ($১০^{১১}$) তারা অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সির চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বেশি। এই বিপুল তারাপুঞ্জের আলো আমাদের কাছে আসতে আসতে এমন মিনমিনে হয়ে যায় তার কারণ সে আলো আসছে ২৩ লক্ষ আলোক-বছর দূরের পথ পেরিয়ে। পৃথিবী থেকে দূরবীনে দেখা যায় আরো দূরের সব গ্যালাক্সি ; বিজ্ঞানীরা প্রায় হাজার কোটি আলোক-বছর দূরের গ্যালাক্সির কথাও জেনেছেন এভাবে। তার ওপারেও গ্যালাক্সিরা ছড়ানো আছে মহাবিশ্বের শেষ সীমানা, ১,৫০০ কোটি আলোক-বছর দূর পর্যন্ত।

তারাদের মধ্যে আছে নানা জাত — তাদের নানা আকার, নানা প্রকৃতি। আবার মানুষের যেমন আছে জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, মৃত্যু, তারাদেরও আছে তেমনি। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিতেও ক্রমাগত অসংখ্য তারার জন্ম, পরিণতি আর মৃত্যু ঘটছে। কোন তারার হয়তো জন্ম হয়েছে হাজার কোটি বছর আগে, সেটির আয়ু থাকতে পারে আরো হাজার কোটি বছর। লাল দানব তারাদের হাইড্রোজেন পুঁজি ধীরে ধীরে কম আঁচে পোড়ে, তাই সে জ্বালানি বহুদিন টেকে। যেমন প্রক্সিমা সেণ্টরির মতো তারা আজকের হারে আলো দিতে থাকলে টেকার কথা আরো প্রায় ২০,০০০ কোটি বছর অর্থাৎ মহাবিশ্বের আয়ুর চেয়ে বহুগুণে বেশি দিন। আবার অন্যদিকে বাণরাজা বা পুচ্ছ (Deneb)-এর মতো নীল দানবতারারা তাদের পুঁজি জ্বালিয়ে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি, তাই মরেও

অল্প বয়সেই। এসব তারা সূর্যের চেয়ে ৫০,০০০ গুণ উজ্জ্বল আলো বিলিয়ে টেকে হয়তো বিশ-ত্রিশ লাখ বছর, তারপরই নিঃশেষ হয়ে হারিয়ে যায়। তাই এসব তারাকে এক হাজার আলোক-বছর দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, অথচ সূর্যের মতো তারাকে মাত্র পঞ্চাশ আলোক-বছর দূরেও খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়।

আয়তন আর আয়ু যাই হোক, তারাদের মূল শক্তির উৎস একই — তাদের বুকের ভেতর বস্তুর পুঁজি ভাঙ্গিয়ে পরমাণু-শক্তির সৃষ্টি। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, কী করেই বা এমন বিপুল শক্তিধর তারাদের জন্ম হয়, আবার ক্রমে ক্রমে সে শক্তির পুঁজি হারিয়ে একদিন কেমন করে তারা নিঃশেষ হয়ে যায়? আমাদের সূর্যের জন্ম-মৃত্যুর আলোচনা করলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে।

## সূর্যের জন্ম-মৃত্যু

ছায়াপথ গ্যালাক্সির ফাঁকে ফাঁকে আছে বিশাল সব গ্যাস আর ধুলোর পাঁজা, অন্ধকার নীহারিকা — হয়তো দু'একশ আলোক-বছর এলাকা জুড়ে ছড়ানো। ক্রমে ক্রমে এক সময় এই গ্যাসের পাঁজা জমাট বেঁধে ওঠে, তার নানা এলাকায় ঘন হয়ে ওঠে গ্যাস আর ধুলোর দঙ্গল; সেগুলো থেকেই জন্ম হয় তারা শিশুদের। ছায়াপথ গ্যালাক্সির এক প্যাঁচানো শাখার ভেতরে সূর্যেরও জন্ম হয়েছে এভাবেই, আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। হয়তো পৃথিবীর ভরের চেয়ে বহু লক্ষগুণ ভারি এক ধুলো আর গ্যাসের পাঁজা কয়েক লক্ষ বছর ধরে ঘন হয়ে জড়ো হল আজকের প্লুটোর কক্ষপথের চেয়েও বহুগুণে বড় এক এলাকায়। আর এই পাঁজা যত কাছাকাছি আসে তত পরস্পর আকর্ষণের টানে তার ঘনত্ব বেড়ে ওঠে, আর ভেতরের প্রচণ্ড চাপে বিপুলভাবে বাড়ে সেখানকার তাপমাত্রা। অবশেষে এক সময় ভেতরের বস্তু এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সেখানে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, আর জন্ম হয় সূর্যের।

এর মধ্যে ধুলোর পাঁজা আর গ্যাসীয় বস্তু চাক্তির মতো ঘুরছে ভেতরের সূর্যকে কেন্দ্র করে। প্রথম দিকে এই ঘোরার বেগ থাকে কম; বস্তুপুঞ্জ যত ঘন হয়ে ওঠে তত বাড়ে তার ঘোরার বেগ। আর সেই নীহারিকার মাঝে মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে দলা পাকানো বস্তুর পিণ্ড। ভেতরের উত্তপ্ত সূর্য এদিকে এই গ্যাসীয় পাঁজাকে তাতিয়ে তুলছে; তার হালকা অণু-পরমাণুগুলো ছিটকে যাচ্ছে দূরে, আর ভারি অণু-পরমাণুগুলো থেকে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। বহু লক্ষ বছর ধরে এসব বস্তু জমাট বাঁধতে বাঁধতে সৃষ্টি করেছে সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু আর ধূমকেতুদের। এসব পিণ্ডের উপাদান অনেকটা নির্ভর করে এরা সূর্য থেকে কতটা দূরে তার ওপরে। কাছাকাছি পিণ্ডগুলোতে জড়ো হয়েছে প্রধানত ভারি ধাতু, পাথর এমনি সব উপাদান (যেমন বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এসব গ্রহে); এর পরের দিকে ধাতু-পাথরের সঙ্গে জুটেছে কার্বন-যৌগযুক্ত বস্তু (যেমন রয়েছে গ্রহাণুতে);

তার পরে যোগ হল কার্বন-নাইট্রোজেন-পানির যৌগ; তারও পরে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, অ্যামোনিয়া এসব গ্যাসীয় বস্তু (যেমন আছে বৃহস্পতি ও তার পরের গ্রহ-উপগ্রহে)।

অন্য তারাদের যেমন তেমনি সূর্যেরও কেন্দ্রে সর্বক্ষণ জ্বলছে যেন বিশাল এক পারমাণবিক চুল্লি। তাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৬৫·৫ কোটি টন হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে ৬৫·০ কোটি টন হিলিয়াম। মাঝখান থেকে যে ৫০ লক্ষ টন বস্তু হারিয়ে যাচ্ছে তা পরিণত হচ্ছে ৪ লক্ষ কোটি কোটি কোটি ($৪ \times ১০^{২৬}$) ওয়াট শক্তিতে। এই শক্তি ধীরে ধীরে বহু বছর ধরে কেন্দ্র থেকে ভেসে ওঠে ওপরের দিকে – তারপর ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। সূর্যের এই শক্তি বিকিরণ একই ধারায় চলছে বহু লক্ষ বছর ধরে; তাতেই পৃথিবীতে প্রাণের ধারা চালু রয়েছে। এই বিকিরণে সামান্য হেরফের ঘটলেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঘটবে বিরাট রকম পরিবর্তন।

সূর্যের শক্তি বিকিরণে বহুকাল ধরে কোন হেরফের ঘটেনি বলেই যে চিরকাল এমন থাকবে তা নয়। আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ কোটি বছরের মধ্যে সূর্যের আয়ু নিঃশেষ হয়ে আসবার কথা; অর্থাৎ ততদিনে তার তেজ বিকিরণে দেখা দেবে বড় ধরনের পরিবর্তন। সমস্যা ঘটবে যখন সূর্যের কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বলে শেষ হয়ে আসবে। অবশ্য কেন্দ্রের চারপাশের হাইড্রোজেন থাকবে; তাই তখন পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে কেন্দ্রের চারদিকের একটা খোলসে। হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রের আয়তন চুপসে যাবে আর তাতে চারপাশের খোলসে তাপমাত্রা আরো বেড়ে উঠবে; ফলে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলবে আরো জোরেশোরে। সূর্য তখন মিইয়ে যাবার বদলে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর ওপর যে সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রভাব বোঝা যাবে তা নয়। মিসরে পিরামিড তৈরির সময়ে যদি প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে থাকে তাহলে হয়তো এখন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে সামান্য পরিবর্তন ধরা যাবে; তাছাড়া আর কিছু টের পাওয়া যাবে না। হয়তো প্রতি বছর তাপমাত্রা বাড়বে এক ডিগ্রির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কয়েক হাজার বছরে আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সূর্য ক্রমেই কেবল ফেঁপে ফুলে উঠতে থাকবে; তার ব্যাস দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ হয়ে উঠবে। এক সময়ে কেন্দ্রটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ভেতরের হিলিয়ামকে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করবে; হিলিয়াম পরমাণু যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করবে কার্বন। তখন সূর্য আরো বেশি ফুলে উঠবে। বহু লক্ষ বছর ধরে এভাবে ফুল উঠে সূর্যের সীমানা এগিয়ে যাবে সৌরজগতের ভেতর দিকের গ্রহদের কাছাকাছি। তীব্র তাপে বুধের ওপরকার ধাতু-পাথর সব বাষ্প হয়ে যাবে। পৃথিবীর ওপর দিয়ে বয়ে যাবে আগুনের হলকা; ফুটন্ত পানির চেয়েও বেশি তাপে সব ধরনের জীবের মৃত্যু ঘটবে। সাগর-মহাসাগরের পানি বাষ্প হয়ে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাবে; সেই সঙ্গে উত্তপ্ত

পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির প্রবল উদ্গার ঢেকে দেবে আকাশ। যেন নেমে আসবে অনন্তকালের রোজ কেয়ামত।

বহু লক্ষ বছর ধরে এমনি ফেঁপে উঠে সূর্য হয়ে দাঁড়াবে একটি পুরোদস্তুর লাল দানবতারা; এখনকার চেয়ে প্রায় একশগুণ চওড়া আর দু'হাজার গুণ উজ্জ্বল টকটকে লাল সূর্য জুড়ে থাকবে পৃথিবীর সারাটা আকাশ। কিন্তু এভাবেও চিরদিন চলবে না। প্রায় দশ কোটি বছর পর সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানি একদিন পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন দারুণ চুপসে গিয়ে সূর্য হয়ে দাঁড়াবে একটা অতি ঘন সাদা বামনতারা। সেই অতিবৃদ্ধ তারায় আর পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটবে না, তবে চুপসে পড়ার ঘনীভূত শক্তিতে সে তখন সাদা আলো দিতে থাকবে। এই সাদা বামনের ভর হবে সূর্যের এখনকার ভরের মোটামুটি অর্ধেক অথচ আয়তন হবে প্রায় পৃথিবীর সমান; এর গায়ের এক চা-চামচ পরিমাণ বস্তুর ওজন দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ টন। এই বৃদ্ধ সূর্য মহাকাশে ঘুরতে থাকবে তার আপন পথে। এভাবেই চলবে বহু শত কোটি বছর; তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে একদিন তার সকল আলো নিভে যাবে। তখন সেই মরা সূর্য হয়ে দাঁড়াবে একটা কালো বামন তারা – তার আয়তন পৃথিবীর মতো তবে ভর পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দু'লক্ষ গুণ বেশি। কিন্তু সেই কালো বামন তারাকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

## দানবতারার মৃত্যু যন্ত্রণা

সূর্য মহাকাশের মাঝারি তারাদের চেয়ে কিছুটা বড়। তার অর্থ সূর্যের চেয়ে ছোট তারা আছে অনেক, তবে তার চেয়ে বড় তারাও একেবারে কম নেই। সূর্যের চেয়ে দশ বা পনেরগুণ ব্যাসের তারাও আছে; তাদের ভর সূর্যের তুলনায় ১৫ থেকে ৩০ গুণ বেশি আর উজ্জ্বলতা বেশি বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ গুণ। এসব তারার মৃত্যু আসে আকস্মিকভাবে, অতি কম সময়ের মধ্যে। মোটামুটি পঞ্চাশ বছরে একটি দানবতারার মৃত্যু ঘটে প্রচণ্ড অতিনবতারা (supernova) বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে; তাতে তার বস্তু চারদিকে ছত্রখান হয়ে ছিটকে ওঠে। সেসব বিস্ফোরণের বেশির ভাগই গ্যালাক্সির ধুলো আর গ্যাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে, তাই পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কয়েকশ বছর পর পর আকাশে আকস্মিক এমন চোখ-ধাঁধানো অতিনবতারা দেখা দেয় যা দিনের আলোতেও পৃথিবী থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

এসব বিস্ফোরণে যে আগুনের কুণ্ড সৃষ্টি হয় তার তাপমাত্রা সূর্যের গায়ের তাপমাত্রার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি। তবে সব তারাই যে অতিনবতারা সৃষ্টি করে তা নয়; শুধু যেসব তারার ভর সূর্যের চেয়ে ছয় গুণের ওপরে তারাই মরার আগে এমন চমক লাগানো আলোর ফুলঝুরি ছিটিয়ে অতিনবতারা হয়ে ওঠে। যে কোন তারার বেলাতেই দুটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে; একটা হল কেন্দ্রের দিকে

মাধ্যাকর্ষণের টান, আরেকটা তার শক্তি প্রবাহের বাইরের দিকে ঠেলে ওঠার চাপ। বিশাল তারাদের বেলায় প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের কারণে কেন্দ্রের কাছে হাইড্রোজেন থাকে ঘনীভূত হয়ে; তাতে সেখানে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলতে থাকে সূর্যের চেয়ে বেশি দ্রুত বেগে। সেজন্য এসব তারা আকারে যেমন বড় হয় তেমনি বেশি উজ্জ্বলও হয়। মাত্র বিশ-ত্রিশ লাখ বছরের মধ্যেই এদের কেন্দ্রের হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গিয়ে সেখানে হিলিয়াম জমে ওঠে; মাধ্যাকর্ষণের চাপে ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে তখন হিলিয়ামও জ্বলতে শুরু করে। এতে তারার আয়তন বেড়ে উঠে সেটি পরিণত হয় এক বিশাল লাল দানবতারায়।

এই দানবতারার তাপমাত্রা বাড়া তখনও থামে না। তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়তনও বাড়তে বাড়তে আমাদের বৃহস্পতির কক্ষপথের সমান এলাকা ছাড়িয়ে যায়। তারার ভেতরে তৈরি হতে থাকে অপেক্ষাকৃত ভারি মৌল কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ম্যাগনেসিয়াম; এসব জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে তৈরি হয় লোহা। লোহা যেন এ ধরনের তাপপারমাণবিক বিক্রিয়ার ছাই, জ্বালানি হিসেবে তা আর কাজে লাগে না। তখন তারার বুকে শক্তি সৃষ্টি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টানটাই তখন প্রধান হয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গে বেজে ওঠে দানব তারার মৃত্যু ঘণ্টা। তারার কেন্দ্রে ধস নেমে সেখানে সব বস্তু আকস্মিক চুপসে যেতে শুরু করে, আর বাইরের স্তরের বস্তু কয়েকশ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় জ্বলতে জ্বলতে বিপুল বিস্ফোরণে ছত্রখান হয়ে চারদিকে ছিটকে ওঠে। একেই বলা হয় অতিনবতারার বিস্ফোরণ আর তার সে চোখ-ধাঁধানো আলো বহু লক্ষ আলোক-বছর দূর থেকেও দেখতে পাওয়া যায়।

কখনো কখনো একটি দানবতারা যখন অতিনবতারায় পরিণত হয় তখন এত তেজ বিকিরণ করে যা হাজার কোটি সাধারণ তারার সমান। দূর থেকে এই মৃত্যু দৃশ্য দেখায় যেন আকাশে যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে হঠাৎ দপ করে এক অতি উজ্জ্বল নতুন তারার জন্ম হল। কয়েক বছরের মধ্যে অতিনবতারার আলো স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু আকাশে এর প্রভাব টের পাওয়া যায় বহু শতাব্দী ধরে। বিস্ফোরণের প্রবল ঘাত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সারা মহাকাশ জুড়ে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এমনি অতিনবতারার ঘাত তরঙ্গের চাপ থেকেই মহাকাশে ছড়ানো ধুলো আর গ্যাসের পুঞ্জে তারা ও তাদের চারপাশে গ্রহজগৎ সৃষ্টির প্রথম সূচনা ঘটে।

দানবতারা থেকে এমনি অতিনবতারার বিকাশ আর বিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই এ বিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে অপেক্ষাকৃত ভারি মৌল আর সেসব স্থান পেয়েছে তারাদের বুকে। লোহার চেয়ে ভারি সব মৌল অতিনবতারার বিস্ফোরণের ফলেই সৃষ্টি হয়। এমনি করেই সুদূর অতীতে কোন দানব তারার বুকে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুষমা ভরা পৃথিবীর উপাদান – এমন কি আমাদের দেহের উপাদান নানা ভারি

মৌল। অতিনবতারা না থাকলে এই মহাবিশ্বে কার্বনের চেয়ে ভারি কোন মৌলের দেখা পাওয়া শক্ত হত, আর তাহলে আমাদের পৃথিবীর চেহারা আজকের মতো হত না; আজকের মতো জীবজগতের জন্মও হত অসম্ভব ।

আমাদের গ্যালাক্সি সৃষ্টির পর থেকে তাতে লক্ষ লক্ষ অতিনবতারার বিস্ফোরণ ঘটেছে; আজকাল আকাশে এমন ঘটনা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে এদের দেখা পাওয়া যায় অন্য গ্যালাক্সিতে। দূরবীন আবিষ্কারের পর প্রথম যে অতিনবতারা দেখা দেয় সেটি আকাশে জ্বলে ওঠে ১৯৮৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয় তার দু'মাস পরে, আর খালি চোখে দেখা যায় ১৯৮৭-র শেষ পর্যন্ত । এটি আসলে ঘটেছিল 'বৃহৎ ম্যাজেলান' নামে আমাদের কাছাকাছি এক নীহারিকায়; সেটা দেখা যায় শুধু দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। নীহারিকাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে ১,৭০,০০০ আলোক-বছর দূরে; কাজেই বিস্ফোরণটা ঘটেছিল আজ থেকে এত বছর আগে। ১৬০৪ সালে আমাদের গ্যালাক্সিতে এক অতিনবতারা বিস্ফোরণ ঘটেছিল, কেপলার তাকে আকাশে দেখেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহের মতো উজ্জ্বল; সে ছিল আমাদের থেকে ২৫,০০০ আলোক-বছর দূরে। ১৫৭২ সালে তাইকো ব্রাহে দেখেছিলেন আরেক অতিনবতারা বিস্ফোরণ, এর ঔজ্জ্বল্য ছিল শুকতারার মতো আর দূরত্ব ছিল ১০,০০০ আলোক-বছর।

অবশ্য পুরাকালের বই-পুঁথি থেকে আরো পুরনো অতিনবতারার কথা জানা যায়। এমনি এক অতিনবতারা দেখা দিয়েছিল চীনদেশে ১০৫৪ সালে। এটি এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে দিনের আলোতে দেখা যায় ২৩ দিন ধরে আর রাতে খালি চোখে দেখা যায় ১৮ মাসের বেশি সময়। সে দিনের চীনা পণ্ডিতগণ আকাশের যে এলাকায় এই 'অতিথি তারা' দেখা দিয়েছিল বলে লিখে রেখে গেছেন সেখানে বৃষমণ্ডলে আজ আমরা দেখি বিশাল বড় এক নীহারিকা, তার নাম 'কর্কট নীহারিকা'। বিজ্ঞানীরা বলেন M1 (আঠার শতকে ফরাসি জ্যোতির্বিদ চার্লস মেসিয়ার-এর তৈরি শতাধিক নীহারিকার তালিকার প্রথম ভুক্তি)। এবড়ো থেবড়ো চেহারার এই নীহারিকা চওড়ায় তিন আলোক-বছর; মনে করা হয় এটি ঐ অতিনবতারারই ধ্বংসাবশেষ। এটি এখনও চারদিকে ছিটকে পড়ছে ঘণ্টায় ৫০ লক্ষ কিলোমিটার বেগে। আর এটি রয়েছে আমাদের থেকে ৬,৩০০ আলোক-বছর দূরে; অর্থাৎ চীনা জ্যোতির্বিদরা একে দেখতে পান বিস্ফোরণ ঘটার কয়েক হাজার বছর পর।

## ধসে পড়া বস্তু: নিউট্রন তারা

১৯৬৮ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কর্কট নীহারিকার বুকে আবিষ্কার করলেন এক আশ্চর্য বস্তু। মহাকাশে এমন বস্তুর মুখোমুখি বিজ্ঞানীরা এর আগে আর কখনো হন

নি। দেখা গেল সেখানে লুকিয়ে আছে একটা 'পালসার' (pulsar) বা স্পন্দমান খুদে নক্ষত্রবস্তু যা ঘুরপাক খাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে আর ঝলকে ঝলকে সার্চলাইটের মতো তীব্র তেজোরশ্মি ছিটিয়ে চলেছে। বস্তুটি আয়তনে একটা মাঝারি গোছের শহরের সমান অথচ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষগুণ ভারি। যে দানবতারার বিস্ফোরণ থেকে কর্কট নীহারিকার জন্ম তার ওপরকার বস্তুর প্রচণ্ড চাপে চুপসে যাওয়া অতিঘন কেন্দ্রটাই পরিণত হয়েছে এই পালসারে।

পালসারদের আরেক নাম হল নিউট্রন তারা। তার কারণ এদের কেন্দ্রে বিপুল চাপে সব পরমাণুর বাঁধন ভেঙ্গে পড়ে; প্রোটন আর ইলেকট্রন একাকার হয়ে পরিণত হয় নিউট্রনে। সাধারণ পরমাণুতে ধ্বনাত্মক প্রোটন আর ঋণাত্মক ইলেকট্রনের মধ্যে যে ফাঁক থাকে, এখানে তা উধাও; তাই বস্তু আশ্চর্যরকম ঘন হয়ে ওঠে। এভাবেই কর্কট নীহারিকার নিউট্রন তারার ষোল কিলোমিটারের মতো চওড়া গোলকের ওজন দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ পৃথিবীর সমান; তার চারপাশে রয়েছে এক অতি প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র আর তারাটি প্রচণ্ড শক্তিতে প্রতি সেকেণ্ডে ঘুরছে ত্রিশ বার করে।

আসলে সাদা বামনদের চেয়েও ঘন তারাবস্তু থাকতে পারে এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন ১৯৩০-এর দশকেই। সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর নামে একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেব কষে বলেছিলেন সাদা বামনদের ভর যদি একটা সীমার ওপরে চলে যায় তাহলে সেটা তার নিজের মাধ্যাকর্ষণের টানে নিজে থেকেই ধসে পড়ে আরো ছোট আর ঘন হয়ে যাবে; এই সীমাটা হল সূর্যের ভরের ১·৪৪ গুণ — আজো একে বলা হয় চন্দ্রশেখরের সীমা। শুধু কর্কট নীহারিকায় নয়, তার পরে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে আরো বহু নিউট্রন তারার হদিস পেয়েছেন। তার কোন কোনটি ঘুরপাক খাচ্ছে সেকেণ্ডে কয়েকশ বার করে। তাছাড়া এমন অনেক তারারও খোঁজ মিলেছে যেগুলো নিউট্রন তারা হবার পথে এগিয়ে চলেছে। সূর্যের চেয়ে বেশি ভরের একটি তারা হয়তো চুপসে গিয়ে হয়ে দাঁড়াবে ২০ কিলোমিটার চওড়া; তার এক চা-চামচ পরিমাণ বস্তুর ভর হয়তো হবে একশ' কোটি টন অর্থাৎ একটি দু'মাইল উঁচু পাহাড়ের সমান। পৃথিবীর ওপরকার কোন বস্তুর সঙ্গেই এমন বস্তুর তুলনা চলে না।

মহাকাশের বুকে এমনি আরো কত অভাবিত বিস্ময়কর রহস্যমালার সন্ধানে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান নিরন্তর এগিয়ে চলেছে।

# কৃষ্ণবিবরের অতল অন্ধকারে

আইজাক নিউটন মহাকর্ষের তত্ত্ব আবিষ্কার করার পর তিনশ' বছর কেটে গিয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে মহাকাশের নানা বস্তুর গতিবিধির অতি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষ যেন নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করল। নিউটনের পর এই তিনশ বছরে পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেমন আমূল বদলে গিয়েছে তেমনি আবার সেসব ধারণা কাজে লাগিয়ে মানুষ বিপুলভাবে বদলে দিয়েছে পৃথিবীর চেহারাকেও।

মহাকাশের বস্তুদের কক্ষপথ, ভর, ঘনত্ব, বেগ সবকিছুই নির্ভর করে মাধ্যাকর্ষণের ওপরে। ১৭৮৪ সালে জন মিচেল (John Michell) নামে এক ইংরেজ পাদ্রী ও শৌখিন জ্যোতির্বিদ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির শেষ সীমা মেপে দেখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিউটনের সমীকরণ ব্যবহার করে হিসেব করে দেখলেন কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে হলে তার বেগ হতে হবে অন্তত আলোর বেগের পঁচিশ হাজার ভাগের একভাগ। আলোর বেগ হল প্রতি সেকেণ্ড ১,৮৬,২৮২ মাইল (প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার); এই হিসেবটা তখনকার বিজ্ঞানীরাও মোটামুটিভাবে জানতেন। তিনি আরো হিসেব করে দেখলেন সূর্যের আকর্ষণের বাঁধন কেটে বেরিয়ে যেতে হলে কোন বস্তুর বেগ হওয়া চাই আরো বেশি — আলোর বেগের পাঁচশ ভাগের একভাগ।

এসব হিসেব দিয়ে জন মিচেল কেমব্রিজে পদার্থবিদ হেনরি ক্যাভেনডিশকে একটা চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে তিনি আরো একটু হিসেব যোগ করেছিলেন। তাতে তিনি বললেন, সূর্যের ভর যদি কোনভাবে পাঁচশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই নিষ্ক্রমণ বেগ হয়ে দাঁড়াবে আলোর বেগের সমান, অর্থাৎ "এমন কিছু থেকে যত আলো বেরোবে তা আবার মাধ্যাকর্ষণের টানে সেখানেই ফেরত যাবে।" অর্থাৎ সূর্যের চেয়ে অতিমাত্রায় ভারি এই নক্ষত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে সব দর্শকের কাছ থেকে। তাঁর এ হিসেব সেকালে নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দেড়শ বছর এ নিয়ে আর তেমন কিছু শোনা যায় নি। ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ঘোষণা করার পর জার্মান জ্যোতির্বিদ কার্ল শোয়ার্জচাইল্ড (Karl Schwarzschild) দেখলেন এই তত্ত্ব অনুসারে কোন নক্ষত্র যদি হয় অতিমাত্রায় ভারি আর ঘন তবে তা আপন মাধ্যাকর্ষণের টানেই চিড়ে-চেপটা হয়ে ধসে পড়বে। তখন সে বস্তুটিকে আর দেখা যাবে না, শুধু তার প্রবল মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রভাব থেকে যাবে। সূর্যের মতো একটা জ্যোতিষ্ক এভাবে ধসে পড়লে অদৃশ্য হবার জন্য তার সঙ্কটসীমা

হবে মাত্র তিন কিলোমিটার (দু'মাইল)। অর্থাৎ সূর্যের মতো বস্তু যদি ধসে পড়ে এই সীমার চেয়ে বেশি সঙ্কুচিত হয়ে যায় তবে সেটা মহাকাশে যেন এক কৃষ্ণবিবর (black hole) বা কালো গহ্বরে হারিয়ে যাবে, তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। এই সঙ্কটসীমার একটা বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে ঘটনা-দিগন্ত (event horizon)। এটাই হল কৃষ্ণবিবরের কিনারা; আর এই ঘটনা-দিগন্ত তার কেন্দ্র থেকে কতটা দূরে হবে সেটা সরাসরি নির্ভর করে যে উৎসবস্তু থেকে এই কৃষ্ণবিবরের জন্ম হয়েছে গোড়ায় তার ভর কত ছিল তার ওপরে।

## কৃষ্ণবিবরের উৎপত্তি

পৃথিবীর ভরের সমান একটি কৃষ্ণবিবরের ঘটনা-দিগন্ত হবে একটি ছোট টেনিস বলের মতো। তবে আমাদের পৃথিবীর এমন কি সূর্যেরও কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু সূর্যের চেয়ে অন্তত ১.৪৪ গুণ বা তার চেয়ে বেশি ভরের সাদা দানব তারারাই এমন অকল্পনীয় রকম ঘনীভূত হতে পারে যে তাতে নিউট্রন তারা সৃষ্টি হয়। এই হিসেবটা প্রথম দিয়েছিলেন সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর; তাই তাঁর নাম অনুসারে একে বলা হয় চন্দ্রশেখর সীমা। তারার ভর এর চেয়ে বেশি হলে ভেতরের চাপ এত কম হয় যে তা বাইরের বস্তুর বিপুল ভর বইতে পারে না; প্রবল ধসে সে তারা আরো সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তাতে সব পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটন মিলে মিশে একাকার হয়ে অতি ঘন নিউট্রনে পরিণত হয়। আবার যদি সাদা বামন তারার ভর সূর্যের ভরের চেয়ে চার গুণের বেশি হয় তাহলে নিউট্রন তারার স্তর পেরিয়ে সে তারার ধস চলতেই থাকে আর অবশেষে সেটা পরিণত হয় কৃষ্ণবিবরে। তাই সূর্যের চেয়ে অনেক বড় আকারের দানবতারারা সবাই যেন একদিন কৃষ্ণবিবর হবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

অতিনবতারার সৃষ্টি হয় যেমন বিপুল দানবতারার বিস্ফোরণের কুণ্ড থেকে, তেমনি কুণ্ড থেকেই জন্ম কৃষ্ণবিবরেরও। যে দানবতারার বিস্ফোরণে অতিনবতারার জন্ম তার ভর যখন মোটামুটি দশটা সূর্যের ভরের চেয়ে বেশি হয় তখন অবশেষ হিসেবে যে ধসে পড়া কেন্দ্রটি থাকে তার ভর হতে পারে চারটে সূর্যের চেয়ে বেশি। সে ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ বল অতি প্রবল হয়ে ওঠে; ধস আরো এগিয়ে চলে। শেষটায় এক সময়ে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়ে সে বস্তুটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়; থাকে শুধু তার প্রবল আকর্ষণের টান। দূর থেকে আকর্ষণটা টের পাওয়া যায় – যখন তারাটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল ঠিক তখনকার মতোই, কিন্তু যত কাছে যাওয়া যায় তত তার আকর্ষণের টান আরো প্রচণ্ডরকম তীব্র হয়ে ওঠে। ঘটনা-দিগন্ত পেরোলে সে টান এমন প্রবল হয় যে আলোও তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বেরোতে পারে না।

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী অধিকাংশ গ্যালাক্সির বুকেই অনেকগুলো করে কৃষ্ণবিবর থাকার কথা; কিন্তু আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে এযাবৎ তারার মতো ভারি মাত্র গোটা চারেক কৃষ্ণবিবরের খবর জানা গেছে। প্রথম যেটা আবিষ্কৃত হয় তার নাম সিগনাস এক্স-১; 'উহুরু' নামে প্রথম যে আন্তর্জাতিক এক্স-রে সন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ছোঁড়া হয় (নিরক্ষীয় কক্ষপথে থাকার জন্য একে কেনিয়ার উপকূল থেকে ছোঁড়া হয়, তাই এই নাম; সোয়াহিলি ভাষায় শব্দটার অর্থ স্বাধীনতা) তার সাহায্যে ১৯৭১ সালে হংসমণ্ডলে এটার খোঁজ পাওয়া যায়। পৃথিবী থেকে এর আগে এর হদিস পাওয়া যায় নি তার কারণ পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডলের আবরণ মহাকাশ থেকে আসা সব এক্স-রশ্মি শুষে নেয়। দেখা গেল পৃথিবী থেকে ১১,০০০ আলোক-বছর দূরে হংসমণ্ডলে একটা নীল দানবতারা আছে, তার কাছাকাছিই রয়েছে এই কৃষ্ণবিবরটি।

পৃথিবীর ওপরকার দূরবীনে বসানো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা গেল নীল দানবতারাটি ৫·৬ দিন পর পর পৃথিবীর কিছুটা কাছাকাছি আসে আবার দূরে সরে যায়; তাতে বোঝা গেল এটি কোন অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে জোট বাঁধা আর তার চারপাশে ৫·৬ দিনে একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই কক্ষপথ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন সেই অদৃশ্য বস্তুটি আমাদের সূর্যের চেয়ে মোটামুটি দশ গুণ ভারি। নিউট্রন তারা যেহেতু সূর্যের চেয়ে চারগুণের বেশি ভারি হতে পারে না কাজেই এটি কৃষ্ণবিবর হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

বিজ্ঞানীরা নীল দানবতারা থেকে সিগনাস এক্স-১ কৃষ্ণবিবরের দূরত্ব হিসেব করে দেখলেন এর দূরত্ব সূর্য-পৃথিবী দূরত্বের মোটামুটি এক-পঞ্চমাংশ। তাঁরা আর এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন; কৃষ্ণবিবরটি নীল দানবতারার গা থেকে প্রতিদিন ১০,০০০ কোটি টন বস্তু শুষে নিয়ে গিলে খাচ্ছে। এসব বস্তু যখন ঘুরপাক খেতে খেতে কৃষ্ণবিবরের গহ্বরের ভেতর ঢুকতে থাকে তখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে প্রায় ৫০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাতে যে এক্স-রশ্মির সৃষ্টি হয় তাই জ্যোতির্বিদদের প্রথম নজরে এসেছিল। এসব বস্তু ঘুরপাক খাবার সময় কৃষ্ণবিবরের নিরক্ষরেখা বরাবর একটি চ্যাপটা চাক্তির মতো তৈরি করে। তার নাম দেওয়া হয়েছে সংযুতি চাক্তি (accretion disc)। কৃষ্ণবিবরের মতো আরো যেসব অতিঘন বস্তু তাদের চারপাশ থেকে অন্য বস্তুকে টেনে নেবার ক্ষমতা রাখে — যেমন নিউট্রন তারা ও সাদাবামন — তাদেরও এমনি সংযুতি চাক্তি থাকে বলে মনে করা হয়।

আমাদের গ্যালাক্সিতে বা এর আশপাশে আরো বেশ ক'টি কৃষ্ণবিবরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। যেমন, এল.এম.সি.এক্স-৩ নামে সূর্যের চেয়ে ছয়গুণ ভরের একটি মূলধারার নীলতারা মনে হয় ১·৭ দিনে একবার করে ঘুরছে সূর্যের চেয়ে নয়গুণ ভরের একটি কৃষ্ণবিবরের চারপাশে; মনোসেরস বা একশৃঙ্গী মণ্ডলে এ

০৬২০-০০ নামে মোটামুটি সূর্যের সমান ভরের একটি তারা আট ঘণ্টায় ঘুরছে সূর্যের চেয়ে আটগুণ ভারি একটি কৃষ্ণবিবরকে কেন্দ্র করে; ভি ৪০৪ সিগনি নামে সূর্যের মতো ভরের একটি তারা ৬৫ দিনে ঘুরছে সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভারি একটি কৃষ্ণবিবরের চারদিকে। এর পর নিঃসন্দেহে এমনি আরো অনেক কৃষ্ণবিবরের কথা জানা যাবে।

## কাছে থেকে দেখা

কৃষ্ণবিবরের কথা জানাজানি হবার পর থেকে অনেকেরই মনে এ প্রশ্নটা দেখা দিচ্ছে; কাছে থেকে দেখলে তাদের কেমন দেখাবে? সিগনাস এক্স-১ কৃষ্ণবিবরের সংযুতি চাক্তি থেকে যে তীব্র এক্স-রশ্মির বিকিরণ হয় বলে জানা গেছে তাতে এমন কোন কৃষ্ণবিবরের খুব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা হবে একেবারেই বাতুলতা। তবে জুটি নক্ষত্র নেই এমন সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভারি কোন কৃষ্ণবিবরের মোটামুটি পঁচিশ-ত্রিশ লাখ মাইল দূর পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। আশপাশের কোন তারা থেকে ক্রমাগত বস্তুর খোরাক না পেলে তার গা থেকে তেমন তীব্র তেজ বিকিরণ ঘটবে না; তাতে এরকম কৃষ্ণবিবর হবে পুরোদস্তুর অদৃশ্য, অর্থাৎ তাকে দেখবার কোন উপায়ই থাকবে না। তবে এর মাধ্যাকর্ষণ বল হবে সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভরের তারার মতোই জোরালো।

কৃষ্ণবিবরের আশপাশে যেতে পারলেও সেটা যে ঠিক কোথায় আছে তা বোঝার জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার হবে। সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভরের কৃষ্ণবিবরের ব্যাস হবে মাত্র চল্লিশ মাইলের মতো। এত ছোট আকারের বস্তুর গায়ে যদি কিছু দেখার মতো থাকেও তবু বেশ কাছে না গেলে তাকে মোটেই দেখা যাবে না।

ধরা যাক কৃষ্ণবিবর দেখার জন্য আমরা একটা অভিযাত্রী যান নিয়ে তার কাছাকাছি হাজির হয়েছি। প্রথমে যানটি কৃষ্ণবিবরের চারপাশে নিরাপদ দূরত্বে অর্থাৎ সংযুতি-চাক্তির বাইরে একটি কক্ষপথে স্থাপন করা হল। তারপর অতি সূক্ষ্ম ঘড়ি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ কয়েকটি সন্ধানী অগ্রযান কৃষ্ণবিবরের সংযুতি-চাক্তিতে ছেড়ে দেওয়া হল; সেগুলো তখন ভেতর দিকে প্যাঁচানো কক্ষপথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকবে। প্রথম প্রথম অগ্রযানগুলো থেকে তেমন চমক লাগানো কোন খবর পাওয়া যাবে না; একই রকম ভরের একটি তারার চারপাশে ঘুরপাক খেলে যা ঘটবে এখানেও হুবহু তাই ঘটছে। এরপর অগ্রযান যখন পৌঁছায় পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূরে কৃষ্ণবিবর থেকে তার চেয়ে কম দূরত্বে তখন তার প্রচণ্ড আকর্ষণের টান স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। এখান থেকে কৃষ্ণবিবরের বিপুল মাধ্যাকর্ষণ বল যে-কোন স্বাভাবিক বস্তুকে একতাল কাদার মতো পিষতে আর টেনে লম্বা করতে থাকে।

অগ্রযান কৃষ্ণবিবরের একশ মাইলের মধ্যে এলে তাতে রাখা ঘড়ি ১৫ শতাংশ ধীরে চলছে বলে সময় দেখাবে। অগ্রযান থেকে যে সংকেত আসছে তার ওপর কৃষ্ণবিবরের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ টানের কারণেই সময় পিছিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। ক্রমে ক্রমে অগ্রযানটি যত কৃষ্ণবিবরের দিকে এগোতে থাকবে তত এসব প্রভাব বাড়বে; অবশেষে যখন সেটা কৃষ্ণবিবরের গায়ের কাছে অর্থাৎ ঘটনা-দিগন্তে পৌঁছবে তখন তার বেগ হয়ে উঠবে আলোর বেগের সমান আর সেটা সরাসরি ঢুকে যাবে কৃষ্ণবিবরের ভেতরে। অগ্রযান ঘটনা-দিগন্ত পেরিয়ে গেলে তা থেকে আর কোন সংকেত বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণবিবর যেন দেশ-কালের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশাল এক ঘূর্ণিপাক; এই ঘূর্ণিপাকের ভেতর একবার পড়লে আর বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই।

কৃষ্ণবিবরের মধ্যে যা একবার ঢোকে তা চিরদিনের জন্য এ মহাবিশ্বের বাইরে চলে যায়; তার আর কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগও করা যায় না। দেশ-কালের ব্যাপ্তিতে এ হল এক অন্তহীন একমুখো ফাঁদ। যে কোন জিনিসই একবার ঘটনা-দিগন্তের মধ্যে ঢুকে পড়লে প্রবল মাধ্যাকর্ষণের চাপে একেবারে চিড়ে-চেপটা হয়ে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কৃষ্ণবিবরের বুকের অতল গভীরে হারিয়ে যায়। ঘটনা-দিগন্ত নামটাই দেওয়া হয়েছে এজন্য যে সে সীমা ডিঙ্গিয়ে গেলে তার ওপারে আর কোন ঘটনা ঘটে না। অবশ্য কৃষ্ণবিবর থেকে যে কোন আলো-কণাই ফিরে আসতে পারে না তাতে মনে করা যেতে পারে যে তার ভেতরে হয়তো সব কিছুই আলোকিত, কিন্তু সেটাও আমাদের জানার কোন উপায় নেই। আমাদের কাছে সে এক চির অন্ধকার জগৎ।

কৃষ্ণবিবরের গড়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি; তাই এর ভেতরে যেসব বস্তু গিয়ে ঢোকে তাদের শেষ পরিণতি কি হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত নন। সেসব কি চিরকালের জন্য মহাবিশ্বের বাইরে চলে যায়, না কি দেশ-কালের পরিসরে কোথাও আয়নার প্রতিবিম্বের মতো 'শ্বেতবিবর' জাতীয় ফাঁক আছে যার ভেতর দিয়ে আর কোন স্থানে ও সময়ে সে সব বস্তু আবার ফোয়ারার মতো উথলে ওঠে? অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন সে সম্ভাবনা ক্ষীণ; কৃষ্ণবিবররা সত্যি সত্যি মহাবিশ্বের অতল গভীর গহ্বর।

আমাদের সূর্য ছায়াপথ গ্যালাক্সির কালপুরুষ শাখার যে এলাকায় সেখানে নক্ষত্র সমাবেশ বেশ ফাঁকা ফাঁকা; মোটামুটি ৪০০ ঘন আলোক-বছর এলাকায় আছে মাত্র একটি তারা। কিন্তু গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছাকাছি সমান এলাকায় আছে অন্তত বিশ লক্ষ তারা আর বিপুল পরিমাণ গ্যাস আর ধুলোর পাঁজা। কাজেই সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই; চারদিকে জ্বল জ্বল করছে উজ্জ্বল সব তারার আলো। আমাদের কাছাকাছি তারাদের মধ্যে গড় দূরত্ব মোটামুটি সাত আলোক-

বছর; আর গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছে তারাদের গড় দূরত্ব প্লুটোর কক্ষপথের ব্যাসের মাত্র বিশগুণের মতো। আর এই গ্যালাক্সির একেবারে কেন্দ্রে এক বিশাল কৃষ্ণবিবরের ভেতরে ক্রমাগত ঢুকছে বিপুল পরিমাণ তারার বস্তু। তার আশপাশে আছে আরো ছোটখাট অনেকগুলো কৃষ্ণবিবরের ঘূর্ণি। কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃষ্ণবিবরটির ভর চল্লিশ লক্ষ সূর্যের ভরের সমান; তার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় ১৫ গুণ। সিগনাস এক্স-১ কৃষ্ণবিবরের সংযুতি-চাক্তির ব্যাস মাত্র ৪০ মাইল; অথচ আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের এই দানব কৃষ্ণবিবরের সংযুতি-চাক্তি ছড়িয়ে আছে বৃহস্পতির কক্ষপথের ব্যাসের সমান বিশাল এলাকা জুড়ে।

এ ধরনের দানবাকার কৃষ্ণবিবরের কাছাকাছি যখন কোনো বস্তু গিয়ে ঢোকে তখন সে এলাকার প্রচণ্ড বিকিরণে আর চাপে প্রবলভাবে উত্তপ্ত আর বেগবান হয়ে ওঠায় তা থেকে গামা-রশ্মি ও অন্যান্য শক্তিশালী বিকিরণ বেরোতে তাকে। ১৯৭৭ সালে আকাশের বহু উঁচুতে বেলুনে পাঠানো গামা-রশ্মির হদিস করার সূক্ষ্ম যন্ত্র পাঠিয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে এমনি তীব্র রশ্মি বিকিরণের প্রথম নিশানা পাওয়া যায়।

## আলোর মশাল কোয়াসার

মহাকাশে আলোর মশাল কোয়াসার (Quasar = Quasi-stellar objects) প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ সালে। দেখা গেল এরা রয়েছে আমাদের কাছ থেকে অতি দূরে; আমাদের জানা মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমায়। তারা বিকিরণ ছড়ায় সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসের চেয়ে মোটামুটি দশগুণ বড় এলাকা থেকে; অথচ সে বিকিরণের পরিমাণ বহু লক্ষ কোটি সূর্যের বিকিরণের সমান। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হল তাঁরা ভুল দেখছেন কিনা। কিন্তু গত ক'বছরে কোয়াসারদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন আর তারা যে কী বস্তু তাও এখন অনেকটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন আসলে কোয়াসার হল গ্যালাক্সিরই এমন কেন্দ্রবস্তু যা বিপুলভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বিপুল তেজ বিকিরণের কারণেই এত দূর থেকেও কোয়াসারদের দেখতে পাওয়া যায় অথচ তাদের আবাস যে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর বড় বড় দূরবীনের সঙ্গে আজকাল ফটোর প্লেটের চেয়েও বহুগুণে সংবেদী নিশানা করার যন্ত্র সংযোজিত হয়েছে। এসব যন্ত্রের সাহায্যে বহু গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এবং অনেক গ্যালাক্সি দলে কোয়াসারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে প্রায়ই কোয়াসারদের চারপাশে থাকে এক আলোর বলয়, সেটা আসলে ছায়াপথ গ্যালাক্সির তারাদের মতো বহু হাজার কোটি তারার মেলা। ১৯৮৪ সালে দেখা গেল প্রায় দেড়শ কোটি আলোক-বছর দূরে একটি কোয়াসার-এর চারপাশের তারার মেলায় আছে একটি

অতিনবতারা। অতিনবতারাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার তেমন কম-বেশি হয় না তবে তাদের দূরত্ব যত বেশি, দীপ্তি তত কম মনে হয়। এই অতিনবতারার দীপ্তির মাত্রা থেকে তার দূরত্ব হিসেব করা হল একশ থেকে দু'শ আলোক-বছর। এই হিসেব আলোর ডপলার প্রতিক্রিয়া থেকে পাওয়া কোয়াসারের দূরত্বের সঙ্গে মিলে গেল।

সৌরজগতে প্লুটোর কক্ষপথের ব্যাস যতটা তার চেয়ে সামান্য বড় এলাকা থেকে একটি কোয়াসার যে পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে তা ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতো শত শত গ্যালাক্সির বিকিরণের সমান। এমন বিপুল শক্তি বিকিরণের মাত্র একটাই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সে হল কৃষ্ণবিবর। সূর্যের বুকে যে হারে শক্তি সৃষ্টি হয় একটা বড়সড় কৃষ্ণবিবর তার চেয়ে একশ গুণ দক্ষতার সঙ্গে শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। কৃষ্ণবিবর ক্রমাগত চারপাশ থেকে বস্তু শুষে নিয়ে তার জ্বালানির পরিমাণ বাড়িয়ে চলে। আর একবার তার সংযুতি-চাক্তির মধ্যে পড়লে সেসব বস্তু প্রচণ্ডরকম বেগবান হতে হতে অবশেষে আলোর বেগ লাভ করে। আর তাতে এমন বিপুল শক্তি সৃষ্টি হয় যে কৃষ্ণবিবরের ভেতরে ডুবে যাবার আগে তা থেকে তীব্র গামা-রশ্মি আর এক্স-রশ্মির আকারে তেজ বিকিরণ হতে থাকে।

একটি কোয়াসার থেকে যে পরিমাণ তেজ বিচ্ছুরিত হয় তাতে মনে হয় প্রতি বছর তার কয়েক লক্ষ পৃথিবী বা একটি পুরো তারার সমান গ্যাস আর ধুলোর পুঞ্জ গিলে খাবার কথা। অবশ্য একটি পুরো তারা কোয়াসারের কৃষ্ণবিবরের মধ্যে আস্ত ঢুকে যেতে পারে না। কোন তারা তার সংযুতি-চাক্তির কাছাকাছি এলে সেখানে প্রবল ঘূর্ণিপাকে পড়ে ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে ক্রমে ক্রমে তার ভেতরে ঢুকতে থাকে। এভাবে একটি কোয়াসার কৃষ্ণবিবরের ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে ঢুকতে থাকে কোটি কোটি কোটি ($১০^{২১}$) টন বস্তু। তাতে তার চারপাশে এমন এক শক্তির বলয় সৃষ্টি হয় যা থেকে বহু লক্ষ কোটি তারার সমান রশ্মি বিকিরণ ঘটতে থাকে।

কখনো কখনো কৃষ্ণবিবররা এত বেশি বস্তু গিলে ফেলে যা তারা পুরোপুরি হজম করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাড়তি বস্তু সংযুতি-চাক্তির সঙ্গে সমকোণে অর্থাৎ কৃষ্ণবিবরের দুই মেরু থেকে দুটি সরু ধারায় ছিটকে বেরোতে থাকে। কৃষ্ণবিবর কেন যে গিলে খাওয়া বস্তু পুরোপুরি হজম করতে পারে না তা এখনও ভাল করে বোঝা যায় নি, তবে ভেতরে কোয়াসার আছে এমন কিছু গ্যালাক্সি থেকে মেঘের মতো বিপুল পরিমাণ বস্তু বহু লক্ষ আলোক-বছর দূরে ছিটকে উঠতে দেখা গেছে।

আজ মনে হচ্ছে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে তার সৃষ্টির সময় থেকেই একটি করে কৃষ্ণবিবর রয়েছে। তবে খুব কম গ্যালাক্সির মধ্যেই কোয়াসার দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সবচেয়ে কাছের যে কোয়াসার সেও প্রায় একশ কোটি আলোক-বছর দূরে। মনে হয় কোয়াসারের মতো বিপুল তেজের উৎস সৃষ্টির জন্য কিছু অসাধারণ ঘটনার যোগাযোগ দরকার। সম্ভবত প্যাঁচানো গ্যালাক্সিদের মধ্যে

যখন সংঘর্ষ ঘটে বিশাল উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয় তখন সেই সংঘাতের সুযোগে গ্যালাক্সির ভেতরকার কোন কৃষ্ণবিবর অতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেটি প্রতি বছর পৃথিবীর ভরের দশ লক্ষগুণ বস্তু গিলে খাবার ফলে কিছুদিনের মধ্যে তার আকার সূর্যের ভরের চেয়ে বহু লক্ষ বা বহু কোটিগুণ বড় হয়ে ওঠে। সূর্যের ভরের চেয়ে একশ' কোটিগুণ ভরের কৃষ্ণবিবর হলে তার ব্যাস হবে প্লুটোর কক্ষপথের ব্যাসের মতো। তখন সেটা হয়ে উঠবে একটা কোয়াসার। কোয়াসারের আকার যত বড় হবে তা থেকে তত বেশি শক্তির বিকিরণ ঘটবে, অবশ্য যদি জ্বালাবার মতো যথেষ্ট বস্তুর পুঁজি তার আশপাশে জোটে।

কোয়াসাররা যে চিরকাল টিকে থাকে এমন নয়। বিশ-ত্রিশ লাখ সূর্যের ভরের সমান আকারের কৃষ্ণবিবর অন্তত দশ লাখ বছর ধরে বিপুল বেগে শক্তি উগরে দেবার পর তবেই কোয়াসার দানা বাঁধে। যখন কৃষ্ণবিবর অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন বিকিরণের তোড়ে তার চারপাশের বস্তু দূরে ছিটকে যেতে থাকে। তাতে সে কৃষ্ণবিবরের বস্তুর পুঁজিতে টান পড়ে, তার তেজ কমে আসে। কিছু পরে চারপাশ থেকে বস্তু আবার কাছে এসে জড়ো হয়, তখন তার তেজ আবার বেড়ে ওঠে। এভাবে একটা সময় আসে যখন কৃষ্ণবিবরের তেজ আর ঠিক আগের পর্যায়ে পৌঁছায় না। তখন কোয়াসারের আয়ু শেষ হয়ে আসে। সম্ভবত কোন কোয়াসারই দু'শ কোটি বছরের বেশি টিকতে পারে না।

এযাবৎ সবচেয়ে দূরে যে কোয়াসার দেখা গিয়েছে সে আমাদের কাছ থেকে ১,২০০ কোটি আলোক-বছর দূরে। অধিকাংশ কোয়াসার যে এত বেশি দূরে দেখা যায় তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর প্রথম কয়েকশ' কোটি বছর সম্ভবত কোয়াসারের সংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তারপর কোয়াসার সৃষ্টির হার বেশ কিছুটা কমে এসেছে। আদি মহাবিশ্বের অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে গ্যালাক্সিরা ছিল আজকের তুলনায় অনেকটা কাছাকাছি, তাতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল ঢের বেশি। আর তাই তখনকার সে অবস্থাটা ছিল কোয়াসার সৃষ্টির জন্য পরবর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল।

আজ আমরা মহাকাশে যেসব কোয়াসারের আলোর মশাল দেখতে পাচ্ছি সে মোটেই তাদের আজকের চেহারা নয়; বহু কোটি বছর আগে তারা যে তীব্র দ্যুতি মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল তাই সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে বহুকাল পরে আজ এসে আমাদের চোখে পড়ছে। হয়তো সে তাদের একেবারে কৈশোরের বা যৌবনের আলো।

# পড়শির খোঁজে দূরে কোথাও

মানুষ যে সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা জীব এ ধারণা আমাদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল যে এর কোনো রকম নড়চড় হবার কথা চিন্তা করাও খুব কঠিন। বহুকাল ধরে মানুষের একটা আনন্দ আর গর্ব যে মানুষের আবাস এই পৃথিবীটা সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু আর এ বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে মানুষেরই সেবার জন্য। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, টলেমি থেকে বহু দার্শনিক, পণ্ডিত, ধর্ম প্রচারক বলে গেছেন এমন কথা। শুধু তাই নয়, পৃথিবী হল কলঙ্কময়, কলুষিত; আকাশের দীপ্তিমান বস্তুরা সব স্বর্গলোকের, তাই তারা নিষ্কলঙ্ক আর পবিত্র। – শত শত বছর ধরে শুনতে শুনতে এসব কথা গেঁথে গেছে মানুষের চেতনায়।

ভিন্ন ধরনের কথা কেউ কি বলেন নি? প্রচলিত ধারণা নিয়ে দেশে দেশে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কিন্তু ইতিহাসের নানা সময়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদের চলতি সমাজ সুনজরে দেখে নি; কেউ কেউ রীতিমতো নিগ্রহ ভোগ করেছেন। আজ থেকে মাত্র চারশ বছর আগে 'আকাশে আরো অনেক সূর্য আছে, আছে আরো অসংখ্য জগৎ' এ ধরনের কথা বলেছিলেন জিওর্দানো ব্রুনো; তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। হাইপেশিয়া, ইব্‌ন সিনা, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ডারউইন এঁদের নাম ইতিহাসে শুধু তাঁদের বৈজ্ঞানিক কীর্তির জন্য নয়, তাঁরা সেকালের সমাজপতিদের কাছ থেকে যে লাঞ্ছনা আর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তার জন্যও বিখ্যাত হয়ে আছে।

তাবলে পুরনো দিনের সব ধারণাই যে আমরা চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকতে পারছি তা তো নয়; ভাল লাগুক বা না লাগুক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে মানুষের অনেক ধারণাই ক্রমে ক্রমে পাল্টে যাচ্ছে। সবার সেরা মানুষেরই জন্য আর সব কিছু – এমনি ধারণা থেকে মানুষ পৃথিবীর সব গাছপালা আর প্রাণীকে নির্বিচারে ধ্বংস করতে শুরু করেছিল; তছনছ করছিল সব খনিজ, জমি-জমা আর বন-বনানীকে। ফলে এর মধ্যেই পৃথিবীর বহু দেশে মাঠঘাট হয়ে উঠেছে বিরান – গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সবারই বাসের অযোগ্য। তাই এ পৃথিবীর সবকিছু তৈরি মানুষের লাগামছাড়া ভোগের জন্য – এমন ছন্নছাড়া ধারণা ঝেড়ে না ফেললে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই হয়ে উঠছে শক্ত। বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জিদের ডি.এন.এ. বা প্রাণবস্তুর মৌল এককের মিল ৯৮ শতাংশের ওপরে, তাতে বোঝা যায় শিম্পাঞ্জিরা আমাদের একেবারে নিকট আত্মীয়; পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া এ ধরনের তথ্য

শুনতে কারো কারো কাছে রীতিমতো অপমানকর মনে হলেও একেবারে উড়িয়ে দেয়াও শক্ত।

পৃথিবী যে এ বিশ্বের কেন্দ্র এ ধারণার গোড়া কেটে দিয়েছিলেন কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও সেই ১৬-১৭ শতকেই। তাঁরা বলেছিলেন পৃথিবী সৌরজগতের আরো অনেকগুলো গ্রহের মধ্যে একটি মাত্র। উনিশ শতকে জ্যোতির্বিদদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেল আমাদের সূর্যও এ বিশ্বের কেন্দ্র নয়, আকাশের তারারা সবাই এক একটি সূর্য; এমনি বহু কোটি তারা মিলে এক একটি গ্যালাক্সি বা তারাপুঞ্জ; আবার বহু কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে মহাবিশ্ব। তাহলে পৃথিবী হল বিশ্বজগতের কেন্দ্র – মানুষের এই বহুকালের অতি প্রিয় ধারণা আর আদৌ ধোপে টেকে না। তখন পৃথিবী হয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য গ্যালাক্সির জগতে একটি মাঝারি আকারের গ্যালাক্সির অসংখ্য তারার মধ্যে একটি সাধারণ তারার চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া একটি অতি সাধারণ গ্রহ মাত্র।

এরপর যে প্রশ্নটি দেখা দেয় সে হল; আচ্ছা, না হয় মানা গেল পৃথিবী এই মহাবিশ্বে কল্পনার-অতীত অতি বিশাল চরাচরে একটি অতি ছোট বিন্দুর মতো। কিন্তু তবু তো এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, প্রায় এক কোটি প্রজাতির জীবের মধ্যে কত বিচিত্র রূপে আছে প্রাণের আরো অসংখ্য প্রকাশ; এমন তো সৌরজগতের আর কোথাও আজো পাওয়া যায় নি। এই অতি বিশাল বিশ্ব চরাচরে কোথাও কি আছে মানুষের মতো এমন কোন প্রাণী? অন্তত আর কোন ধরনের প্রাণের নিশানা?

## প্রথম ধাপ সৌরজগতে

পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্তিত্ব খুঁজতে হলে প্রথমেই মনে আসে পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহ বা উপগ্রহে খোঁজ করার কথা। মহাকাশে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি হল চাঁদ; পৃথিবীর পরিধির চেয়ে মাত্র দশগুণ দূরে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এবং তারপর আরো বেশ কয়েকবার নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে নেমে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সেখানকার মাটি-পাথর পৃথিবীতে নিয়ে এসে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই বায়ুশূন্য, পানিশূন্য জগতে এমন কি কোন ধরনের অণুজীবেরও হদিস মেলে নি।

সৌরজগতে যে নয়টি গ্রহ তার মধ্যে পাথুরে দেহ নিয়ে বুধ রয়েছে সূর্যের খুব কাছাকাছি; পৃথিবীর তুলনায় তার দূরত্ব প্রায় আড়াইগুণ কম। আর এমন কাছাকাছি বলেই তার ওপর সূর্যের রশ্মি পড়ে পৃথিবীর তুলনায় পাঁচ থেকে দশগুণ বেশি। ফলে বুধের গা সর্বক্ষণ তেতে থাকে প্রচণ্ডরকম; সে তাতে সীসাও গলে যাবার কথা।

আবার সৌরজগতের অতি দূর প্রান্তে ইউরেনাস আর নেপচুন-এর উপাদান প্রধানত গ্যাস; এ দুটি গ্রহ আছে সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় মোটামুটি উনিশ গুণ আর ত্রিশ গুণ দূরে। এমন প্রচণ্ডরকম দূরে সূর্যের আলো পৌঁছায় পৃথিবীর তুলনায় যথাক্রমে প্রায় চারশ গুণ আর নয়শ গুণ কম। সেই প্রায় অন্ধকার জগতে প্রবল শীতে গ্যাসও জমে তরল হয়ে যায়। আরো দূরে খুদে গ্রহ প্লুটো অনেকটা কঠিন বস্তুতে তৈরি হলেও সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় চল্লিশগুণ দূরে; তাই সেখানে ঠাণ্ডা আরো বেশি। এসব গ্রহে প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বাকি থাকে পৃথিবী থেকে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহ শুক্র (গাঢ় মেঘমালায় ঢাকা যে উজ্জ্বল গ্রহটিকে আমরা অনেকে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা হিসেবে জানি) এবং পৃথিবী থেকে আরো দূরে মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি। এই কয়টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহদের নিয়েই বিজ্ঞানীরা বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

শুক্রগ্রহ আকারে পৃথিবীর চেয়ে সামান্য ছোট; এর বছর হয় পৃথিবীর সাড়ে সাত মাসে। আর উনিশ মাস পর পর গ্রহদের মধ্যে শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। ১৯৬৭ সালে রুশ নভোযান ভেনেরা-৪ আর মার্কিন নভোযান মেরিনার-৫ প্রায় একই সময়ে শুক্রের ওপরে গিয়ে পৌঁছায়। সে সব পরীক্ষা থেকে জানা যায় শুক্রের বায়ুমণ্ডল প্রায় পুরোপুরি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আর তার চাপ পৃথিবীর সমুদ্র সমতলের হাওয়ার চাপের চেয়ে প্রায় একশ গুণ বেশি। একে তো সূর্যের কাছাকাছি বলে শুক্র সূর্যরশ্মি পায় পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, সেই সঙ্গে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবরণ আর ঘন মেঘের ঢাকা, তার ওপর সেখানকার দিন পৃথিবীর ৫৮ দিনের সমান; এ অবস্থায় সেখানে তাপ যে হবে গনগনে তা সহজেই বোঝা যায়। পরে আলতোভাবে নভোযান নামিয়ে দেখা গেছে শুক্রের গায়ের তাপমাত্রা প্রায় ৪৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সেখানে প্রাণের কোন হদিস মেলে নি।

মঙ্গলগ্রহ আকারে পৃথিবীর চেয়ে বেশ ছোট; ব্যাস মোটামুটি অর্ধেক আর ভর প্রায় নয়ভাগের একভাগ। পৃথিবী সূর্য থেকে যত দূরে মঙ্গল তার প্রায় দেড়গুণ বেশি দূরে। সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেকেরও কম; তাই তাপমাত্রা অনেকটা পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের মতো। মঙ্গল গ্রহে দিনরাত মোটামুটি পৃথিবীর মতোই তবে এখানকার এক বছর পৃথিবীর প্রায় দু'বছরের সমান। এছাড়া মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মতোই ঋতু-বৈচিত্র্য দেখা যায়, যদিও বছর বড় বলে এখানে ঋতুর দৈর্ঘ্যও বেশি। আর শীতকালে তার দু'মেরুতে বরফের পাঁজা জমে ওঠে। তবে নভোযানের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর তুলনায় মাত্র এক থেকে দু' শতাংশ আর সে বায়ুমণ্ডল মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড। ১৯৭১ সালে রুশ নভোযান মার্স-৩ আলতোভাবে মঙ্গল গ্রহে নামে; তারপর ১৯৭৬ সালে মার্কিন নভোযান ভাইকিং ১ ও ২ মঙ্গল গ্রহে নেমে নানা

ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। এসব পরীক্ষা থেকে বোঝা গেছে এক সময় মঙ্গলের বুকে বিশাল নদীর প্রবাহ ছিল, কিন্তু আজ সেখানে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না।

বৃহস্পতি আর শনি দুটো গ্রহই পৃথিবীর তুলনায় দানবাকার। বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর তুলনায় ৩১৮ গুণ, শনির ভর ৯৫ গুণ; স্বভাবতই এগুলোর ওপর মাধ্যাকর্ষণের টানও হবে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি। এমন বিশাল বপু নিয়েও দুটো গ্রহই নিজের অক্ষের ওপর একপাক ঘোরে মাত্র দশ ঘণ্টায়। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব পৃথিবীর চেয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ আর দশগুণ বেশি; তাই এসব গ্রহে সূর্যরশ্মি পড়ে প্রায় ত্রিশগুণ আর একশগুণ কম। দুটো গ্রহের বিপুল বায়ুমণ্ডলের উপাদান প্রধানত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম; যথেষ্ট মিথেন আর অ্যামোনিয়া গ্যাসও আছে। বৃহস্পতির মেঘের ওপরকার তাপমাত্রা পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর চেয়েও ঠাণ্ডা; শনির তাপমাত্রা আরো কম। অবশ্য দুটো গ্রহই সূর্য থেকে যত তাপ পায় তার চেয়ে বেশি ছড়িয়ে দেয়; এতে বোঝা যায় এদের ভেতরটা এখনও বেশ গরম। এমন চরম পরিবেশে এদের গায়ে প্রাণের হদিস পাবার সম্ভাবনা কম। তবে এর মধ্যে বৃহস্পতির ১৬টি আর শনির ১৮টি উপগ্রহের হদিস মিলেছে; তাদের কোন কোনটি আকারে আমাদের চাঁদ এমনকি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়; এগুলোতে কোথাও প্রাণের নিশানা থাকতেও পারে।

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গ্যানিমিড বৃহস্পতির চারপাশে ঘোরে মোটামুটি আমাদের সাতদিনে একবার। এর ব্যাস ৫,২৭৬ কিমি (৩,২৭৮ মাইল) আর শনির উপগ্রহ টাইটান-এর ৫,১৫০ কিমি অর্থাৎ ৩,২০০ মাইল (বুধের ব্যাস ৩,১০০ মাইল আর চাঁদের ২,১৬০ মাইল)। সম্ভবত গ্যানিমিড-এর ওপরে আছে পুরু বরফের স্তর। বিজ্ঞানীদের বিশেষ করে নজর পড়েছে টাইটানের দিকে। এটি ১৬ দিনে শনির চারপাশে একবার ঘুরপাক খায়; এর ওপরকার তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এর ঘন বায়ুমণ্ডল আছে; পৃথিবীর মতোই তার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। সৌরজগতে আর কোন উপগ্রহে এমন বায়ুমণ্ডল নেই। টাইটানের গা লালচে ধরনের; মনে হয় সেখানে প্রচুর জৈব উপাদান আছে; তাই কোন ধরনের প্রাণের বিকাশ সেখানে অসম্ভব নয়।

## মহাবিশ্বে প্রাণের খোঁজে

সৌরজগতে প্রাণের হদিস না পাওয়া যাক, আমাদের গ্যালাক্সিতে আর কোন নক্ষত্রের গ্রহলোকে কি প্রাণের নিশানা থাকতে পারে না? আসলে ১৯৬০ সাল থেকেই একদল জ্যোতির্বিদ মহাকাশে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান শুরু করেন; তাঁদের প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'সেটি' (SETI = Search for Extra-Terrestrial Intelligence)। মহাকাশ থেকে বুদ্ধিমান জীবেরা বেতারে কোন বার্তা পাঠাতে

পারে মনে করে তাঁরা সারা আকাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেতার সংকেত ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের হদিস পাবার একটা প্রথম ধাপ হল মহাকাশে পৃথিবীর মতো গ্রহের খোঁজ পাওয়া; সে খোঁজ এতকাল মেলে নি।

আজ মনে হয় আমরা এ প্রশ্নের সুরাহার বেশ খানিকটা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি। মানুষ মহাকাশ নিয়ে অনুসন্ধানের যেসব কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে তাতে আজ খোঁজ করা সম্ভব হচ্ছে কোন নক্ষত্রের চারপাশে আদৌ গ্রহজগৎ আছে কিনা; থাকলে তার কোন গ্রহে বা উপগ্রহে প্রাণের প্রকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। যদি তা থাকে তাহলে এমন কোথাও কি মানুষের মতো বা তার চেয়েও বুদ্ধিমান কোন জীব আছে যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার মতো সভ্যতা বা প্রযুক্তি বিকাশের স্তরে পৌঁছেছে?

ধরা যাক জীবের অস্তিত্ব মহাবিশ্বে শুধু একটি দুটি নয়, অসংখ্য তারার আশপাশে আছে। কিন্তু সমস্যা হল তার সন্ধান মানুষ কী করে পাবে? জীবের অস্তিত্ব বোঝার আগে নক্ষত্রের আশপাশে গ্রহের হদিস পেতে হবে। মহাকাশে তারারা দীপ্তিমান, অথচ গ্রহের নিজের কোন দীপ্তি নেই, শুধু তারার প্রতিফলিত আলোতে সে কিছুটা আলোকিত। পৃথিবী থেকে বহু আলোক-বছর দূরে এমন বস্তুর খোঁজ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। দূরের নক্ষত্রের দীপ্তি হবে তার কাছাকাছি গ্রহের চেয়ে হাজার কোটিগুণ বেশি; সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে বসে সেই গ্রহের হদিস পাওয়া হবে যেন কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে একটা কড়া সার্চলাইটের পাশে একটা খুদে জোনাকির আলো খুঁজে পাবার চেষ্টার মতো।

বিজ্ঞানীরা তবু হাল ছাড়েন নি। তাঁরা জানেন যে একটি নক্ষত্রের আশপাশে যদি কোন গ্রহ থাকে তবে তা নক্ষত্রের চলাপথের ওপর খুব সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করবে। যখন গ্রহটি থাকে পৃথিবী আর নক্ষত্রের মাঝামাঝি তখন গ্রহের আকর্ষণে নক্ষত্রটি পৃথিবীর দিকে একটু সরে আসবে; তাতে তার আলোর ঢেউগুলো ঘনীভূত হবে, অর্থাৎ অতি সামান্য সরে যাবে নীলের দিকে। আবার গ্রহ যখন তার কক্ষপথে থাকবে নক্ষত্রের উল্টো পাশে তখন তার আকর্ষণে নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে একটু দূরে সরে যাবে; তাতে তার আলোর ঢেউগুলো সামান্য প্রসারিত হবে অর্থাৎ রঙ লালের দিকে সরবে। এই যে আলোর ঢেউয়ের হেরফের ঘটা যাকে বলা হয় 'ডপলার প্রতিক্রিয়া' সেটা মাপা যায় স্পেকট্রোমিটার বা বর্ণালিবীক্ষণ নামে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে। গ্রহটির ভর যত বেশি হবে তত জোরালো হবে ডপলার প্রতিক্রিয়া।

এমনি বর্ণালিবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করেই ১৯৯৫ সালের শেষদিকে জ্যোতির্বিদরা প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ পেলেন যে মহাবিশ্বে সূর্য ছাড়া আরো তারার আশপাশে গ্রহজগৎ আছে। সবার আগে অক্টোবর মাসে খোঁজ পেলেন সুইজারল্যাণ্ডের

জেনেভা মানমন্দির থেকে মিশেল মায়র (Michel Mayor) ও দিদিয়ের কেলজ (Didier Queloz) নামে দু'জন জ্যোতির্বিদ; তাঁরা দেখলেন পেগাসাস বা পক্ষিরাজ তারামণ্ডলের ৫১ পেগাসি নামে তারার চারপাশে একটি বেশ বড়সড় গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি পৃথিবী থেকে ৪২ আলোক-বছর দূরে আর এর ভর বৃহস্পতির ভরের মোটামুটি অর্ধেক। তবে এটা তারা থেকে মাত্র সত্তর লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে (সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব যত তার আট ভাগের এক ভাগেরও কম) আমাদের ৪.২ দিনে একবার ঘুরপাক খাচ্ছে; তাতে এর গায়ের তাপমাত্রা ওঠার কথা অন্তত ১,৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমন তেতে ওঠা গ্রহে কোন রকম জীবের অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে হয় না।

মাত্র তিন মাস পরই ক্যালিফোর্নিয়ার লিক মানমন্দিরে পরীক্ষা করতে করতে জিওফ্রে মার্সি (Geoffrey Marcy) আর পল বাটলার (Paul Butler) নামে দু'জন জ্যোতির্বিদ এমনি আরো দুটি নক্ষত্রের কাছাকাছি গ্রহের হদিস পেলেন। তার মধ্যে একটি ঘুরছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ৪৭ আর্সে মেজরিস নামে একটি নক্ষত্রের চারপাশে — পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৪ আলোক-বছর দূরে। এটি নক্ষত্র থেকে ত্রিশ কোটি কিলোমিটার দূর দিয়ে (অর্থাৎ সৌরজগতে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি দূরত্বে) ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের তিন বছরে একবার। গ্রহটির ভর বৃহস্পতির ভরের ২.৩ গুণ, আর সম্ভবত এর ওপরটা বৃহস্পতির মতোই প্রচণ্ড প্রমত্ত গ্যাসের পাঁজা।

দ্বিতীয় গ্রহটি ঘুরছে কন্যারাশিতে ৭০ ভার্জিনিস নক্ষত্রের কাছে; পৃথিবী থেকে এরও দূরত্ব আগেরটির মতোই। এর ভর বৃহস্পতির চেয়ে অন্তত ৬.৫ গুণ; তাই সম্ভবত এর ওপরকার আবহাওয়া বেশ চরম। এটি নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে ১১৭ দিনে একবার, রীতিমতো উপবৃত্তাকার একটি কক্ষপথে; তবে নক্ষত্র থেকে এমন দূরত্বে আছে যেখানে তরল পানি থাকা সম্ভব। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন দ্বিতীয়টি আদতে গ্রহ নয়, একটি বাদামি বামনতারা। সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট আকারের তারার বুকে হাইড্রোজেনের সংযোজন ঘটবার মতো তাপমাত্রা ওঠে না, তবে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ চাপের কারণে যে তেজ সৃষ্টি হয় তাতে সেটি কয়েক কোটি বছর লাল আলো দেয়। অবশেষে সংকুচিত হতে হতে তার ব্যাস বৃহস্পতির ৯০ শতাংশের মতো হলে সংকোচন থেমে যায়; ঠাণ্ডা হয়ে আর আলো নিভে গিয়ে সেটি হয়ে দাঁড়ায় ছোট একটি বাদামি বামনতারা।

এমনি দু'চারটি গ্রহের খোঁজ পেলেই যে তাতে প্রাণের হদিস পাওয়া যাবে তা অবশ্য বলা যায় না। সৌরজগতের বাইরে এমন গ্রহের খোঁজ পেতে হবে যেখানে শুধু প্রাণের বিকাশ ঘটার মতো পরিবেশ রয়েছে বা প্রাণের বিকাশ ঘটেছে তা নয়, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এমন উঁচু মানের সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে। আমাদের গ্যালাক্সি এমন বিশাল যে তার এমাথা থেকে ওমাথায় আলো

যেতে লাগে প্রায় এক লাখ বছর; আমরা আগেই জেনেছি তাতে মোট নক্ষত্র আছে অন্তত ১০,০০০ কোটি। অবশ্য যেসব নক্ষত্রের খুব স্বল্পকালের জীবনে বস্তুর পুঁজি তাড়াতাড়ি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের চারপাশে গ্রহজগৎ থাকার সম্ভাবনা নেই। ধরা যাক গ্রহজগৎ থাকার সম্ভাবনাযুক্ত তারার সংখ্যা মোট তারার এক-তৃতীয়াংশ। তাহলে আমাদের গ্যালাক্সিতে গ্রহজগৎ থাকতে পারে প্রায় ৩,০০০ কোটি নক্ষত্রের। আবার শুধু গ্রহজগৎ থাকলে হবে না, এমন গ্রহ চাই যেখানে জীবন বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রহ যদি থাকে নক্ষত্রের খুব কাছে তাহলে প্রচণ্ড উত্তাপে সব পানি বাষ্প হয়ে উবে যাবে আর সেখানে জীবনের বিকাশ হবে দুঃসাধ্য। আবার গ্রহটি যদি হয় বেশি দূরে তাহলে পানি তরল থাকবে না, জমে কঠিন বরফ হয়ে যাবে। কাজেই এমন গ্রহ চাই যেটি নক্ষত্র থেকে খুব কাছেও না আবার খুব দূরেও না এবং তাপমাত্রা এমন হবে যেন তরল পানি থাকতে পারে। সৌরজগতের দৃষ্টান্ত থেকে এই সম্ভাবনাটি ২ বলে ধরা যেতে পারে। তাহলে গ্যালাক্সিতে এমন গ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬,০০০ কোটি।

এরপর সম্ভাবনার হিসেব কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে। কোন গ্রহে জীবনের উপযোগী পরিবেশ থাকলেও সে গ্রহে সত্যি সত্যি কোন এক সময়ে জীবন বিকাশের সম্ভাবনা কতখানি? ধরা যাক সে সম্ভাবনা এক-তৃতীয়াংশ; তাহলে কখনো না কখনো জীবন বিকশিত হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০০০ কোটি। মনে করা যাক এর মধ্যে মাত্র এক-শতাংশ গ্রহে জীবজগৎ বিবর্তনের ধারা বেয়ে একটা সভ্যতার স্তরে পৌঁছতে পারে। তাহলে আমাদের গ্যালাক্সিতে এমন গ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ কোটি। কিন্তু মহাকালের অনন্ত ধারায় আজকের মানুষ যে সময়ে মহাকাশের সঙ্গে বেতার যোগাযোগের পর্যায়ে পৌঁছেছে ঠিক এই সময়ে গ্যালাক্সিতে কোন গ্রহের এ ধরনের বা এর চেয়ে উঁচু পর্যায়ের সভ্যতার স্তরে পৌঁছবার সম্ভাবনা কতটা? এ সম্ভাবনা এক কোটি ভাগের একভাগও হতে পারে আবার মাত্র একশ ভাগের একভাগও হতে পারে। যদি এক কোটিভাগের একভাগ হয় তাহলে গ্যালাক্সিতে আমাদের পড়শির সংখ্যা হবে মাত্র বিশ; আর যদি হয় একশ ভাগের একভাগ তাহলে এমন সভ্যতার সংখ্যা হবে বিশ লাখ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন সম্প্রতি মহাকাশে যে কয়টি গ্রহের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তার দু'একটি মূল নক্ষত্র থেকে এমন দূরত্বে রয়েছে যেখানে তরল পানি থাকা সম্ভব। পানির অস্তিত্ব জীবন বিকাশের জন্য একটা জরুরি শর্ত; তাই এদের কোন কোনটিতে প্রাণের বিকাশ ঘটা একেবারে অসম্ভব নয়। আর এসব গ্রহে যদি প্রাণের অস্তিত্ব নাও থাকে তবু তাদের আশপাশে ছোট আকারের এমন গ্রহ বা উপগ্রহ থাকা সম্ভব যাতে প্রাণের প্রকাশ ঘটে থাকতে পারে। আমাদের কাছাকাছি দু'চারটি নক্ষত্রে যে গ্রহের অস্তিত্ব আছে তাতেই বোঝা যায় সমগ্র গ্যালাক্সিতে

এমন গ্রহের সংখ্যা হবে বহু কোটি। তার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনাও থাকবে অসংখ্য গ্রহে।

## আগামীতে আরো বড় আয়োজন

এসব আবিষ্কার থেকে আমেরিকার জাতীয় মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' (NASA) উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাদের অরিজিন্‌স্ (অর্থাৎ উৎস) কর্মসূচিতে আগামী ক'বছরে অনেকগুলো মহাকাশ দূরবীন স্থাপন করে তার সাহায্যে গ্রহদের উৎপত্তি এবং তাতে প্রাণের চিহ্ন আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা চালানো হবে। সম্প্রতি মহাকাশে ছোঁড়া হয়েছে 'ইসো' (ISO = Infra-red Space Observatory) নামে এক ইউরোপীয় কৃত্রিম উপগ্রহ; আশা করা যাচ্ছে এটি অবলালরশ্মির সাহায্যে অতি দূরের গ্রহের সামান্য তাপেরও হদিস করতে পারবে। ১৯৯৭ সালে মার্কিনী হাব্‌ল্ মহাকাশ দূরবীনে একটি নতুন শক্তিশালী অবলালরশ্মি ক্যামেরা বসানো হবে; তাতেও অতিদূর গ্রহদের ছবি ধরা পড়ার কথা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন সৌরজগতের বাইরে গ্রহের হদিস করতে সুবিধে হয় যদি মহাকাশে এমন একটা দূরবীন স্থাপন করা যায় যার প্রতিফলক আয়না সমাবেশ হবে একটা ফুটবল মাঠ যত লম্বা প্রায় ততটা চওড়া। তবে সেটা বাস্তবে আজো সম্ভব নয়; তার বদলে অনেকগুলা দূরবীন মহাকাশে খানিকটা দূরে দূরে এমনভাবে বসানো যায় যেন সেগুলোতে ধরা পড়া আলোর যোগফলে দূরের গ্রহের দৃশ্য অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। ২০১০ সাল নাগাদ নাসার পক্ষ থেকে তিনশ' ফুট জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছোট ছোট প্রতিফলকওয়ালা এমন 'গ্রহসন্ধানী' দূরবীন বৃহস্পতির কক্ষপথে স্থাপন করার আয়োজন চলছে।

সৌরজগতে বৃহস্পতির কাছাকাছি এলাকায় গেলে মহাকাশে ধুলোর পরিমাণ অনেকটা হালকা হয়ে আসে। তাই সেখান থেকে দূর মহাকাশের অতি ছোট বস্তুর স্পষ্ট ছবি পেতে সুবিধে। এই দূরবীনের প্রতিফলকপুঞ্জের মিলিত যে আলো পৃথিবীতে পৌঁছবে তাতে অন্য নক্ষত্রের আশপাশের পৃথিবীর মতো গ্রহকে দেখাবে হালকা নীল বিন্দুর মতো; তখন সে গ্রহের ওপরকার বায়ুমণ্ডলের উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলবে।

বিজ্ঞানীরা গ্রহজগতে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য তরল পানি থাকার ওপর বেশ জোর দিচ্ছেন। পানিতে কার্বনভিত্তিক নানা জৈবরাসায়নিক যৌগ সহজেই গলে যায় এবং সে অবস্থায় তাদের পরস্পরের মধ্যে অসংখ্য ধরনের বিক্রিয়া ঘটে নানা নতুন নতুন উপাদান সৃষ্টি হয়। আমাদের পৃথিবীতে যে ধরনের প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে তা কার্বন যৌগের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে। মৌল পদার্থের মধ্যে কার্বনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর অক্সিজেনের পরই এটি হল বিশ্বের চতুর্থ সুলভ মৌল; তাছাড়া এটি অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসংখ্য

রকমের জটিল যৌগ সৃষ্টি করতে পারে। সারা মহাকাশ জুড়ে বহু ধরনের বিপুল পরিমাণ কার্বন যৌগ ছড়ানো আছে; ধূমকেতু আর গ্রহাণুদের একটা প্রধান উপাদানও কার্বন যৌগ। আজ অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন আমাদের পৃথিবীতে যে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল উপাদানগুলো আদিতে এসেছে এমনি ধূমকেতু বা উল্কাকণার খণ্ড হিসেবে মহাকাশ থেকেই। আর তা যদি পৃথিবীর বেলায় ঘটতে পারে তাহলে অন্য গ্রহের বেলাতেও ঘটতে পারে।

মহাকাশে যে কোনো ধরনের জীবের সন্ধান পেলেই বিজ্ঞানীরা খুশি। তবে স্বভাবতই তাঁরা সবচেয়ে বেশি খুশি হন যদি দূরের কোন গ্রহজগতে কোন রকম বুদ্ধিমান জীবের হদিস পাওয়া যায়। সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আর স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের উদ্যোগে বোস্টনের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বসানো হয়েছে এক বিশাল বেতার দূরবীন। এই দূরবীনের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিটা' (BETA = Billion-channel Extra-Terrestrial Assay)। প্রতিদিন এই দূরবীন আকাশের নির্দিষ্ট অংশ পরীক্ষা করে দেখে আর যেসব বেতার সংকেত ধরা পড়ে তাদের একটি সুপারকম্পিউটার দিয়ে পরীক্ষা করা হয় – যদি কোন বুদ্ধিমান জীবের হদিস পাওয়া যায়। এই প্রকল্পের পরিচালক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল হরোভিৎস (Paul Horowitz)-এর মতে আমাদের গ্যালাক্সিতে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা একেবারে ষোল আনা।

তবু বিজ্ঞানীদের সন্দেহ একেবারে কাটে না। বুদ্ধিমান প্রাণী যদি কোন গ্রহে থাকেও তাহলে তাদের প্রযুক্তি কি এতটা উন্নত হবে যে তারা বেতারে মহাকাশে বার্তা পাঠাতে থাকবে; আর সে বার্তা কি এত জোরালো হবে যে বহু আলোক-বছর পথ পেরিয়ে পৃথিবীতে তাকে ধরা যাবে? যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে পৃথিবী থেকে একশ আলোক-বছর দূরে তাহলে পৃথিবী থেকে পাঠানো কোন বেতার বার্তা মহাকাশে বহু দূরের পথ পেরিয়ে তাদের কাছে পৌঁছতে কেটে যাবে একশ বছর; আবার তাদের পাঠানো কোন বেতার বার্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছতেও লাগবে আরো একশ বছর। আর আমাদের পাঠানো বার্তার কি তারা পাঠোদ্ধার করতে পারবে? আমরাই কি পারব তাদের বার্তার পাঠোদ্ধার করতে?

এসব সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ ভাবছেন। এসব সমস্যার সমাধানও তাঁরা খুঁজছেন। তবে আজকের মহাকাশ-বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে নিশ্চিত বলা যায় আমাদের সৌরজগতে যতগুলো গ্রহ আছে খুব শীগ্‌গরই মানুষ সৌরজগতের বাইরে তার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহের খবর জেনে যাবে; আর তখন মহাকাশে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান স্বভাবতই আরো জোরালো হয়ে উঠবে।

# আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে

১৯৯৪ সালের জুলাই মাস। সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিদদের হতবাক করে দিয়ে মহাকাশে ঘটল এক বিরল দৃশ্য। শুমেকার-লেভি নামে একটি ধূমকেতুর অনেকগুলো খণ্ড ভেঙ্গে পড়ল বৃহস্পতি গ্রহের গায়ে। এমন ঘটনা ঘটতে পারে বহু হাজার বছরে মাত্র একবার। বিশ শতকের শেষে এসে নানা ঘটনা পরম্পরার এক আশ্চর্য যোগাযোগে বিজ্ঞানীরা এই অতি বিরল দৃশ্য দেখার সুযোগ পেলেন। কিন্তু তারপর প্রশ্ন উঠল : এ ধরনের ঘটনা কি পৃথিবীর বেলাতেও ঘটতে পারে?

এই ধূমকেতুর আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ ইউজিন শুমেকার আর ডেভিড লেভি অবশ্য ঘটনাটা যে ঘটতে যাচ্ছে তার আঁচ পেয়েছিলেন বছরখানেক আগেই। তাঁরা দু'জন বিখ্যাত হয়েছিলেন অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলো ধূমকেতু আবিষ্কার করে। তবু ১৯৯৩ সালের মে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরে কাজ করতে করতে তাঁরা একদিন আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ব্যুরো থেকে যে খবর পেলেন তা রীতিমতো পিলে চমকে দেবার মতো। মাত্র দু'মাস আগে তাঁরা যে নতুন ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেছেন তাঁদের নাম জুড়ে তার নাম রাখা হয়েছিল শুমেকার-লেভি ৯; খবর হল এই ধূমকেতুটি ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে আছড়ে পড়বে বৃহস্পতি গ্রহের ওপর।

ছোটখাট একটা দূরবীন দিয়ে চাঁদের দিকে তাকালেও দেখা যাবে তার গায়ের ওপর আছে অনেক ছোটবড় খাদ। মহাকাশ থেকে অসংখ্য বস্তু চাঁদের ওপর আছড়ে পড়ে; তাদের আঘাতেই এসব খাদের সৃষ্টি। আসলে হয়তো চাঁদের জন্মই হয়েছে পৃথিবীর তরুণ বয়সে মহাকাশ থেকে মঙ্গলের মতো আকারের কোন বস্তু এসে তার গায়ে জোরে ধাক্কা মারার ফলে। চাঁদের গায়ে হাওয়া পানি নেই বলে সেখানে পৃথিবীর মতো ক্ষয়ের ব্যাপারটাও নেই; আর তাই চাঁদের গায়ে সংঘাতের চিহ্নগুলো অবিকৃত রয়েছে বহু কোটি বছর ধরে। পৃথিবীর ওপর ভূমিক্ষয় আর তলানি পড়ার কারণে এরকম আঘাতের চিহ্নগুলো সহজে মুছে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর আকার বড় বলে এর ওপর মহাকাশ থেকে এমন আঘাত এসেছে চাঁদের তুলনায় অনেক বেশি। আসলে পৃথিবী সৃষ্টির পর পর, অর্থাৎ ৩৯০ থেকে ৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ওপর পড়েছে বিপুল সংখ্যক ধূমকেতু; আর সম্ভবত তারাই পৃথিবীতে বয়ে এনেছে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এসব জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

তবে মহাকাশের বস্তুর আঘাতে পৃথিবীতে যে শুধু জীবন সৃষ্টিতে সুবিধে হয়েছে তা নয়। এর ফলে পৃথিবী থেকে প্রাণ হারিয়েও গিয়েছে অনেক। এমনি এক ঘটনা

ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে। সম্ভবত হ্যালির ধূমকেতুর চেয়ে কিছু বড় একটি বস্তু মেক্সিকোর উপকূলে এসে পড়ে। তাতে যে খাদের সৃষ্টি হয় তা চওড়ায় প্রায় ১৭০ কিলোমিটার; আর বিপুল পরিমাণ ধুলো আর পাথরের খণ্ড ছেয়ে ফেলে সারা আকাশ। সেগুলো যখন নেমে এল পৃথিবীর দিকে তখন পরস্পর গায়ে গায়ে ঘষা খেয়ে সেসব হয়ে দাঁড়াল গনগনে আগুনের গোলা। সারা পৃথিবীতে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন। তার পর পরই আবার আকাশ গাঢ় অন্ধকার হয়ে সূর্যের আলোর পথ গেল ঢেকে আর সারা পৃথিবীতে নেমে এল মেরুর শীতলতা। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে পৃথিবীর শিলাস্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। তাই গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবার বাড়তে লাগল পৃথিবীর তাপমাত্রা। এই যে তাপমাত্রা বাড়া, কমা, আবার কয়েক শতাব্দী ধরে তাপমাত্রা বেড়ে চলা এসবের ধাক্কায় পৃথিবীর ওপরকার ডাইনোসর এবং আরো বহু প্রাণিকুল ধ্বংস হয়ে গেল।

## ধূমকেতুর ভেঙ্গে পড়া

শুমেকার-লেভি ধূমকেতুর আবিষ্কার হয় খুব আকস্মিকভাবে। ১৯৯৩ সালের ২৩ মার্চ রাতে শুমেকার আর লেভি জ্যোতির্বিদ-জুটি পালোমার মানমন্দিরে ছোটখাট একটা দূরবীন দিয়ে আকাশে তাঁদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। দেখতে দেখতে আকাশ মেঘলা হয়ে গেল; মনে হল ঝড় উঠবে। তাই তাঁরা একটা প্রায় বাতিল ফিল্মে আকাশের গোটা কয়েক ছবি তুলে ফেললেন। দু'দিন পর তাঁরা সেই মেঘলা রাতের তোলা ছবি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন একটা অস্পষ্ট আলোর ছাপ; মনে হচ্ছে যেন একটা চ্যাপটা আকারের ধূমকেতু। পরে আরো শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা আসলে পাশাপাশি গোটা পাঁচেক ধূমকেতুর খণ্ড। যখন এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হল তখন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা তাঁদের দূরবীন দিয়ে এই ধূমকেতুটি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। স্ট্যানফোর্ড আর হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বললেন, আসলে এতে পুঁতির মালার মতো সাজানো আছে ২১টি ধূমকেতুর কেন্দ্র। আবিষ্কারকদের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হল শুমেকার-লেভি ৯ (সূর্যের কাছাকাছি কক্ষপথ এমন আরো আটটি ধূমকেতু তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অল্প কিছুদিন আগেই, তাই এই ৯ সংখ্যা)।

সাধারণত একেকটা ধূমকেতু হয় কয়েক কিলোমিটার চওড়া পাথর, ধুলো আর বরফের পিণ্ড; তাতে জৈব অণুও থাকে। এরা বিশাল লম্বা উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারপাশে ঘোরে। সূর্যের কাছাকাছি এলে সূর্যের তাপে ধূমকেতুর গা থেকে বরফ বাষ্প হয়ে উঠে যায়, ছাড়া পায় বিপুল ধুলোর পুঞ্জ; সেটা সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়ে সৃষ্টি করে ধূমকেতুর মাথা। বেশ কিছু ধুলোর পাঁজা সূর্যের আলোকরশ্মির চাপে ছড়িয়ে পড়ে হয় ধূমকেতুর আলোকিত লেজ।

কিছুদিনের মধ্যে বোঝা গেল শুমেকার লেভি-৯ ধূমকেতু হলেও আসলে সেটা ঘুরছিল বৃহস্পতির আশপাশে। মনে হয় এক সময় এর কক্ষপথ শুরু হত নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে থেকে আর অতি উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পাক খেতে কেটে যেত কয়েক হাজার বছর। কোন কারণে এর কক্ষপথ ছোট হতে হতে এটা মোটামুটি দশ বছরে সূর্যকে একবার পাক দিতে থাকে। সম্ভবত ১৯২৯ সালের দিকে এটা বৃহস্পতির চাঁদে পরিণত হয়ে তার চারপাশে ঘোরা শুরু করে। অবশেষে ১৯৯২-এর জুলাই মাসে বৃহস্পতির বেশ কাছে এসে পড়ায় এই বিশাল গ্রহের আকর্ষণে এটা ভেঙ্গে ২১টি খণ্ড হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন শুমেকার-লেভির কক্ষপথ যেরকম বিপজ্জনকভাবে বৃহস্পতির কাছাকাছি এসে পড়েছে তাতে এর খণ্ডগুলো কিছুদিনের মধ্যে বৃহস্পতির টানে তার ওপর আছড়ে পড়বে। সম্ভবত সেটা ঘটবে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে। কোন গ্রহের গায়ে এরকম একটি বড়সড় ধূমকেতু ভেঙ্গে পড়ার মতো ঘটনা মহাকাশে অতি বিরল। তাই সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে এই ঘটনা দেখার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ঠিক হল এই ঘটনার সময় পৃথিবীর সব বড় দূরবীন তাক করা হবে বৃহস্পতির দিকে। তার মধ্যে পড়ে মাউন্ট পালোমারের ৫ মিটার (২০০ ইঞ্চি) চওড়া হেল দূরবীন, হাওয়াইয়ের ১০ মিটার চওড়া কেক দূরবীন; স্পেন, চিলি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসানো আরো অনেক দূরবীন।

সেই সঙ্গে যোগ হল মাটি থেকে ৬০০ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে ঘুরপাক খাওয়া হাব্‌ল মহাকাশ দূরবীন (তার কিছুদিন আগেই শাট্‌ল-এ চড়ে নভশ্চররা হাব্‌লের প্রতিফলক আয়না সমাবেশ মেরামত করে এসেছেন)। বৃহস্পতির ওপর অনুসন্ধান চালাবার জন্য সেদিকে ছুটে চলেছিল গ্যালিলিও নভোযান; ঠিক হল তার দূরবীনও তাক করা হবে সংঘর্ষের সম্ভাব্য জায়গার দিকে। একটা আশঙ্কা ছিল যে, কিছু সংঘর্ষ ঘটবে বৃহস্পতির দিন-রাতের সীমানার ওপারে, কাজেই পৃথিবী থেকে সে সব দেখা যাবে না; কিন্তু হয়তো সে দৃশ্য ধরা পড়বে হাব্‌ল আর গ্যালিলিওর ক্যামেরায়।

১৬ জুলাই থেকে ছয় দিন ধরে ঠিক বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী বৃহস্পতির ওপর এই ধূমকেতুর খণ্ডগুলো পড়তে থাকল; আর পৃথিবীর বুকে বিস্ময়াবিষ্ট বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেসব সংঘর্ষের নাটকীয় দৃশ্য। কোন কোন সংঘাতের ফলে আগুনের হলকার চুড়ো লাফিয়ে ওঠে বৃহস্পতির অ্যামোনিয়া মেঘের ওপর তিন হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত; আর পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে এই সংঘর্ষের হলকাই বেশি উজ্জ্বল দেখায়। বড় খণ্ডগুলোর সংঘর্ষের দৃশ্য পৃথিবী থেকে সাধারণ দূরবীন দিয়েই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সম্ভবত বড়সড় খণ্ডগুলো চওড়া ছিল এক বা দু'কিলোমিটার; আর সংঘাতের ফলে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা কয়েক লাখ বড় আকারের হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সমান।

## সাইবেরিয়ায় রহস্যময় বিস্ফোরণ

এমনি আরেক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল সাইবেরিয়ার উত্তরে তুঙ্গুস্কা নদীর ধারে এক জন-বিরল গভীর বনে — ১৯০৮ সালের ৩০ জুন তারিখে। জায়গাটা বৈকাল হ্রদের কাছাকাছি শহর ইরখুটস্ক থেকে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার (৫৯০ মাইল) উত্তরে। মেরুবৃত্তের কাছাকাছি এই চিরহিম বনাঞ্চলে বাস করে হাজার হাজার বলগা-হরিণ আর অল্প কিছু তুঙ্গুস উপজাতির লোক।

ঘটনার দিন স্থানীয় সময় সকাল সাতটায় কাছাকাছি এলাকার চাষী, শিকারী আর জেলেরা চমকে উঠল দূরে অসংখ্য কামানের গর্জনের মতো প্রচণ্ড শব্দে। আকস্মাৎ আকাশ দিয়ে ছুটে গেল যেন সূর্যের চেয়ে বড় অতি উজ্জ্বল এক অগ্নিপিণ্ড। এরপরই তুঙ্গুস্কা নদীর ধারে ভানাভারা গ্রামের লোকেরা দেখল উত্তরের দিগন্ত থেকে ওপর দিকে ব্যাঙের ছাতার আকারের বিশাল এক তীব্র আলোর ফোয়ারা। এই গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল, আগুনের তাত এত বেশি ছিল যে, মনে হচ্ছিল তার পিঠের জামায় আগুন ধরে গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ভানাভারা গ্রাম প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। এমনি আলোর ঝলক দেখা গেল শত শত কিলোমিটার দূর থেকেও। আগুনের হলকায় বহু দূর পর্যন্ত গাছপালা ঝলসে ছাই হয়ে গেল। কোথাও কোথাও বনে জ্বলে উঠল দাবানল।

ঘটনার পর পরই আশপাশের বহুদূর পর্যন্ত এলাকা দিয়ে বয়ে গেল এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। প্রবল হাওয়ার তোড়ে ভেঙ্গে পড়ল গাছপালা, উড়ে গেল বাড়ির চাল, ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ল ঘরের জানালা। মাটির কাঁপুনি ধরা পড়ল দূরপ্রাচ্য আর ইউরোপের ভূকম্প-কেন্দ্রগুলোতে। বিস্ফোরণের হাওয়ার কাঁপন ধরা পড়ল লণ্ডনে এমন কি ওয়াশিংটনেও। প্রচণ্ড তাপে মুহূর্তের মধ্যে জমাট বরফ গলে যাওয়ায় কাছাকাছি আঙ্গারা এবং অন্যান্য নদীর পানি ফুলে উঠল বিশাল ঢেউ তুলে। এরপর বেশ কদিন ধরে প্যারিসে কৃষ্ণপক্ষের রাতেও লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ত খবরের কাগজ আর মস্কোয় দুপুর রাতেও তোলা চলত আলোকচিত্র।

সে সময়ে সাইবেরিয়ার দুর্গম তাইগা অঞ্চলের সঙ্গে সভ্য জগতের প্রায় কোন যোগাযোগই ছিল না। এই আশ্চর্য আলোর খবর নিয়ে তুঙ্গুস উপজাতির মধ্যে নানা রকম লোকগাথা আর কল্পকাহিনীর জন্ম হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে বিশাল এলাকা জুড়ে বিধ্বস্ত বনাঞ্চলে এই ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের ওপর গজাতে লাগল আগাছা আর ঘাস। ১৯২১ সালে লেনিনগ্রাদের খনিজবস্তু জাদুঘরের বিজ্ঞানী লিওনিদ কুলিক সাইবেরিয়ার এক পুরনো স্থানীয় পত্রিকা থেকে কি করে একদিন জানতে পেলেন এই আশ্চর্য আলোর খবর। নতুন সোভিয়েত সরকার তখন অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ আর গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত হলেও এই ঘটনার রহস্য সন্ধান করার একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য সরকারী বরাদ্দ পাওয়া গেল।

কুলিকের নেতৃত্বে অভিযাত্রী দল একদিন লোকালয় থেকে বহুদূরে তুঙ্গুস্কার বনাঞ্চলে এসে পৌছলেন। কিন্তু আসল ঘটনাস্থল খুঁজে বের করা শক্ত হল। হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে তাইগার দুর্গম বন। তাতে আছে অসংখ্য জলা, হিংস্র নেকড়ে, ভয়ংকর মশা। সেই বনে আগুনের দূরন্ত দেবতা 'অগদি'র অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে প্রচণ্ড এক আগুনের গোলা আর সেই সঙ্গে বিরাট ধ্বংসলীলা। ভয়ে স্থানীয় লোকেরা কেউ সেদিকে যেত না। তাঁবু, কম্বল, রসদ, যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে কোথাও ঘোড়ায় চেপে, কোথাও পায়ে হেঁটে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে, নানা আধিব্যাধির সঙ্গে লড়ে কুলিক বছরের পর বছর অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারির তীব্র শীতে এক বিজন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য। উত্তরের দিকে বিশাল এলাকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ গাছ মাটিতে লুটিয়ে আছে — যেন দিগন্ত জোড়া এক বিরাট কুড়ালের একটি মাত্র কোপ সবগুলোকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। বিশাল সব পাইন, বার্চ, ফার এসব চিরহরিৎ গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে। কিন্তু কুলিকের সঙ্গে যে তুঙ্গুস উপজাতীয় গাইড ছিল সে কিছুতেই সেদিকে যেতে রাজি হল না; তাই তাঁকে সেবারের মতো ফিরে আসতে হল ভানাভারায়। পরের বছর কুলিক ক'জন সহযাত্রী নিয়ে আবার হাজির হলেন সেখানে। আশপাশের জায়গা ভালমতো জরিপ করে দেখা গেল বিশাল এলাকা জুড়ে ওপড়ানো গাছগুলোর গোড়া যেন একটা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ফেরানো। কুলিক বুঝলেন তাঁরা এক বিরাট বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে এসে হাজির হয়েছেন।

তারপর তাঁরা আরো বহুবার এলেন এই জায়গায়। মাপজোখ থেকে ধ্বংসকাণ্ডের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। পঁচিশ কিলোমিটার চওড়া জায়গা জুড়ে গাছপালা উপড়ে পড়েছে। তার মধ্যে বিস্ফোরণের প্রবল তাপে ঝলসে ছাই হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রস্থলের পনের থেকে আঠার কিলোমিটার পর্যন্ত সব গাছপালা। কুলিক অনুমান করলেন সম্ভবত একটি বিশাল উল্কাখণ্ড পড়ার ফলেই এই ধ্বংসকাণ্ডের সৃষ্টি। কিন্তু বড় আকারের উল্কাপিণ্ড পড়লে সেখানে বড়সড় খাদ সৃষ্টি হবার কথা। এমন খাদের আশপাশে উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষও থাকার কথা। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে অঞ্চলে ছোট কিছু খাদ আর বড় জলা ছাড়া তেমন বড় খাদের হদিস পাওয়া গেল না। বহু টন মাটি খুঁড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উল্কাপিণ্ডের অবশিষ্ট সামান্য একটি খণ্ডও কোথাও মিলল না।

১৯৩৮-৩৯ সালে আরো ভাল করে জরিপ চালাবার জন্য বিমান থেকে এলাকাটির ছবি নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নাৎসী জার্মানি হামলা চালাল সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর। কুলিকও সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হল।

## কী এ আগন্তুক বস্তু

১৯৫৮ সাল থেকে আবার শুরু হল তুঙ্গুস্কার দিকে নানা বিজ্ঞানী দলের নিয়মিত অভিযাত্রা। তাঁদের একদল বললেন, আসলে তুঙ্গুস্কায় পড়েছিল মহাকাশ থেকে ছিটকে আসা এক বিশাল ধুলোর পিণ্ড – হয়তো কোন ধূমকেতুর কেন্দ্রবস্তু। সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ভূতত্ত্ববিদ কিরিল ফ্লোরেন্স্কির নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দল জায়গাটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে বললেন, সেখানে যা পড়েছিল সেটি একটি উল্কাপিণ্ডই, তবে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে মাটিতে নয়, হাওয়ায়। এই উল্কাপিণ্ডের পাথুরে অবশেষ বের করার জন্য পুঙ্খপুঙ্খ সন্ধান চালানো হল, কিন্তু আশপাশে কোথাও উল্কাপিণ্ডের কোন চিহ্ন মিলল না।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি ভাসিলি ফেসেনকভ এই বিজ্ঞানী দলের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি বললেন, সাধারণ উল্কাপিণ্ড বা এমনকি অসাধারণ বড় উল্কাপিণ্ডও এ ধরনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে বলে বিশ্বাস করা শক্ত। খুব সম্ভব আগন্তুক পিণ্ডটি ছিল ছোটখাট ধূমকেতুই; এর ব্যাস ছিল মাত্র কয়েক কিলোমিটার আর ওজন ছিল কয়েক লক্ষ টন। আর সেটি বিস্ফোরিত হয়েছিল মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার উঁচুতে। কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলে বিশাল পুচ্ছের কারণে সচরাচর বেশ আগে থেকেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কোন রকম আগাম সংকেত না দিয়ে এভাবে একটি ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ কি করে ঘটতে পারে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

সাইকেলের চাকার শিক যেমন কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তুঙ্গুস্কায় গাছগুলো ভেঙ্গে পড়েছে অনেকটা সেভাবে। অবশ্য তার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হল: আসলে হাওয়ায় ঘাত পড়েছে দু'বার। একবার যখন আগন্তুক বস্তু প্রচণ্ড বেগে ঢুকেছে হাওয়ার স্তরে, দ্বিতীয়বার যখন বিস্ফোরণ ঘটেছে কেন্দ্রস্থলের ঠিক ওপরে। এসব হিসেব-নিকেশ কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে আগন্তুক বস্তুর শেষ পর্যায়ের বেগ পাওয়া গেল প্রতি সেকেণ্ডে এক থেকে দু' কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা বললেন, এত কম বেগে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলে হাওয়ার ঘষায় এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি হবার কথা নয়।

কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় কার্বন বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে বললেন, খুব সম্ভব মহাকাশ থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল এক প্রতিপদার্থের পিণ্ডের। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে পদার্থ আর প্রতিপদার্থের পারস্পরিক বিনাশ ঘটেছে, আর তাতেই উদ্ভব ঘটেছে এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শক্তির। তিরিশের দশকে প্রতিপদার্থের কল্পনা প্রথম করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী পি. এ. এম. ডিরাক। সাধারণ পদার্থের পরমাণুতে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত কেন্দ্র আর তার

চারপাশে ঘোরে নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা। ডিরাক বললেন মহাকাশে এমন বস্তুও থাকা সম্ভব যার পরমাণু-কেন্দ্র নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, আর তার চারপাশে ঘুরছে পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত পজিট্রন কণিকা। একেই বলা হল প্রতিপদার্থ। বিলেতের বনেদি বিজ্ঞান পত্রিকা 'দ্য নেচার'-এ বেরলো তুঙ্গুস্কার বিস্ফোরণের এই নতুন ব্যাখ্যা, আর তা নিয়ে সৃষ্টি হল এক নতুন চাঞ্চল্য। ফ্লোরেন্স্কি বললেন এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরণের পর সে এলাকায় তেজস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই।

প্রায় চার দশক ধরে প্রায় প্রতি বছরই বিজ্ঞানীদের নিয়মিত অভিযান চলল তুঙ্গুস্কা এলাকায়। এসব অভিযানে যোগ দিলেন ভূতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, জীব-বিজ্ঞানী ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ। ১৯৭৬ সালে এমনি এক বিশেষজ্ঞ দল সেখানকার জলার তলায় পীট কয়লার ভেতর পেলেন অতি সূক্ষ্ম সিলিকেট কণা। তাকে বিশ্লেষণ করে কিছু বিরল মৌল ও ভারি ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেল। তাতে অ্যালুমিনিয়াম আর জিঙ্ক অক্সাইড পাওয়া গেল উচ্চ মাত্রায়। সাধারণ উল্কাপিণ্ডে সচরাচর এমন দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা বললেন, এসব কোন ধূমকেতুপিণ্ডের অবশিষ্ট হওয়া সম্ভব।

কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ঐ এলাকার পীট কয়লা বিশেষ ধরনের উচ্চ-তাপ চুল্লিতে বিশ্লেষণ করে তাতে অসংখ্য অতি কঠিন কাল রঙের সূক্ষ্ম কণা পেলেন; দেখা গেল সেগুলো ছোট ছোট হীরার খণ্ড। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, মহাকাশের আগন্তুক কোন বুদ্ধিমান জীবের নভোযান নয়, প্রতিপদার্থ অথবা খুদে 'ব্ল্যাক হোল' (কৃষ্ণবিবর) নয়, এমনকি ধূমকেতুর পিণ্ডও নয়, আসলে তুঙ্গুস্কার বিস্ফোরণ একটি উল্কাপিণ্ড থেকেই ঘটেছিল। হীরার কণায় তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪-এর মাত্রা থেকে হিসেব করে বলা হল উল্কাপিণ্ডটির মোট ভর ছিল অন্তত চার হাজার টন। বিজ্ঞানীরা বলেন, গড়পড়তা প্রতি একশ' বছরে এমন বড় আকারের উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়ে; তবে সচরাচর এসব পড়ে বিজন সাগর-মহাসাগরে, তাই তার কথা মানুষ জানতে পায় না।

কিন্তু এটা যদি উল্কাপিণ্ড হবে তাহলে অ্যারিজোনায় বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় উল্কাপাতের ফলে যেমন বিরাট খাদের সৃষ্টি হয়েছে তেমন কোন খাদ তুঙ্গুস্কায় পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এর জবাবে কিয়েভের বিজ্ঞানীরা বলছেন, সচরাচর উল্কাপিণ্ড হয় ধাতব লোহার পিণ্ড। এটা ধাতব পিণ্ড না হয়ে ছিল এক বিরাট পাথরের চাঁই, তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘষায় মাটিতে পড়ার আগেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার সূক্ষ্ম ভস্মকণা ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে। এই উল্কাখণ্ডটি কোথা থেকে এল সে সম্পর্কেও কিছুটা অনুমান করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে এটা 'এঙ্কের ধূমকেতু' থেকে ছিটকে পড়া একটা খণ্ড।

এঙ্কের ধূমকেতু মোটামুটি সোয়া তিন বছর পর পর পৃথিবীর কাছাকাছি আসে। এর গা থেকে ছিটকে পড়া বেশ কিছু খণ্ড ছড়িয়ে আছে সৌরজগতে। প্রতি বছর জুন মাসের শেষে পৃথিবী এই আবর্জনার স্তূপ পেরিয়ে যাবার সময় আকাশে উল্কাবৃষ্টি ঘটতে দেখা যায়। তুঙ্গুস্কার ঘটনাটিও ঘটেছিল জুন মাসের শেষেই।

## বার বার জীব-বিলুপ্তি

পৃথিবীর ওপর যে মহাকাশ থেকে মাঝে মাঝে বড় ধরনের হামলা এসে পড়ে তার আরেক প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন সত্তরের দশকের শেষে। ১৯৭৭ সালে মার্কিন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ লুই আলভারেজ (Louis Alvarez)-এর ছেলে ওয়াল্টার আলভারেজ পড়াশোনা করতে এলেন বাবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে। বাবার জন্য নিয়ে এলেন ইতালিতে বেড়াতে গিয়ে পাওয়া এক অদ্ভুত উপহার: ইতালির গুব্বিও নামে জায়গার পাহাড় থেকে কেটে আনা একখণ্ড পাথর — তার ভাঁজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা আশ্চর্য রঙিন স্তর।

পাথরটাতে ছিল তিনটে স্তর। সবচেয়ে নিচে চুনাপাথরের স্তরে ছিল ছোট এককোষী প্রাণী ফোরামিনিফেরার ফসিল। ওপরের স্তরেও ছিল চুনাপাথর। এই দুই স্তরের মাঝখানে আধ ইঞ্চি পুরু কালো রঙের একটা কাদার স্তর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল ওপরের দুটি স্তরে অতি ক্ষুদে ফোরামিনিফেরা ছাড়া আর কোন প্রাণীর ফসিল ছিল না। হিসেব করে দেখা গেল এই স্তরটা জমেছিল ৬.৫ কোটি বছর আগে। তাহলে কি এই সময়ে এমন কিছু ঘটেছিল যাতে ফোরামিনিফেরা ছাড়া আর সব প্রাণী পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল? এই সময়টাকে ভূতত্ত্ববিদগণ নাম দিয়েছেন ক্রেটেশাস-টার্শিয়ারি ভেদরেখা (Cretacious-Tertiary Boundary)।

লুই আলভারেজের একটা সমস্যা হল ওই কাদার স্তর তৈরি হতে কতদিন লেগেছে সেটা হিসেব করে বের করা। তারপর ওতে এত ইরিডিয়াম কোথা থেকে এল তার হদিস করা। ১৯৭৮ সালে এই স্তরটিকে পারমাণবিক ক্রিয়াকরে নিয়ে পরীক্ষা করা হল তার ওপর নিউট্রন কণার ধারা বর্ষণ করে। এই পরীক্ষায় ইরিডিয়াম থেকে বেরোয় গামা রশ্মি; তা থেকে ইরিডিয়ামের পরিমাণ জানা যায়। দেখা গেল, অবাক কাণ্ড! এই স্তরে ইরিডিয়াম আছে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ত্রিশগুণ বেশি। লুইয়ের কাছে মনে হল এই ইরিডিয়াম হয়তো এসেছে কোন অতিনবতারার বিস্ফোরণ থেকে; আর সেই বিস্ফোরণের কারণেই পৃথিবীতে সব ডাইনোসরের প্রায় একই সময়ে বিলুপ্তি ঘটেছে। তারপর পরীক্ষা করে দেখা হল ওই স্তরে প্লুটোনিয়াম-২৪৪ আছে কি নেই। সত্যি সত্যি প্লুটোনিয়াম ২৪৪ পাওয়া গেল। অতিনবতারার বিস্ফোরণের কারণেই যে ডাইনোসরদের মৃত্যু ঘটেছে সে ধারণা এতে আরো জোরালো হল ।

অবশ্য আরেক সম্ভাবনা হল আসলে পৃথিবীর ওপর ওই সময়ে এসে পড়েছিল বিরাট এক গ্রহাণু। গ্রহাণু কয়েক কিলোমিটার থেকে হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। এদের বেশিরভাগই সূর্যের চারপাশে ঘোরে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি কক্ষপথে; তবে কিছু কিছু পৃথিবীর খুব কাছাকাছিও চলে আসে। এদের থেকেই বেশিরভাগ উল্কাখণ্ডের উৎপত্তি; এদের বুকেও কখনো কখনো থাকে প্রচুর ইরিডিয়াম। লুই আলভারেজ হিসেব করে বললেন পৃথিবীর ওপরের স্তরে যে পরিমাণ ইরিডিয়াম পড়েছে তাতে গ্রহাণু চওড়া হবার কথা ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার। গ্রহাণুটি যদি গোলাকার আর পাথুরে হয়ে থাকে তাহলে তার ভর ছিল মোটামুটি $১০^{১২}$ টন। সেটা মহাকাশ থেকে হাওয়ার স্তর পেরিয়ে এসেছে ঘণ্টায় এক লক্ষ কিলোমিটার বেগে; তাতে পৃথিবীর ওপর তার ধাক্কা লেগেছে $১০^{৭}$-টি হাইড্রোজেন বোমার সমান শক্তির।

তিন বছর পর ১৯৮০ সালের জুন মাসে আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা Science-এ আলভারেজের আবিষ্কারের কথা প্রথম প্রকাশিত হল। তাঁর সেই লেখায় গুব্বিওর পাথর ছাড়াও তার থেকে বহু দূরে ডেনমার্কের একটি পাথরের স্তরের বিশ্লেষণ দেয়া হল; সে পাথরেও একই ধরনের অতিরিক্ত মাত্রায় ইরিডিয়াম রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ আর প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকে এই লেখা পড়ে রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন। চারদিকে সমালোচনার ঝড় বইল। একটা সমালোচনা হল ভূতত্ত্বের পরীক্ষা থেকে দেখা যায় ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক বছরে নয়, সম্ভবত বহু শত বা বহু হাজার বছর ধরে। ভূতত্ত্ব থেকে সময়ের হিসেব অত নিখুঁতভাবে দেওয়াও খুব কঠিন। তাছাড়া আলভারেজ যে একটি মাত্র গ্রহাণু পড়ার কথা বলছেন, আসলে হয়তো বহু হাজার বছর ধরে হাজার হাজার গ্রহাণু এসে পড়েছে পৃথিবীতে আর তার মিলিত ফলেই ডাইনোসর এবং অন্যান্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে।

কেউ কেউ বললেন, হয়তো গ্রহাণু নয়, অসংখ্য আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণে আকাশ অন্ধকার হয়ে উদ্ভিদকুলের মৃত্যু ঘটেছে আর তারই পরোক্ষ ফল হিসেবে ডাইনোসরদের মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য আলভারেজ এসব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ ঘটলে তাতে ক্রেটেশাস-টার্শিয়ারি ভেদরেখার মতো এমন স্তর সৃষ্টি হবে না। সারা পৃথিবীতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ৮০টির ওপর জায়গায় এরকম ভেদরেখার হদিস পাওয়া গিয়েছে, আর তাদের সময়কাল মোটামুটি একই। এসবের ব্যাখ্যা একমাত্র গ্রহাণুর সংঘাত দিয়েই করা যায়। ১৯৮৮ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড অ্যাণ্ডার্স (Edward Anders) এবং আরো অনেকে নানা দেশে এই ভেদরেখার সময় ৬.৫ কোটি বছর আগের স্তরে বিপুল ভুসার হদিস পেলেন। তাঁরা বললেন, মনে হচ্ছে ওই সময়ে ইরিডিয়াম ছাড়াও প্রচুর নিকেলও এসে

পৃথিবীতে পড়েছিল; সেগুলো গাছপালার মাধ্যমে ঢোকে নানা রকম প্রাণীর খাদ্যশৃঙ্খলে; তাতেও ডাইনোসর এবং অন্যান্য প্রাণী মারা পড়তে পারে।

খোঁজ করতে করতে মেক্সিকোর দক্ষিণে ইউকাতান উপদ্বীপের উত্তরে মেক্সিকো উপসাগরের কিনারে পাওয়া গেল এক বিশাল খাদের চিহ্ন; সম্ভবত এখানেই এসে পড়েছিল সেই বিশাল গ্রহাণু। এই খাদটি ১৮০ কিলোমিটার চওড়া। এত বড় খাদ গ্রহাণুর আঘাত ছাড়া আর কোনভাবে তৈরি হওয়া শক্ত।

আজ দেখা যাচ্ছে গত পঞ্চাশ কোটি বছরে পৃথিবীতে এ ধরনের জীববিলুপ্তি আরো বহুবার ঘটেছে। বড় ধরনের বিলুপ্তিও ঘটেছে অন্তত পাঁচবার। ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর নানা এলাকায় এই পঞ্চাশ কোটি বছরের সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন শ'খানেক খাদের হদিস পেয়েছেন। পঁচিশ কোটি বছর আগে পার্মিয়ান যুগের শেষে এমনি এক বিলুপ্তিতে পৃথিবীর সামুদ্রিক জীবদের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং স্থলভাগের জীবদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে সেটার প্রধান কারণ হয়তো ছিল প্রবল আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ; তার ফলে প্রচুর লাভা আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরোয়, সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যায়। তাতেই বেশিরভাগ জীবের মৃত্যু ঘটে।

অনেকে বলছেন পৃথিবীতে ২৬ কোটি বছর পর পরই বড় ধরনের জীববিলুপ্তি ঘটছে— তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। একটা তত্ত্ব হল সূর্য তার গ্রহজগৎ নিয়ে ছায়াপথ গ্যালাক্সির চারপাশে ঘুরছে ২৫ কোটি বছরে একবার; গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য গ্যালাক্সির তলে কিছুটা ওপর-নিচে ওঠা-নামাও করে — তার ফলে সূর্য তিন কোটি বছর পর পর সবচেয়ে ঘন ধুলো-পাথরের এলাকার মধ্য দিয়ে যায়। সৌরজগতের চারপাশে রয়েছে ঊর্ট মেঘমালা নামে এক ঘন বস্তুপুঞ্জ, সেখানে রয়েছে অসংখ্য ধূমকেতুর বীজ। গ্যালাক্সির ঘন এলাকার মধ্য দিয়ে যাবার সময় ঊর্ট মেঘমালার স্থিতি নষ্ট হয়; তাতেই তিন কোটি বছর পর পর বিপুল পরিমাণ বস্তুখণ্ডের বর্ষণ ঘটে পৃথিবীতে। আর তাতে পৃথিবীর জলবায়ুতেও ঘটে বিরাট রকম ওলট-পালট।

## আবার যদি আঘাত আসে

এমন এক উল্কাখণ্ড বা আর কোন মহাকাশের বস্তু পৃথিবীর ওপর আবার কি এসে পড়তে পারে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ, খুব পারে। গ্রহাণু, উল্কা, ধূমকেতু অথবা কোন ধ্বংস হয়ে যাওয়া নভোযানের খণ্ড পৃথিবীর ওপর পড়ার সম্ভাবনা বিলক্ষণ আছে। আদতে মহাকাশ থেকে প্রতিদিন প্রায় বিশ টন ওজনের বস্তু পৃথিবীর ওপর এসে পড়ছে – এর প্রায় সবই বালির দানার মতো ছোট, তাই এরা মাটিতে পড়ার আগেই বাতাসের ঘষায় ছাই হয়ে যায়। তবে ছোটখাট কয়লার টুকরোর মতো খণ্ডও প্রতি বছর অনেক এসে পড়ে। মোটর গাড়ি বা ট্রাকের আকারের গ্রহাণু

পৃথিবীতে এসে পড়ে অন্তত প্রতি দশকে একটি; তবে এগুলো এত বেগে আসে যে, বায়ুমণ্ডলের ঘষাতেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

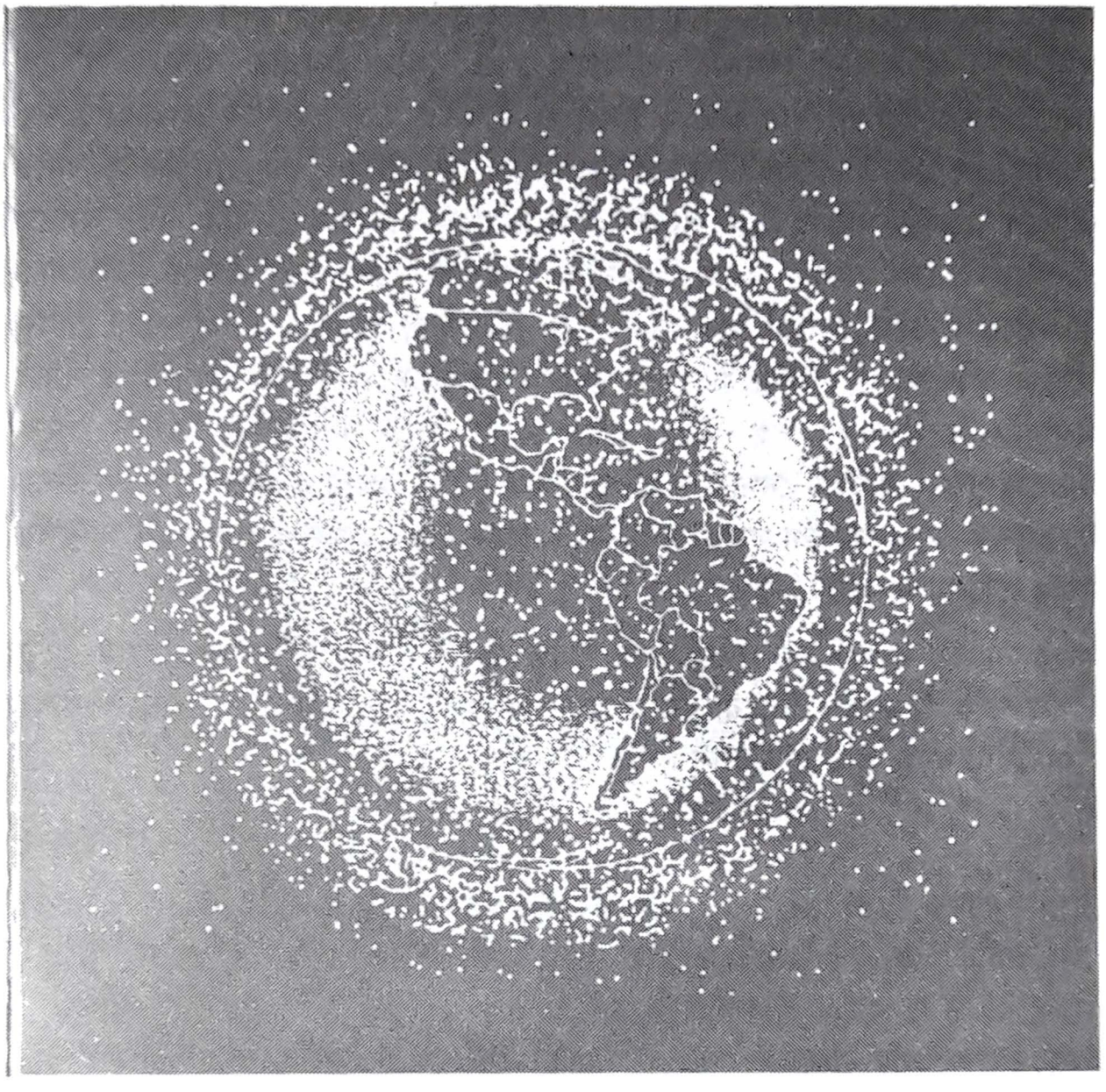

আকাশের বহু উঁচু দিয়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে মানুষের তৈরি সাত-আট হাজার বস্তু। এর মধ্যে শ'চারেক চালু কৃত্রিম উপগ্রহ; বাকিগুলি অকেজো নভোযান, বা তার অংশবিশেষ। এসব কখনো ভেঙ্গে পড়ে পৃথিবীতে-সচরাচর বিজন সাগরে-প্রান্তরে।

সৌরজগতে মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝামাঝি কক্ষপথে যে অসংখ্য গ্রহাণু তাদের মধ্যে কখনো ঠোকাঠুকি হয়ে দু'চারটি ছিটকে আসে পৃথিবীর দিকে। তার বেশিরভাগ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পড়তে পড়তে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; কখনো মাটিতে পড়ে বিশাল খাদ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন এক থেকে চার হাজার গ্রহাণুর কক্ষপথ কখনো কখনো পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে এসে পড়ে; তাদের অনেকগুলো চওড়ায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি। এদের কোনটা যদি পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে তাহলে পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এছাড়া আছে আরেক বিপদ। সূর্যের চারপাশে লম্বা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে দুশ' বছরের কম সময় পর পর পৃথিবীর কাছাকাছি এলাকায় চলে আসে এমন ধূমকেতুর সংখ্যাও শ' দুই। এদের মধ্যে একটি হল সুইফ্‌ট্‌-টার্টল্‌ ধূমকেতু। এটি তার বিশাল লম্বা পথে ১৩৪ বছরে একবার সূর্যের চারপাশে ঘোরে। এর আগের বার ১৯৯২ সালে ৭ নভেম্বর এটা পৃথিবীর কাছাকাছি পথ (অর্থাৎ ১৭ কোটি কিলোমিটার দূর দিয়ে) পেরিয়ে গেছে ; আবার পৃথিবীর কাছে আসবে ২১২৬ সালের ১৪ আগস্ট। কেউ কেউ বলছেন সেবার এটা আসবে পৃথিবীর আরো অনেক কাছে; এমনকি পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা খাবার সম্ভাবনাও একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্য বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ হিসেবটা তেমন বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে বড় রকম হামলা আসবার সম্ভাবনা একেবারে নেই তাও বলা শক্ত। তাই বিজ্ঞানীরা এখন থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছেন। তার মধ্যে রয়েছে দূরবীন দিয়ে আকাশের দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখা, যেন কোন রকম হামলার সম্ভাবনাই মানুষের নজর এড়িয়ে না যায়।

নজর না হয় রাখা গেল। তবু শেষ পর্যন্ত যদি মহাকাশের হামলা এসেই পড়ে তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা কি হবে সে সমস্যার কোন কার্যকর সমাধান এখনও পাওয়া যায় নি।

# শেষের সেদিন আসবে যখন

আমাদের চারপাশে এই যে বিশাল বিপুল মহাবিশ্ব — এটা কখন কিভাবে শুরু হয়েছিল, এ কি চিরকাল এভাবেই চলতে থাকবে নাকি এর একদিন ধ্বংস ঘটবে, ঘটলে তা কিভাবে হবে — এসব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে চিরকাল। এতকাল এ ধরনের প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না, তার কারণ মহাবিশ্বের কথা মানুষ জানতই বা কতটুকু! এই বিশ শতকে এসে এর নানা রহস্য অবারিত হয়েছে; মানুষ এমন আশ্চর্য সব কথা জানতে পেরেছে যা আগে তার কল্পনার একেবারে বাইরে ছিল।

প্রাচীন গ্রিকরা ভাবত ছায়াপথ হল দেবী হেরার বুক থেকে ছিটকে ওঠা দুধ। গ্রিক ভাষায় দুধ হল গ্যালা; সেই থেকে গ্যালাক্সি শব্দটা এসেছে। সতের শতকের শুরুতে গ্যালিলিওর দূরবীনের ভেতর দিয়ে ছায়াপথের ভেতরকার বিপুল তারার সমাবেশের ছবি মানুষের কাছে প্রথম ফুটে উঠল। ১৭৮৪ সালে উইলিয়াম হার্শেল ছায়াপথের নানা দিকে তারার সংখ্যা গুণে বললেন গ্যালাক্সির আকার অনেকটা যেন যাঁতাকলের মতো; তার আবার একদিকে যতটা লম্বা অন্যদিকে লম্বা তার পাঁচভাগের একভাগ। আর আমাদের সূর্য আছে এই গ্যালাক্সির মাঝামাঝি জায়গায়।

১৯১৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসের বাইরে মাউন্ট উইলসনে সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০০-ইঞ্চি দূরবীন নিয়ে কাজ করছিলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ হার্লো শ্যাপলি (Harlow Shapley)। তিনি দেখলেন গ্যালাক্সি আগে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে আসলে ঢের ঢের বড় আর সূর্য তার কেন্দ্রের ধারেকাছেও নেই। তখনকার হিসেবে আমাদের গ্যালাক্সিই ছিল মহাবিশ্ব; তার বাইরে আর কিছুর কথা কারো মাথায় আসে নি। প্রায় চারশ বছর আগে কোপার্নিকাস পৃথিবীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে; এবার শ্যাপলি সূর্যকেও সরিয়ে দিলেন তার কেন্দ্র থেকে।

তারপর জানা গেল আমাদের গ্যালাক্সিই পুরো মহাবিশ্ব নয়। ১৯২৪ সালে এডউইন হাব্‌ল (Edwin Hubble) মাউন্ট উইলসনের দূরবীন দিয়ে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির তারাদের পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তিনি এই গ্যালাক্সিতে শেফালি বিষম তারা খুঁজে পেলেন, তার ফলে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব মাপা সম্ভব হল ; তাতে বোঝা গেল এরা আমাদের গ্যালাক্সির অংশ নয়, রয়েছে আর এক গ্যালাক্সিতে। আর তখনই প্রথম জানা গেল আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে আরো গ্যালাক্সি আছে, আছে আরো তারাজগৎ।

এক আলোক-বছর দূরত্বের কথা আমরা জেনেছি। ধরা যাক এক আলোক-বছর লম্বা, চওড়া আর উঁচু একটা এলাকা; অর্থাৎ এক আলোক-বছর ঘনক — সে বিশাল এক জায়গা। তার ভেতর ধরে যাবে সূর্য, সব গ্রহ-উপগ্রহ, লাখ খানেক গ্রহাণু আর প্রায় এক লাখ কোটি ধূমকেতু নিয়ে সমগ্র সৌরজগৎ। কিন্তু সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় সে যেন একটি অতি ছোট বালির কণা। বিজ্ঞানীরা আজ যে মহাবিশ্বের খবর জেনেছেন তার আয়তন $১০^{১১}$ অর্থাৎ একশ কোটি কোটি কোটি কোটি ঘন আলোক-বছর। আর এই মহাবিশ্বে রয়েছে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতো অন্তত ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি।

এই বিশাল মহাবিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে যে কোন এক আলোক-বর্ষ ঘনক এলাকা যদি বেছে নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে শতকরা নিরানব্বইভাগ সম্ভাবনা হল সেখানে একেবারে কিছুই নেই — সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা। আসলে সমগ্র মহাবিশ্বই একটা অতিমাত্রায় ফাঁকা জায়গা; তার $১০^{১৮}$ বা ১০,০০০ কোটি কোটি ঘন আলোক-বছর এলাকায় আছে গড়ে একটি মাত্র গ্যালাক্সি, আর গড়ে $১০^{৯}$ বা একশ কোটি ঘন আলোক-বছরে আছে একটি মাত্র তারা। অবশ্য এসব তারা মহাকাশে সমানভাবে ছড়ানো নেই; কোথাও আছে ঘন হয়ে, কোথাও হালকাভাবে। তারারা ঘন হয়ে ছড়ানো আছে গ্যালাক্সিতে; আবার গ্যালাক্সিরা আছে বেশ কয়টি মিলে একসঙ্গে জোট বেঁধে। এসব জোটেরও ওপরে আছে আবার গ্যালাক্সিদের অতিজোট (supercluster)। মহাবিশ্বের বিশাল শূন্যতায় এসব অতিজোটরা যেন দ্বীপমালা। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মহাকাশে বিশাল সব সাবানের বুদ্‌বুদের মতো ফাঁকা জায়গার হদিস পেয়েছেন যেগুলো বহু কোটি আলোক-বছর পর্যন্ত ছড়ানো ; এসব বুদ্‌বুদের গায়ের কাছে ছড়ানো আছে অসংখ্য গ্যালাক্সির অতিজোট।

## মহাবিশ্ব ফেঁপে উঠছে

আজকের বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১,৫০০ কোটি বছর আগে বিশাল এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে; তার পর থেকে ফুলে উঠতে থাকা বেলুনের মতো সেটা কেবলই ফেঁপে উঠছে। তাতে প্রতি মিনিটে মহাবিশ্বের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে এক লক্ষ কোটি ঘন আলোক-বছর। ১৯১৬ সালে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে এই ফেঁপে ওঠার কথা প্রথম জানা যায়; কিন্তু এটা তখন এমনই অদ্ভুত মনে হয়েছিল যে আইনস্টাইন নিজেই সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বর্ণালিবীক্ষণ দিয়ে গ্যালাক্সিদের আলোর ডপলার সরণ পরীক্ষা করে দেখলেন একমাত্র আমাদের কাছাকাছি অ্যাণ্ড্রোমিডা এবং এরকম আরো কয়েকটি ছাড়া আর সব গ্যালাক্সির আলোই লালের দিকে সরেছে, অর্থাৎ তারা অতি বেগে দূরে ছুটে

চলেছে। কাজেই গ্যালাক্সিরা যে ক্রমাগত পরস্পর থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

তারপর দেখা গেল যে -গ্যালাক্সি যত দূরে সে যেন তত বেশি বেগে আরো দূরে ছুটে চলেছে। গ্যালাক্সিগুলো যেন বেলুনের গায়ে বসানো কতকগুলো ফুটকির মতো; বেলুন যেমন ফুলে উঠছে তেমনি ফুটকিগুলোর মধ্যেকার দূরত্বও বেড়ে চলেছে। এর যে কোন একটি ফুটকিতে দাঁড়িয়ে কেউ যদি দৃশ্যটা দেখে তাহলে মনে হবে তার চারপাশের সব ফুটকিই সরে যাচ্ছে দূরে। বেলুনটা যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে যে ফুটকিটা আছে এক ইঞ্চি দূরে সেটা সরে যাবে এক ইঞ্চি আবার যে ফুটকিটা দু'ইঞ্চি দূরে সেটা একই সময়ে সরে যাবে আরো দু'ইঞ্চি, তাই সেটার সরে যাবার বেগ হবে আগেরটার দ্বি'গুণ। আসলে মহাবিশ্বের আয়তনটাই বাড়ছে, তাই মনে হচ্ছে বুঝি তার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে গ্যালাক্সিগুলো। হাব্‌ল যখন তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন তখন বিজ্ঞানের জগতে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল। গ্যালাক্সির দূরত্বের সঙ্গে তার লাল সরণের অনুপাতের নিয়মটাকে নাম দেয়া হল হাব্‌ল-এর আইন।

যদি মহাবিশ্বের সব গ্যালাক্সি এভাবে ছুটে যাবে তাহলে গ্যালাক্সি জোটগুলো আর গ্যালাক্সিগুলো দল বেঁধে না থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে না কেন? জোট টিকে থাকার জন্য তাদের ভেতর যতটা বস্তু থাকা দরকার দেখা গেল আসলে আছে তার ত্রিশ ভাগের এক ভাগেরও কম। তার জবাবে বিজ্ঞানীরা বললেন আসলে গ্যালাক্সিদের ভেতরে যতটা বস্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে বস্তু আছে হয়তো তার দশগুণ; অর্থাৎ বাকি বস্তু রয়েছে অদৃশ্য হয়ে। আমাদের গ্যালাক্সিতে যত তারা আছে তার হিসেব থেকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ধরেছিলেন তার ভর হয়তো হবে $২ \times ১০^{১১}$ বা ২০,০০০ কোটি সূর্যের ভরের সমান; কিন্তু অদৃশ্য বস্তুর হিসেব ধরে এখন মনে হচ্ছে এই ভর হয়তো আসলে তার চেয়ে কয়েক হাজারগুণ বেশি হতে পারে।

মহাবিশ্ব যে এভাবে বিপুল বেগে ফেঁপে উঠছে আর গ্যালাক্সিরা সব বাইরের দিকে ছুটে চলেছে এটা জানার পর আরেক সমস্যা দেখা দিল। সব কিছুরই একটা শুরু থাকে; তাহলে সুদূর অতীতে এক দিন নিশ্চয়ই কোন উৎস থেকে মহাবিশ্বের এই ছুটে চলা আরম্ভ হয়েছিল। আর সে ছুটে চলা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই এক বিশাল মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। সব বিজ্ঞানী যে এই মত সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন তা নয়। পঞ্চাশের দশকে অন্য কিছু জ্যোতির্বিদ বললেন হয়তো আদতে তেমন কোন মহাবিস্ফোরণ আদৌ ঘটেনি; আপাত প্রসারমান মহাবিশ্ব আসলে রয়েছে একটা স্থিত অবস্থায়। মহাবিশ্বের যেমন প্রসার ঘটছে তেমনি তাতে ক্রমাগত নতুন বস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে, তাতেই নতুন ফাঁকা জায়গা ভরে যাচ্ছে। স্থিত মহাবিশ্বের অনুসারীদের মত অনুসারে মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিল না, তাই তার কোন শেষও নেই।

তার জবাবে আর কিছু জ্যোতির্বিদ সত্যি সত্যি মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল কিনা তার প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬৫ সালে। আমেরিকার নিউজার্সিতে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) আর রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নামে দু'জন বিজ্ঞানী একটা নতুন মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের মনে হল একটা অদ্ভুত তরঙ্গের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে; এটা আসছে চারদিক থেকেই। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন এ হল মহাবিস্ফোরণের আলোর তরঙ্গ বিপুল ডপলার সরণের ফলে লাল পেরিয়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে পরিণত হবার ফল। একে তিন ডিগ্রি (অর্থাৎ পরম শূন্য থেকে তিন ডিগ্রি সে. ওপরে) পটভূমি তরঙ্গও বলা হয়। তাদের এই আবিষ্কার ঘোষণা করা হয় ১৯৬৫ সালে; আর মহাবিস্ফোরণের ১,৫০০ কোটি বছর পর তার প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করার কৃতিত্বের জন্য পেনজিয়াস আর উইলসন কিছুটা দেরিতে ১৯৭৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

## এরপর কী ঘটবে

ধরা যাক ১,৫০০ কোটি বছর আগে ঘটেছিল এক বিশাল মহাবিস্ফোরণ আর তার ফলে আজও সব গ্যালাক্সিজোট প্রাণপণে ছুটছে দিগ্বিদিকে। কিন্তু তারপর কী হবে? স্পষ্টতই এ প্রশ্নের দুটি জবাব হতে পারে। একটা হল এই ছুটে চলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, আরেকটা হল মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জের আকর্ষণে একদিন এই ছুটে চলা থেমে যাবে আর তখন আবার সব গ্যালাক্সি ভেতরের দিকে ছুটতে থাকবে। ক্রমাগত ছুটে চলার যে সম্ভাবনা তাকে জ্যোতির্বিদরা বলেন 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' (open universe) আর ছুটে চলা থেমে গিয়ে আবার ভেতর দিকে এসে পড়ার যে সম্ভাবনা তাকে বলেন 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' (closed universe)।

এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা যে শেষ পর্যন্ত খাটবে তা নির্ভর করছে মহাবিশ্বে আদতে কতটা বস্তু আছে তার ওপরে। মহাবিশ্বে যদি একটা সঙ্কটসীমার চেয়ে বেশি বস্তু থাকে তাহলে তার আকর্ষণের টানে মহাবিশ্বের বাইরের দিকে ছুটে চলা একদিন থেমে যাবে আর শুরু হবে ভেতর দিকে ছোটা। এই সঙ্কটসীমা যে কত তার হিসেব করা হয়েছে: সেটা প্রতি ঘন মিটারে তিনটি পরমাণু। কিন্তু দেখা যায় আমাদের জানা মহাবিশ্বে সব গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় তা এই সঙ্কটসীমার ১০ থেকে ৩০ শতাংশ। কারো কারো হিসেবে এটা আরো কম। তবে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন আসলে মহাবিশ্বে বস্তু আছে আরো অনেক বেশি, ভাল করে খুঁজলে সেসব বস্তু একদিন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, আরো একটা তৃতীয় সম্ভাবনার কথাও একেবারে

উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, সে হল মহাবিশ্বে যে পরিমাণ বস্তু আছে তাতে তার বিস্তার এক সময় থেমে যাবে ঠিকই, তবে ভেতর দিকে ধসে পড়া ঘটবে না; এই মতকে বলা হচ্ছে 'সমতল মহাবিশ্ব' (flat universe)।

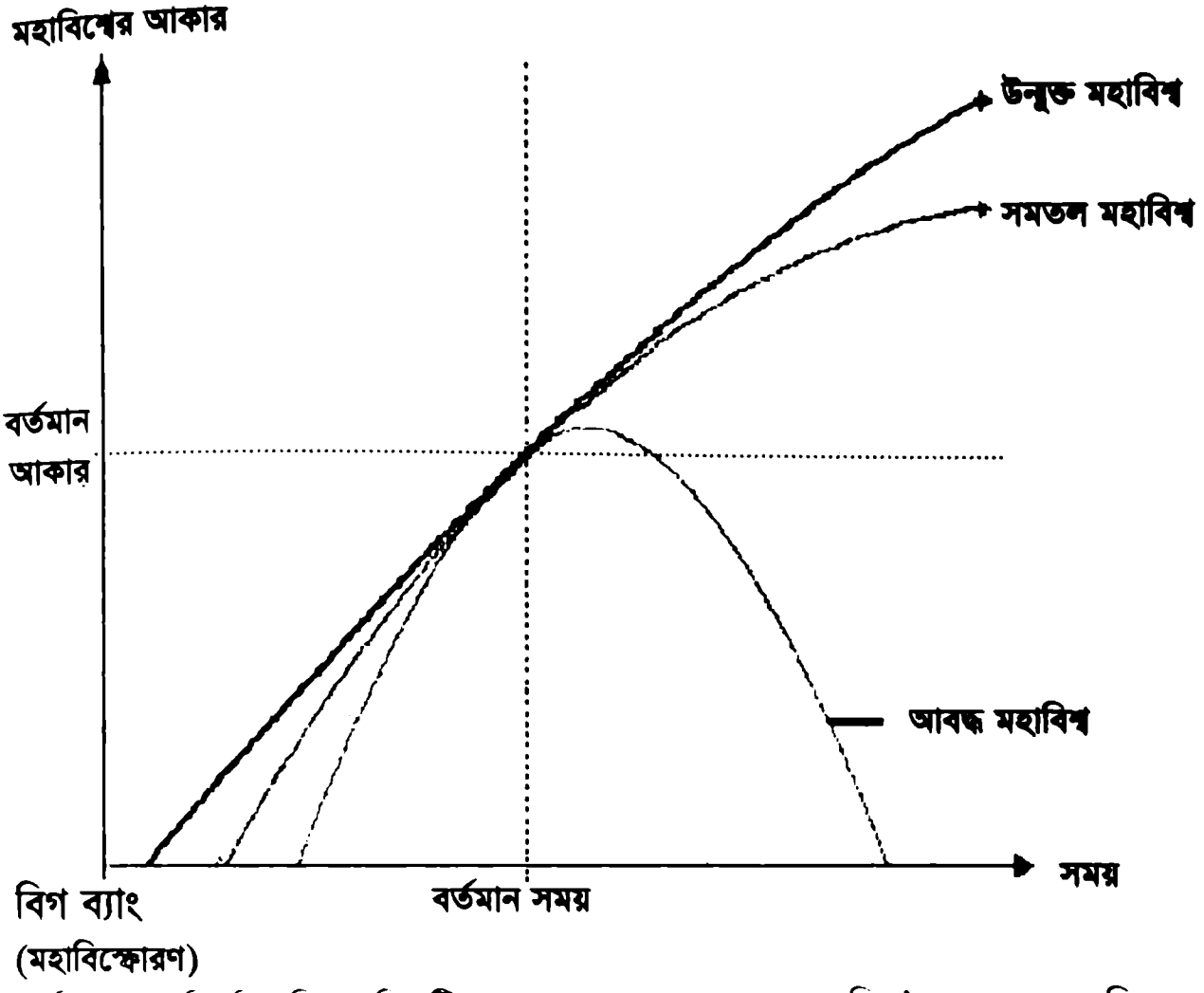


মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে তিনটি মত রয়েছে। 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে একদিন থেমে যাবে এবং আবার সঙ্কুচিত হতে হতে মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে ধসে পড়বে। 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল প্রসারিত হবে। 'সমতল মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব ধসে পড়বে না, আবার অনন্তকাল প্রসারিতও হবে না।

এই তিনটি সম্ভাবনার ফলাফল কী দাঁড়াবে তাও বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন। আবদ্ধ বিশ্বের হিসেবটা বেশ সহজ। সূর্য সাদাবামন হয়ে যাবার ৩,০০০ কোটি বছর পর মহাবিশ্বের বিস্তার থেমে যাবে; একটা ভিডিও ছবি উল্টো দিকে চালালে যেমন হয় তেমনি সব কিছু উল্টোভাবে ঘটতে শুরু করবে অর্থাৎ গ্যালাক্সি জোটগুলো সব পরস্পর কাছাকাছি আসতে শুরু করবে। এভাবে ৫,০০০ কোটি বছর চলার পর আসবে এক সঙ্কটকাল। সব গ্যালাক্সি পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে যাবে; তারপর একটা আরেকটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করবে। বিশাল সব অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে জ্বলে উঠবে অসংখ্য অতিনবতারা আর অতিকোয়াসার। রাতের আকাশ হয়ে উঠবে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল; মহাকাশের তাপমাত্রা বেড়ে হবে তারাদের মতো উষ্ণ। মহাধসের এক লক্ষ বছর আগে

মহাবিশ্ব জুড়ে প্রচণ্ড উষ্ণ আর ঘন বস্তুতে অসংখ্য কৃষ্ণবিবর তৈরি হতে আরম্ভ করবে। অবশেষে ৮,০০০ কোটি বছর পর এক পরম ধসে মহাবিশ্বের সব কিছু একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হবে এক মহাকৃষ্ণবিবর যার ভর হবে সমগ্র মহাবিশ্বের সমান। মহাবিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কালের সৃষ্টি হয়েছিল; কাজেই মহাবিশ্বের ইতি ঘটলে স্থান আর কালও উধাও হয়ে যাবে। স্থান-কালহীন সেই মহাবিশ্বে টিকে থাকবে শুধু পরম শূন্যতা।

কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন এই পরম ধসে সব কিছু যে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তা নয়, এতে যে শক্তি ছাড়া পাবে তার ফলে ঘটবে আরেক বিস্ফোরণ, সৃষ্টি হবে আরেক মহাবিশ্ব। এভাবে হয়তো ছন্দোময় দোলায় একের পর এক নতুন নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতেই থাকবে।

আবদ্ধ মহাবিশ্বের এই হিসেবের তুলনায় সমতল মহাবিশ্ব আর উন্মুক্ত মহাবিশ্বের হিসেব বেশ কিছুটা ধোঁয়াটে গোছের। এই দুই মতেই শেষ যে ঠিক কিভাবে হবে তা বলা শক্ত; তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে মহাবিশ্ব ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। আরো বহু হাজার কোটি বছর ধরে গ্যালাক্সিরা তাদের ভেতর ধুলো আর গ্যাসের পাঁজা থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি করে যেতে থাকবে। সূর্যের মতো আকারের তারাদের জীবনকাল মোটামুটি $১০^{১১}$ বছর; তবে খুব ছোট যে সব তারা মিনমিনে আলো দেয় তারা হয়তো এর চেয়ে ১০,০০০ গুণ বেশি দিন ($১০^{১৪}$ বছর) বাঁচবে। অর্থাৎ আজ থেকে ১০ লক্ষ কোটি বছর পরে মহাবিশ্বে থাকবে শুধু অতি ছোট আকারের লাল বামনরা। পৃথিবী যদি সূর্যের লালদানব পর্যায়ে বাষ্প হয়ে না গিয়ে থাকে তবে পৃথিবী থেকে সারা আকাশকে দেখাবে ঘোর কালো। সূর্যের শবদেহ সাদাদানব থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কালো অন্ধকার পিণ্ড, তার চারপাশে হয়তো তখনও ঘুরছে পৃথিবীর ছাইপোড়া দেহ।

আজ থেকে একশ লক্ষ কোটি বছর পর লালবামনদের আলোও নিভে যাবে। মহাকাশে তখন আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন বস্তু থাকবে শুধু অসংখ্য তারার শবদেহে: সেসব শবদেহ হল কৃষ্ণবিবর, নিউট্রন তারা আর কালো বামন। বাকি যে সব গ্রহ-উপগ্রহ-গ্রহাণু থাকবে তাদেরও কারো গা থেকে কোন তেজ বিকিরিত হবে না; সব কিছু থেকে সব তেজ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে মহাবিশ্বের সব প্রোটনেরও ক্ষয় হতে থাকবে — অবশ্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটনের ক্ষয় হতে লাগবে প্রায় $১০^{৩২}$ বছর; তখন শুধু কৃষ্ণবিবর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু এই কৃষ্ণবিবররাই কি অক্ষয়? একদিন তাদেরও ক্ষয় হবে, তবে সে কতদিনে তার হিসেব কল্পনা করাও কঠিন — হয়তো $১০^{৬৩}$ (অর্থাৎ এ-এর পেছনে ৬৩-টা শূন্য) বছর পর। ততদিনে সেই মহাবিশ্ব জুড়ে থাকবে শুধু এক মহাশূন্যতা।

মহাবিশ্বে এত যে গ্যালাক্সির জগৎ ছড়ানো আছে তা আজ থেকে মাত্র দু'শ বছর আগেও ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে। গত দু'শ বছরে, বিশেষ করে এই বিশ শতকে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। আর এটাও নিশ্চিত করে বলা যায় যে আজ থেকে দু'শ বছর পর মানুষের জ্ঞান আরো অনেক বাড়বে। এযাবৎ যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায় নি তাও তখন মানুষের অজানা থাকবে না। তবু আজ আমরা যেটুকু জেনেছি তাও আমাদের মনকে ভরে দেয়। মহাকাশের আর মহাকালের মহাব্যাপ্তির বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমরা ভাবি অজানার সন্ধানে মানুষের অভিযাত্রা আমাদের আরো কত রহস্যের উন্মোচনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে!

কবির কথাই যেন তখন বার বার আমাদের কানে বাজতে থাকে :

*মহাবিশ্বের মহাকাশে মহাকাল মাঝে*
*আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।*

# মহাকাশ নিয়ে মহাসংকট

এককালে মানুষের চেনাজানা জগতের সীমানা ছিল নেহাত নিজের গ্রাম আর তার কাছাকাছি দু'দশটি গ্রাম নিয়ে। খানিক দূরে থাকত যদি একটা নদী বা বন তাহলে তার ওপারে যাওয়া ছিল কঠিন। যদি থাকত একটা বড় পাহাড় বা সাগর তাহলে তো আর ওপারে যাবার প্রশ্নই উঠত না। ক্রমে ক্রমে মানুষের জগতের পরিধি বেড়েছে। নদী-বন-পর্বত-সাগরকে মানুষ জয় করেছে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত হয়ে উঠেছে সহজ; সারা পৃথিবীকে মানুষ এনে ফেলেছে প্রায় তার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু পৃথিবীর বাইরে কী আছে সে প্রশ্নও মানুষের মনে দেখা দিয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। চাঁদ-সূর্য-গ্রহতারা নিয়ে যে মহাকাশের জগৎ তার কথাও ভেবেছে মানুষ; সেই জগতে অভিযানের স্বপ্ন দেখেছে। ছায়াপথ আর তারামণ্ডল নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছে মানুষ; সেসব প্রশ্নের জবাব খোঁজারও চেষ্টা করেছে।

আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে ইতালিতে গ্যালিলিও দূরবীন যন্ত্র তৈরি করে দূরের দৃশ্যকে কাছে এনে দেখার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তার ফলে মহাকাশের নানা রহস্যের হদিস করা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। মানুষ জেনেছে চাঁদের বুকে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় আর খাদের কথা; সূর্যের কলঙ্ক আর গ্রহ-উপগ্রহদের কথা। সৌরজগৎ পেরিয়ে বহুদূরে যে নক্ষত্রলোক তাদের দূরবীনের ভেতর দিয়েও আর তেমন বড় করে দেখা যায় না। কিন্তু সেসব থেকে আসা মিটি মিটি আলো বিশ্লেষণ করে তারা কি দিয়ে তৈরি সে রহস্য ভেদ করার কৌশলও শিখেছে মানুষ। মানুষ জেনেছে আকাশের বুকে আমরা যে বিন্দু বিন্দু তারাদের দেখি সেগুলোও আসলে এক একটা বিশাল আকারের সূর্য, শুধু আমাদের থেকে অতি দূরে বলেই তাদের এমন ছোট দেখায়। এসব তারাদের অনেকেরই চারপাশে রয়েছে আমাদের সূর্যের মতো নিজস্ব গ্রহজগৎ। আর মহাকাশে মিটমিট করা তারা ছাড়াও আছে অসংখ্য গ্যালাক্সি বা নীহারিকা – যার এক একটার বুকে রয়েছে বহু হাজার কোটি ছোট-বড় তারা।

উনিশ শতকে মানুষ বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করে। আলোক তরঙ্গের মতোই বেতার তরঙ্গও মহাকাশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বেতার তরঙ্গে ভর করে দূরে খবর পাঠাতে শিখল। তারপর এই বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে দেখা গেল নক্ষত্র জগতের বহুদূর প্রান্ত থেকে আমাদের পৃথিবীতে নানা রকম বেতারের সংকেত এসে পৌঁছচ্ছে। এসব সংকেত পরীক্ষা করে মানুষ জানতে চেষ্টা করল মহাকাশের জগতের নানা অজানা রহস্য।

## দূরবীন দিয়ে দেখা

বিশ শতকে এসে মহাকাশ নিয়ে মানুষের গবেষণা বিপুলভাবে এগিয়েছে। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়েছে বিশাল আকারের সব আলোক দূরবীন। মহাকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আসা ক্ষীণ আলোকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে এসব দূরবীন। মাউন্ট পালোমার-এ বসানো হয়েছিল হেল দূরবীন; তার প্রতিফলক আয়না চওড়ায় ২০০ ইঞ্চি। সম্প্রতি হাওয়াই দ্বীপে বসানো হয়েছে আরো বড়মাপের কেক দূরবীন; এর আয়না চওড়ায় দশ মিটার বা প্রায় ৪০০ ইঞ্চি। আলোক দূরবীন ছাড়াও তৈরি হয়েছে বিশাল বড় আকারের বেতার দূরবীন। এরা ধরতে পারে আরো দূর থেকে আসা বেতার তরঙ্গকে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষ পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে মহাকাশে পাঠিয়েছে যন্ত্রপাতিতে ঠাসা রকেট আর নভোযান। ১৯৬৯ সালে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদের বুকে গিয়ে নেমেছে মানুষ। সেখানে তারা বসিয়ে আসে নানা যন্ত্রপাতি। তারপর থেকে অসংখ্য নভোযান পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে; দিনরাত সংগ্রহ করছে মহাকাশ সম্বন্ধে নানা খবর।

পৃথিবীর ওপর আজকাল বড় বড় দূরবীন বসানো হয় সচরাচর কোন উঁচু পাহাড়ের ওপর বিজন জায়গায় যাতে আশপাশের লোকালয়ের কৃত্রিম আলোর দূষণ মহাকাশ থেকে আসা অতি ক্ষীণ আলোর হদিস করতে অসুবিধে না ঘটায়। কিন্তু তবু বায়ুমণ্ডলের ধুলো আর মেঘের ঢাকা একেবারে এড়ানো পৃথিবীর বুক থেকে কিছুতেই সম্ভব নয়। এর একমাত্র সমাধান হল মহাকাশে নভোযানে দূরবীন বসানো। মহাকাশে বায়ুমণ্ডল নেই, তাই সেখানে দূরবীনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসারও কোন সমস্যা নেই। ১৯৯০ সালের শুরুতে স্পেস শাট্‌ল্ থেকে মহাকাশে বসানো হল 'হাব্‌ল্' নামে এক শক্তিশালী দূরবীন। এই দূরবীনটি বিশাল আকারের – দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট, ব্যাস ১৪ ফুট; এর প্রতিফলক আয়না চওড়ায় ২.৪ মিটার বা প্রায় ৯৫ ইঞ্চি; ওজন প্রায় এগারো টন। কেক দূরবীন তৈরিতে খরচ পড়েছিল ১০ কোটি ডলার; অথচ হাব্‌ল্ দূরবীন তৈরিতে খরচ হয় ১৬০ কোটি ডলার।

কিন্তু এত খরচ পড়লে কি হবে, হাব্‌ল্ দূরবীন মহাকাশে স্থাপন করার পরপরই টের পাওয়া গেল এর প্রতিফলক আয়নায় রয়ে গেছে মারাত্মক ত্রুটি। সেগুলো মেরামতের চেষ্টা পৃথিবীর ওপর থেকে কম্পিউটারের নির্দেশ দিয়ে কিছুটা করা হল, কিন্তু তাতে সামান্য মাত্র উন্নতি হল; তাই দূরের গ্যালাক্সিদের তেমন স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নভোযানের সাহায্যে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে তার আয়না সমাবেশ মেরামত করা হয়েছে। তার ফলে পৃথিবীর ওপরকার যে কোন দূরবীনের চেয়ে বহুগুণে স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছে এই দূরবীন থেকে। আর এ থেকে যে সব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তা আজ অনেকখানি বদলে দিচ্ছে মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে।

## মহাবিশ্বের বয়সের হিসেব

মহাকাশ সম্বন্ধে আজকের সবচেয়ে তাজা খবর হল মহাবিশ্বের বয়স নিয়ে। এ বিষয়ে এই শতাব্দীর বিশের দশকে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাব্‌ল্ বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন। দূরের গ্যালাক্সিদের আলো দূরবীন দিয়ে পরীক্ষা করে ১৯২৯ সালে তিনি দেখেন তাতে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—আলোর ঢেউগুলোর দৈর্ঘ্য যেমন থাকার কথা তার চেয়ে যেন কিছুটা লম্বাটে হয়ে পড়ছে; অর্থাৎ আলোর রঙ বদলে যাচ্ছে লালের দিকে। এমন হওয়া সম্ভব গ্যালাক্সিগুলো যদি আমাদের থেকে দূরে ছুটে যেতে থাকে। দেখা গেল পৃথিবী থেকে সব দিকেই গ্যালাক্সির আলোতে রয়েছে এমনি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সব গ্যালাক্সি আমাদের ছায়াপথ বিশ্ব থেকে কেবলই দূরে ছুটে চলেছে। এ থেকে সৃষ্টি হল বিস্ফোরণশীল মহাবিশ্বের তত্ত্ব। অর্থাৎ সুদূর অতীতে কোন এক অতি ছোট বিশ্বডিম্ব থেকে এক বিশাল বিস্ফোরণে এই মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর থেকে সেগুলো কেবলই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু সত্যি যে এভাবে ছোট এক বিশ্বডিম্ব থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে তার কী কোন প্রমাণ আছে? ষাটের দশকের মাঝামাঝি (১৯৬৪) দুই মার্কিন বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসন আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন মহাবিশ্বের চারপাশ থেকে আসা ক্ষীণ বেতার গুঞ্জন। এর নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ। সর্বক্ষণ মহাবিশ্বের চারপাশ থেকে পৃথিবীর ওপর এসে পড়ছে এই বিকিরণ। এবার মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব আরো জোর পেল। বলা হল সুদূর অতীতে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল বিশ্বচরাচরে সবদিকে সমানভাবে বিস্তৃত পটভূমি বিকিরণ হল তারই অবশিষ্ট। বিজ্ঞানীরা পেলেন এক নতুন আলো; মনে হল এবার বুঝি তাঁরা সৃষ্টি রহস্যের প্রায় গোড়ার কাছে পৌঁছে গেছেন।

এই মহাবিস্ফোরণটা আজ থেকে ঠিক কতকাল আগে ঘটেছিল তার হিসেব কি বের করা যায়? সেটা বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সিদের ছুটে চলার বেগের একটা হিসেব করলেন। তা থেকে মহাবিশ্বের বয়সের হিসেবটা পাওয়া গেল মোটামুটি দেড় হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর। হাব্‌ল্-এর আবিষ্কার মানুষকে মহাবিশ্বের জন্ম সম্বন্ধে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে। উনিশ শতক পর্যন্ত মানুষের বিশ্ব ছিল শুধু সৌরজগৎ আর ছায়াপথকে নিয়ে; হাব্‌ল্ মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিলেন এক বিশাল মহাবিশ্বের নাগরিক হিসেবে। তাই ১৯৯০ সালে মহাকাশে যে বড়মাপের দূরবীন বসানো হল তার নাম রাখা হয়েছে হাব্‌ল্-এর নামে।

এখানেই মানুষের প্রশ্ন তোলা থেমে থাকল না। এরপর যে প্রশ্ন দেখা দিল সে হল: এই যে গ্যালাক্সিপুঞ্জের ক্রমাগত পরস্পরে কাছ থেকে ছুটে চলা সে কি অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে? একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আরেকদল বললেন, আসলে গ্যালাক্সিগুলো আজ বিস্ফোরণের ধাক্কায় বাইরের

দিকে ছুটে চলছে বটে, তেমনি আবার তাদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে পারস্পরিক আকর্ষণের টান। এই টানে গ্যালাক্সিগুলোর ছুটে চলার বেগ ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসবে, তারপর একদিন তারা ছুটবে ভেতরের দিকে। অবশেষে কোন সুদূর ভবিষ্যতে তারা আবার এক বিন্দুতে পৌঁছে যাবে, তখন ঘটবে আরেক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। কিন্তু এভাবে আকর্ষণের টানে গ্যালাক্সিদের ভেতরের দিকে ফিরে আসতে হলে মহাবিশ্বে যত বস্তু থাকা দরকার পরীক্ষা থেকে কিছুতেই তার হদিস পাওয়া গেল না। বিজ্ঞানীরা বললেন, আসলে মহাবিশ্বে যতটা বস্তু আমরা দেখতে পাই তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বস্তু আছে অদৃশ্য কৃষ্ণবস্তুর আকারে। এই অদৃশ্য বস্তুদের ধরলে গ্যালাক্সিদের আবার ভেতর দিকে ফিরে আসার হিসেব মেলে।

নব্বইয়ের দশকে আজ হাব্‌ল্ দূরবীন থেকে মহাবিশ্বের অনেক দূরের নিখুঁত ছবি পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে। সেসব তথ্য হাব্‌ল্-এর নিজের আগের অনেক সিদ্ধান্তকেই পালটে দেবার উপক্রম করেছে।

## হিসেব কিছুতেই মিলছে না

হাব্‌ল্ দূরবীন থেকে পাওয়া নতুন এসব ছবি থেকে গ্যালাক্সিদের দূরে ছুটে যাবার বেগ নতুনভাবে হিসেব করা হচ্ছে। তাতে দেখা যায় মহাবিশ্বের বয়স আগে যতটা ভাবা হয়েছিল ততটা নয়। আগে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছিলেন, ১,৫০০ থেকে ২,০০০ কোটি বছর আগে এক অতি ছোট অথচ প্রচণ্ড উষ্ণ গোলকে বিপুল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের জন্ম। প্রশ্ন উঠবে এই সময়ের হিসেবটা কিভাবে পাওয়া গেল? আসলে ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়। হাব্‌ল্ তাঁর পরীক্ষা থেকে বলেছিলেন গ্যালাক্সিরা আমাদের কাছ থেকে যত দূরে, তাদের দূরে ছুটে যাবার বেগ তত বেশি। কাজেই আমাদের জানতে হবে মাত্র দুটি সংখ্যা: কত বেগে গ্যালাক্সিরা একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; আর এখন তারা আমাদের কাছ থেকে কতটা দূরে রয়েছে। এই দুটো সংখ্যার অনুপাতকে বলা হয় 'হাব্‌ল্-এর ধ্রুবক'। গ্যালাক্সির আলো যত বেশি লালের দিকে হবে তত বেশি তার বেগ। কাজেই গ্যালাক্সিগুলো কত দূরে সেটা জেনে নিয়ে তাদের চলার বেগকে এই দূরত্ব দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে মহাবিশ্বের প্রসারের হার; আর তা থেকে পেছন দিকে গেলে পাওয়া যাবে কতদিন আগে এই প্রসারণ শুরু হয়েছিল।

অবশ্য ব্যাপারটা এভাবে শুনতে যত সহজ মনে হচ্ছে আদতে ঠিক অতটা সহজ নয়। মহাকাশে এসব হিসেব বের করার বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। অনেক দূরের গ্যালাক্সিগুলো পৃথিবী থেকে ঠিক কত দূরে তার হিসেব করা বেশ কঠিন। এমনিতে বোঝা যায় যে, তারারা আমাদের থেকে যত দূরে তাদের তত কম উজ্জ্বল দেখাবে; কিন্তু খুব বেশি দূরের তারাদের দেখতে পাওয়াই শক্ত। এজন্য বিজ্ঞানীরা সচরাচর শেফালি বিষম তারা নামে একজাতের তারাদের দূরত্ব আর

উজ্জ্বলতাকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেন। এই তারাদের বৈশিষ্ট্য হল এদের উজ্জ্বলতা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যায়ক্রমে বাড়ে কমে; আর এই বাড়া-কমার সময় তাদের প্রকৃত উজ্জ্বলতার সমানুপাতিক। কাজেই এদের বাড়া-কমার সময় মেপে তাদের উজ্জ্বলতার পরিমাপ পাওয়া যায়; তার সঙ্গে আপত উজ্জ্বলতা মেলালে বেরিয়ে পড়ে এদের দূরত্বের হিসেব। তাই অন্য নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির দূরত্ব বের করার জন্য এই তারাদের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করলেই চলে।

কিন্তু এখানেও সমস্যা কম নয়। খুব দূরে শেফালি বিষম তারাদেরও খুঁজে পাওয়া কঠিন; তাছাড়া গ্যালাক্সিগুলো প্রায়ই থাকে দল বেঁধে। এমনি সব গ্যালাক্সির দলের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক আকর্ষণের টান। তাই সাধারণভাবে সব গ্যালাক্সি বিস্ফোরণের ধাক্কায় পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছুটে চললেও কাছাকাছি গ্যালাক্সির মধ্যে আকর্ষণের টানে তাদের ছুটে চলার বেগ বেশ কিছুটা কমে যায়। যেমন আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের কাছাকাছি (অর্থাৎ ২৩ লক্ষ আলোক-বছর দূরে) রয়েছে অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি; তার ওপর ছায়াপথ গ্যালাক্সির টান এমন প্রবল যে সেটা এর থেকে দূরে সরে না গিয়ে বরং আকর্ষণের টানে ক্রমেই কাছে চলে আসছে। তাই মহাবিশ্বের বিস্তারের সঠিক মাপ পেতে হলে জ্যোতির্বিদদের তাকাতে হয় খুব দূরের গ্যালাক্সিগুলোর দিকে – যাতে তাদের বাইরের দিকে ছুটে চলার বেগ দলের ভেতরকার আকর্ষণের চাইতে বেশ কিছুটা বেশি হয়। সেখানে আবার দেখা দেয় আরেক সমস্যা; দূরত্ব যত বেশি হয় সেখানে গ্যালাক্সিদের ছুটে চলার বেগ ঠিকমতো মাপা হয়ে ওঠে তত বেশি শক্ত।

দূরের শেফালি বিষম তারাদের দেখতে পাওয়া বেশ শক্ত বলেই হাব্‌ল্ দূরবীন তৈরির সময় এমনভাবে তার নকশা করা হয় যেন তাতে এ জাতের তারাদের অনেক দূর থেকে দেখা যায়। হাব্‌লের আয়নার সমস্যা মেরামতের পর পরই বিজ্ঞানীরা শেফালি বিষম তারার সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন। অতি দূরের যেসব শেফালি বিষম তারা পাওয়া গেল তাদের মাপ থেকে হাব্‌ল্-এর ধ্রুবকের মান বেরোল ৮০; তাতে একদল বিজ্ঞানী হিসেব করে বললেন, তাহলে পৃথিবীর জন্মের সময়টা ছিল খুব সম্ভব ৮০০ থেকে ১,২০০ কোটি বছর আগে (হাব্‌ল্ ধ্রুবক ৫০ হলে মহাবিশ্বের বয়স হত ১,৫০০ কোটি থেকে ২,০০০ কোটি বছর)। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স আগে যা ভাবা হচ্ছিল তার চাইতে এই হিসেব হয়ে দাঁড়াল অনেক কম।

অবশ্য এ নিয়ে হয়তো তেমন কোন সমস্যা হত না। সমস্যা দেখা দিয়েছে এজন্য যে, দূরবীন দিয়ে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিরই কেন্দ্রের কাছাকাছি এমন সব নক্ষত্র দেখা যায় যার কোন কোনটার বয়স ১,৪০০ কোটি বছরের কম নয়। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, এই মহাবিশ্বে এমন সব নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি আছে যাদের বয়স মহাবিশ্বের বয়সের চেয়েও বেশি। এ যেন বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি! এই আপাত দ্বন্দ্বের নিশ্চয়ই কিছু একটা সমাধান রয়েছে। তবে এর জন্য বিজ্ঞানীদের আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আরো বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে।

সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে আরো এক সমস্যা। মহাবিস্ফোরণের তত্ত্ব অনুযায়ী বিস্ফোরণের পর পর বিস্ফোরণের ধাক্কায় সব বস্তুপুঞ্জের চতুর্দিকে সমানভাবে ছিটকে যাবার কথা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের চারপাশে প্রায় ষাট কোটি আলোক-বছর ব্যাসের একটি এলাকা জুড়ে যত গ্যালাক্সি রয়েছে – তার মধ্যে পড়ছে প্রায় একলক্ষ আলোক-বছর ব্যাসের আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিও – যেন ছুটে চলেছে সব একই দিকে, বহু দূরে কালপুরুষ মণ্ডলের দিকে। আর সে চলার বেগও অতি প্রচণ্ড – সেকেণ্ডে প্রায় ৪৩৫ মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ১৫·৬০ লক্ষ মাইল। এমন বেগে এত বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সিকে একদিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে কেবল কোন প্রবল মহাকর্ষের টান। কিন্তু এমন প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করবে এমন বিশাল বস্তুমালার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সমস্যার সেখানেই শেষ নয়। আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ-বিশ্ব তার নিজের দলের মধ্যে সরছে এক দিকে; মহাবিস্ফোরণের ফলে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মধ্যে ছুটছে আরেক দিকে; আবার কোন অতি প্রবল আকর্ষণের টানে গ্যালাক্সিপুঞ্জের বিরাট দঙ্গল নিয়ে কালপুরুষ মণ্ডলের দিকে ছুটে চলা — সে আবার অন্য দিকে। একই গ্যালাক্সি কি একই সঙ্গে এতদিকে ছুটতে পারে?

## বুঝি আসছে আরেক বিপ্লব

মহাকাশ-তত্ত্বের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানীরা বিশ শতকে এসে খুঁজে পেয়েছেন। আবার অনেক প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব বিজ্ঞানীদের এখনও জানা বাকি। যেমন মহাকাশ জুড়ে যে বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য কৃষ্ণবস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হচ্ছে তা কী দিয়ে তৈরি? মহাকাশে কৃষ্ণবস্তু আছে ঠিক কতটা পরিমাণে? সেসব মহাকাশ জুড়ে কিভাবে ছড়ানো? ধরা যাক সুদূর অতীতে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই মহাবিশ্বের; তাতে বিস্ফোরণের দাপটে বস্তুপুঞ্জ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার কথা সমানভাবে। কিন্তু তা না হয়ে এত সব বস্তু জমাট বেঁধে গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সির জোট তৈরি হল কি করে? – এবার এসব প্রশ্নের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো দুটি নতুন প্রশ্ন: মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে তার ভেতরকার কোন কোন তারার বয়স বেশি হয় কি করে? আর মহাকাশের বিশাল একটা এলাকা কেন কালপুরুষ মণ্ডলের দিকে ছুটে চলেছে?

কৃষ্ণবস্তুর কথাই ধরা যাক। মহাকাশে যে প্রচুর অদৃশ্য কৃষ্ণবস্তু আছে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় অনেক গ্যালাক্সির ওপর তাদের মহাকর্ষের প্রভাব থেকে। এখন মনে করা হচ্ছে মহাকাশে নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদি নব মিলিয়ে যতটা দৃশ্য বস্তু আছে তার চেয়ে এমনি অদৃশ্য বস্তু আছে অন্তত দশগুণ বেশি; কারও কারও হিসেবে এ হিসেবটা একশ' গুণও হতে পারে। মহাবিশ্বে কৃষ্ণবস্তুর মান বোঝাতে 'ওমেগা' নামে একটা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এটা হল মহাবিশ্বে যতটা কৃষ্ণবস্তুর

হদিস পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে যতটা কৃষ্ণবস্তু থাকলে মহাবিশ্বের বিস্তার একসময় থেমে যাবে তার অনুপাত। ওমেগা যদি ১-এর বেশি হয় তাহলে মহাবিশ্ব একদিন চুপসে গিয়ে আর এক মহাবিস্ফোরণ ঘটবে। আর যদি ওমেগা হয় ১-এর কম হয় তাহলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতেই থাকবে।

এই ওমেগার মান কত তার সঙ্গে মহাবিশ্বের বয়সের একটা সম্বন্ধ রয়েছে। ধরা যাক ওমেগার মান বেশ বড়, তাহলে মহাবিশ্বের বয়স আপাত যতটা মনে হয় তার চেয়ে বেশ কম হতে পারে। কারণ প্রথম দিকে হয়তো বিস্ফোরণের ফলে বিস্তারটা ঘটেছিল খুব দ্রুত; তাতে মহাবিশ্ব আজকের অবস্থায় আসতে তেমন বেশি সময় লাগে নি। তারপর বিপুল পরিমাণ কৃষ্ণবস্তুর আকর্ষণের কারণে প্রসারণের হার হয়তো বেশ কমে গিয়েছে। সেই হারটাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। অন্যভাবে দেখলে কিছু কিছু তারার বয়স যে মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে তার হিসেব মেলাতে হলে ধরতে হয় যে, ওমেগার মান ১-এর একটা ভগ্নাংশ মাত্র; অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স আপাত যা মনে হচ্ছে আসলে তার চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু তাহলে তো মহাবিশ্ব চিরকাল কেবল প্রসারিত হয়েই যেতে থাকবে; সেটা আবার অনেক বিজ্ঞানী মেনে নিতে দ্বিধা করছেন।

মহাকাশের তত্ত্বে আজ যে জটিল সংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধান কী শীগ্‌গির পাওয়া যাবে? হয়তো যাবে, হয়তো যাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে আসলে বিজ্ঞান চিরকাল এভাবেই এগিয়েছে। অভিজ্ঞতাই হল মানুষের সব জ্ঞান আর তত্ত্বের ভিত্তি। সাদামাটা চোখে দেখলে হয়তো সবটা সত্যি মানুষের চোখে পড়ে না। বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রায়শই সাদা চোখে দেখা তত্ত্বকে পালটে দেয়। একদিন মানুষ ভাবত জলা জায়গার খারাপ বাতাস থেকেই সব রোগের উৎপত্তি হয়; নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মানুষ আজ জেনেছে আসলে বেশির ভাগ রোগ হয় জীবাণু থেকে। তেমনি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জেনে এসেছিল সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে; আপাত দৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই সাদা চোখের দেখাকে দিয়েছে উল্টে। এমনি সাদা চোখের অনেক দেখাকেই বিজ্ঞান ক্রমাগত পালটে দেয়, আর তাতেই মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলে।

তত্ত্ব আর পরীক্ষার মধ্যে মিল ঘটানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। যদি মিল না হয় তাহলে বুঝতে হবে হয় পরীক্ষাটা ঠিকমতো করা হয় নি, অথবা হয়তো তত্ত্বটাই বদলে ফেলার সময় হয়েছে। গরমিল যদি হয়ে দাঁড়ায় বেশ বড়সড় রকমের তাহলে বুঝতে হবে হয়তো আমরা কোন বড় রকম আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আগামী দিনে আরো পরীক্ষণ আর পর্যবেক্ষণ ঘটবে। তা থেকে মহাবিশ্বের আরো গভীর সত্য হয়তো উদ্‌ঘাটিত হবে।

# পরিশিষ্ট

## ১: সৌরজগতের গ্রহদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য

| গ্রহের নাম | সূর্য থেকে গড় দূরত্ব | কক্ষ পরিক্রম কাল (বছর) | আবর্তন কাল (বিষুবরেখায়) | ব্যাস (বিষুব রেখায়) | ভর (পৃথিবী=১) |
|---|---|---|---|---|---|
| | কোটি কিমি | | | কিলোমিটার | |
| বুধ | ৫৭৯ | ৮৮ দিন | ৫৯ দিন | ৪,৮৮০ | ০০৫৫ |
| শুক্র * | ১০৮২ | ২২৫ দিন | ২৪৩ দিন | ১২,১০০ | ০৮১৫ |
| পৃথিবী | ১৪৯৬ | ৩৬৫ ২৫ দিন | ২৩৯৩ ঘণ্টা | ১২,৭৫৬ | ১০০ |
| মঙ্গল | ২২৭৯ | ৬৮৭ দিন | ২৪৬ ঘণ্টা | ৬,৭৮৭ | ০১১ |
| বৃহস্পতি | ৭৭৮৩ | ১১৮৬ বছর | ৯৯ ঘণ্টা | ১৪২,৮০০ | ৩১৭৯ |
| শনি | ১৪২৭০ | ২৯৪৬ বছর | ১০৭ ঘণ্টা | ১২০,৬০০ | ৯৫২ |
| ইউরেনাস* | ২৮৭০০ | ৮৪০১ বছর | ১৭২ ঘণ্টা | ৫১,৩০০ | ১৪৪ |
| নেপচুন | ৪৪৯৭০ | ১৬৪৭৯ বছর | ১৬১ ঘণ্টা | ৪৯,১০০ | ১৭২ |
| প্লুটো* | ৫৯০০০ | ২৪৮৫৪ বছর | ৬৪ দিন | ২,৩০০ | ০০০৩ |

* তারকা চিহ্নিত গ্রহগুলোর নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন অন্যগুলোর উল্টোদিকে অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে

# ২: মিটারের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা আর নামা

## ১০-এর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা

$১০^{০}$ = ধানের শিস; ময়ূর; ছাগল; চেয়ার
$১০^{১}$ = বাড়ি ; ডাইনোসর; তিমি (নীল তিমি হয় বড় জোর ৩০ মিটার লম্বা); উড়োজাহাজ
$১০^{২}$ = স্ট্যাচু অব লিবার্টি (হাতের মশালের ডগা থেকে মাটি ৯৩ মিটার); তাজমহল (৪টি মিনার নিয়ে ১০০-মিটার বর্গ); চাঁদে যাবার স্যাটার্ন ৫ রকেট (১১০ মিটার); সেকোইয়া বৃক্ষ ১০০ মিটারের ওপরে
$১০^{৩}$ = বড় সাঁকো; (এক কিলোমিটার)
$১০^{৪}$ = ফসলের ক্ষেত; শহর; এভারেস্ট শৃঙ্গ (দশ কিলোমিটার)
$১০^{৫}$ = ল্যাণ্ডস্যাট ছবি (একশ কিলোমিটার)
$১০^{৬}$ = ল্যাণ্ডস্যাট ছবি; হারিকেন ঝড় (এক হাজার কিলোমিটার)
$১০^{৭}$ = মেঘমালা (দশ হাজার কিলোমিটার)
$১০^{৮}$ = মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি (এক লক্ষ কিলোমিটার)
$১০^{৯}$ =পৃথিবী থেকে চাঁদের উদয়; চাঁদ থেকে পৃথিবীর উদয় (দশ লক্ষ কিলোমিটার)
$১০^{১০}$ = চাঁদের ছবি (প্রথম ছবি আঁকেন গ্যালিলিও ১৬০৯ সালের ২ ডিসেম্বর ২০ শক্তির এক দূরবীন দিয়ে (এক কোটি কিলোমিটার)
$১০^{১১}$ = ভাইকিং থেকে মঙ্গল গ্রহের দৃশ্য; নভোযান থেকে তোলা শুক্র গ্রহের দৃশ্য (দশ কোটি কিলোমিটার)
$১০^{১২}$ = বৃহস্পতি গ্রহ (একশ কোটি কিলোমিটার = ৭ জ্যোতির্বিদ্যা একক)
$১০^{১৩}$ = বৃহস্পতির কক্ষপথের ব্যাস (হাজার কোটি কিলোমিটার)
$১০^{১৪}$= প্লুটোর কক্ষপথের ব্যাস; হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ (দশ হাজার কোটি কিলোমিটার)
$১০^{১৫}$ = কালপুরুষ মণ্ডল (লক্ষ কোটি কিলোমিটার)
$১০^{১৬}$ = ঊর্ট মেঘমালায় আছে হয়তো ১,০০০-১০,০০০ কোটি ধূমকেতুর বীজ (১ আলোক-বছর)
$১০^{১৭}$ = গ্যালাক্সি, তারার মেলা (১০ আলোক-বছর)
$১০^{১৮}$ = গ্যালাক্সি (১০০ আলোক-বছর)
$১০^{১৯}$ = গ্যালাক্সি (১ হাজার আলোক-বছর)
$১০^{২০}$ = গ্যালাক্সি (১০ হাজার আলোক-বছর)
$১০^{২১}$ = ছায়াপথ গ্যালাক্সি (১ লাখ আলোক-বছর)
$১০^{২২}$ = গ্যালাক্সি (১০ লাখ আলোক-বছর)
$১০^{২৩}$ = গ্যালাক্সি দল (১ কোটি আলোক-বছর)
$১০^{২৪}$ = গ্যালাক্সি দল (১০ কোটি আলোক-বছর)
$১০^{২৫}$ = ভার্জো সুপারক্লাস্টার, অতি বিশাল গ্যালাক্সি দল (১০০ কোটি আলোক-বছর)
$১০^{২৭}$ = গ্যালাক্সি দল

## ১০-এর সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামা

$১০^{-১}$= হাতের আঙ্গুল; ঘড়ি; ফুল; চিংড়ি; মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ১ মিমি থেকে ০.৩ মিটার (বেতার >০.৩ মি)

$১০^{-২}$ = হাতের ভাঁজ; আঙ্গুলের রেখা; নুনের দানা (১ সেন্টিমিটার)
$১০^{-৩}$ = হাতের কৈশিক শিরা; কাপড়ের বুনট (১ মিলিমিটার); অবলাল রশ্মি ৭০০ ন্যামি থেকে ১ মিমি
$১০^{-৪}$ = গ্রামোফোন রেকর্ডের খাঁজ (১০০ মাইক্রন)
$১০^{-৫}$ = দেহের কোষ; রক্তের শ্বেত কণিকা (১০ মাইক্রন)
$১০^{-৬}$ = ক্রোমোজোম তন্তু; জীবকোষের কেন্দ্রক (১ মাইক্রন)
$১০^{-৭}$ = ডি.এন.এ. (০.১ মাইক্রন, ১০০০ আংস্ট্রম), দৃশ্য আলো ৪০০-৭০০ ন্যামি
$১০^{-৮}$ = ডি.এন.এ. খণ্ড (১০০ আংস্ট্রম); অতিবেগুনি রশ্মি ১০-৪০০ ন্যামি
$১০^{-৯}$ = কেলাসে পরমাণুর বিন্যাস; সরল যৌগে পরমাণুর বিন্যাস (১০ আংস্ট্রম=১ ন্যানোমিটার)
$১০^{-১০}$ = পরমাণু (১ আংস্ট্রম, ০.১ ন্যানোমিটার)
$১০^{-১১}$ = পরমাণুর ভেতরের ইলেকট্রন; এক্স-রশ্মি (০.১ আংস্ট্রম, ০.০১ ন্যানোমিটার, ১০ পিকোমিটার)
$১০^{-১২}$ = পরমাণুর কেন্দ্রক (১ পিকোমিটার)
$১০^{-১৩}$ = পরমাণুর কেন্দ্রক (০.১ পিকোমিটার)
$১০^{-১৪}$ = পরমাণুর কেন্দ্রক
$১০^{-১৫}$ = প্রোটন ও কোয়ার্ক
$১০^{-১৬}$ = কোয়ার্ক

**পরিমাপের একক:**

মিটার = ফরাসি বিপ্লবের পর ১৭৯০ সালে পণ্ডিতেরা পৃথিবীর মাপের সঙ্গে মিল রেখে পরিমাপের মানদণ্ড স্থির করার চেষ্টা করলেন। পৃথিবীর পরিধির এক চতুর্থাংশকে ধরা হল $১০^{৭}$ মিটার বা $১০^{৪}$ কিলোমিটার। ১৯৮১ সালে মিটারের নিখুঁত মাপ স্থির করা হয়েছে বায়ুশূন্য স্থানে ক্রিপটন-৮৬ পরমাণুর $2p^{10}$ ও $5d^{5}$ স্তরের মধ্যে স্থানান্তরের ফলে উদ্ভূত বিকিরণের ১,৬৫০,৭৬৩.৭৩-টি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য।

জ্যোতির্বিদ্যা একক = সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক = $১.৫০ \times ১০^{১১}$ মিটার।

আলোক-বছর = আলোর বেগ মহাশূন্যে প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটি $৩.০০ \times ১০^{৮}$ মিটার (প্রকৃতপক্ষে ২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ মিটার)। কাজেই এক বছরে আলো চলবে $৯.৪৬ \times ১০^{১৫}$ মিটার। সব ব্যবহারিক কাজের জন্য একে $১০^{১৬}$ মিটার বলে ধরা যেতে পারে।

পারসেক (parsec) = শব্দটা parallax of one second থেকে এসেছে। নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপার জন্য জ্যোতির্বিদদের একটি সহজ পদ্ধতি হল ছয়মাস পর পৃথিবীর অবস্থান যখন বদলে যায় তখন তারার প্যারালাক্স বা অবস্থানের আপেক্ষিক পরিবর্তন মেপে দেখা। পারসেক এমন দূরত্ব যেখান থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এক সেকেণ্ড কোণের চাপ সৃষ্টি করে।

১ পারসেক = ৩.২৬ আলোক-বছর = ২০৬,২৬৫ জ্যোতির্বিদ্যা একক।

# ৩ : কবে কী ঘটেছে বা ঘটবে

| মহাবিস্ফোরণের কতদিন পর | আজ থেকে কতদিন আগে | কী ঘটেছে |
|---|---|---|
| ০ | ১,৫০০ কোটি বছর | বিগ ব্যাং; মহা বিস্ফোরণ |
| $১০^{-৩৫}$ সেকেণ্ড (দশমিকের পর ৩৪টি শূন্য) | | প্রসারণ; তাপমাত্রা $১০^{২৭}$ (১-এর পেছনে ২৭টা শূন্য) ডিগ্রি সে.; বস্তু ও প্রতিবস্তুর মেশামেশি |
| $১০^{-৪}$(০.০০০১) সেকেণ্ড | | কোয়ার্ক প্রতিকোয়ার্ককে ধ্বংস করছে; যেসব কোয়ার্ক টিকে থাকে তারা প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি করে; তাপমাত্রা $১০^{১২}$ (১-এর পেছনে ১২টা শূন্য) ডিগ্রি সে. |
| ১০ সেকেণ্ড | | ইলেকট্রন প্রতিইলেকট্রন (পজিট্রন)-কে ধ্বংস করে; তাপমাত্রা ৩০০ কোটি ডিগ্রি সে. |
| ৩ মিনিট | | কিছু প্রোটন নিউট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিলিয়ামের কেন্দ্র গঠন করে |
| ৩০০,০০০ বছর | | ইলেকট্রনরা প্রোটন ও হিলিয়াম কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করে; হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু তৈরি হয় |
| ৫০ কোটি বছর | ১,৪৫০ কোটি বছর | মহাবিশ্বের গ্যাসপুঞ্জ জোট বেঁধে গ্যালাক্সি গঠন করতে আরম্ভ করে |
| ১০০ কোটি বছর | ১,৪০০ কোটি বছর | ছায়াপথ গ্যালাক্সির প্রথম তারা গঠন শুরু হয় |
| ২০০-৫০০ কোটি বছর | ১,৩০০-১,০০০ কোটি বছর | অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে গ্যাস কৃষ্ণবিবরে ঢুকতে শুরু করে; কোয়াসার তৈরি হয়; গ্যালাক্সির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে থাকে |
| ২০০-১,৫০০ কোটি বছর | ১,৩০০ কোটি বছর থেকে আজতক | বড় গ্যালাক্সিগুলো ছোট গ্যালাক্সি গ্রাস করে আরো বড় হয়; বাইরে থেকে গ্যাস এসেও অনেক গ্যালাক্সি বড় হয় |
| ৫০০-১,৫০০ কোটি বছর | ১,০০০ কোটি বছর থেকে আজতক | ছায়াপথ গ্যালাক্সি আজকের রূপ পায়; পর্যায়ক্রমে তারার জন্ম ও মৃত্যু ঘটতে থাকে |
| ১,০৫০ কোটি বছর | ৪৫৬ কোটি বছর | সৌরজগতের জন্ম; পাথুরে ধুলোবালি আর বরফ জড়ো হয়ে গ্রহাণু ও ধূমকেতু গঠন করে |

| | | |
|---|---|---|
| | ৪৫৪ কোটি বছর | পৃথিবীর ভর তার আজকের ভরের ৮০ শতাংশে দাঁড়ায় |
| | ৪৫৩ কোটি বছর | বিশাল সংঘাতে চাঁদের জন্ম হয়; আরেক সংঘাতে বুধের গা থেকে খোলস উড়ে যায় |
| | ৪৫০ কোটি বছর | পৃথিবী ও অন্যান্য ভূসদৃশ গ্রহের গড়ন পূর্ণ রূপ পায়; সম্ভবত বড় রকম সংঘাতে ইউরেনাসের অক্ষ একপাশে কাত হয়ে যায়; নেপচুন ট্রাইটনকে নিজের আকর্ষণ বলয়ে নিয়ে আসে |
| | ৪৪৪ কোটি বছর | চাঁদের গায়ের শিলা কঠিন রূপ নেয় (চাঁদের সবচেয়ে পুরনো শিলার বয়স) |
| | ৪২০ কোটি বছর | ভেতর দিকের গ্রহগুলোর গায়ের শিলা জমাট বাঁধে |
| ১.১০০ কোটি বছর | ৪০০ কোটি বছর | বাইরের দিকের গ্রহগুলোর গড়ন তৈরি হয়; চাঁদের গায়ে লাভা প্রবাহ বয়ে গিয়ে সমতল ভূমি তৈরি হয় |
| | ৩৯৬ কোটি বছর | পৃথিবীর ওপর আজও যে সব অতি প্রাচীন শিলা টিকে আছে সেগুলো তৈরি হয় |
| | ৩৯৫ কোটি বছর | চাঁদের ওপর বড় রকম সংঘাত ঘটা শেষ হয় |
| | ৩৫০ কোটি বছর | পৃথিবীর ওপর প্রাণের প্রথম প্রকাশ; চাঁদের ওপর প্রধান লাভা প্রবাহের সমতলভূমি তৈরি সমাপ্ত |
| ১,২০০ কোটি বছর | ৩০০ কোটি বছর | শুক্রগহে প্রচণ্ডরকম গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া; মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল উবে যায় আর গ্রহটি শীতল হয়ে পড়ে |
| | ১২০ কোটি বছর | পৃথিবীর ওপর প্রথম উদ্ভিদের বিকাশ |
| ১,৪০০ কোটি বছর | ১০০ কোটি বছর | ইউরেনাস ও নেপচুনের চারপাশে বলয় সৃষ্টি |
| | ৯০ কোটি বছর | পৃথিবীতে প্রথম বহুকোষী জীবের (স্পঞ্জ) আবির্ভাব |
| | ৮০ কোটি বছর | শুক্রগ্রহের ওপর এখনও টিকে আছে এমন সবচেয়ে পুরনো শিলার উদ্ভব |
| | ৬০ কোটি বছর | পৃথিবীর ওপর শক্ত খোলসযুক্ত জীবের উদ্ভব |
| | ৪০ কোটি বছর | পৃথিবীতে ডাঙ্গায় জীবজগতের বিস্তার |

| | | |
|---|---|---|
| ১,৪৯০ কোটি বছর | ১০ কোটি বছর | শনির চারপাশে বলয় সৃষ্টি; মঙ্গল গ্রহের ওপর সর্বশেষ আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ |
| | ৬৬ কোটি বছর | পৃথিবীতে ডাইনোসরদের বিলুপ্তি |
| | ৩০ লক্ষ বছর | প্রথম মানুষের আবির্ভাব |
| ১,৫০০ কোটি | ০ | বর্তমান |

| *মহাবিস্ফোরণের কতদিন পর* | *আজ থেকে কতদিন পর* | *কী ঘটতে পারে* |
|---|---|---|
| ২,০০০ কোটি বছর | ৫০০ কোটি বছর | সূর্য ফুলে উঠতে আরম্ভ করবে, বুধকে গ্রাস করবে তারপর সামান্য ছোট হবে |
| ২,১০০ কোটি বছর | ৬০০ কোটি বছর | সূর্য আবার ফুলে উঠে শুক্র আর পৃথিবীকে গ্রাস করবে |
| | ৬১০ কোটি বছর | সূর্যের ওপরকার স্তর খসে পড়ে বলয় নীহারিকায় পরিণত হবে; ভেতরের কেন্দ্র হয়ে যাবে সাদা বামন |
| ৬,৫০০ কোটি বছর | ৫,০০০ কোটি বছর | সাদা বামন হওয়া সূর্য একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে |
| ১০০,০০০ কোটি বছর | | ছায়াপথ গ্যালাক্সির সব তারার শবদেহ কৃষ্ণবর্ণ; সব গ্যালাক্সি হয়ে পড়বে মৃত আর অদৃশ্য |
| **মহাবিশ্ব উন্মুক্ত হলে** | | |
| অসীম | | সব কিছু বিকিরণে নিঃশেষ হবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসারমান মহাবিশ্ব হালকা হতে হতে বিলীন হয়ে যাবে |

**মহাবিশ্ব আবদ্ধ হলে**

| *পরম ধসের কতদিন আগে* | |
|---|---|
| ১০০,০০০ কোটি বছর | মহাবিশ্ব সবচেয়ে বড় হয়ে সংকুচিত হতে শুরু করবে |
| ১,৫০০ কোটি বছর | গ্যালাক্সিদের মধ্যে দূরত্ব হবে এখনকার মতো |
| ১০০ কোটি বছর | গ্যালাক্সিরা মিশে যেতে আরম্ভ করবে |
| ১ কোটি বছর | নিউট্রন তারাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে শুরু করবে |
| ১০ লক্ষ বছর | কৃষ্ণবিবর অবশিষ্ট সব বস্তুকে গ্রাস করবে |
| ৩ মিনিট | কৃষ্ণবিবররা মিশে যেতে থাকবে |
| ০ | পরম ধস নেমে আসবে |

## ৪ ঃ কোন শব্দ কী বোঝায়

**অতিনবতারা** (supernova): তারার বিস্ফোরণ। একটি বড় আকারের তারার জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন ভেতরকার পারমাণবিক বিক্রিয়া অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তখন তার বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে। একটি বামন তারার গায়ের ওপর বাইরে থেকে জমা গ্যাসের পুঞ্জ বেশি ভারি হয়ে উঠলে তারও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

**অতিবেগুনি রশ্মি** (ultraviolet radiation): বেগুনি আলোর চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটারের কোটি ভাগের ৩৮ ভাগ থেকে ২.৫ ভাগ। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা ঢেউগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঢুকতে পারে।

**অবলাল রশ্মি** (infra-red radiation): লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে লম্বা মাপের বিকিরণ—সচরাচর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় ১ মিমি থেকে ০.০০১ মিমি; মহাকাশে উত্তপ্ত বস্তু এমন বিকিরণ সৃষ্টি করে।

**অনুসূর** (perihelion): সৌরজগতের কোন বস্তুর—যেমন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু বা কৃত্রিম উপগ্রহ—কক্ষপথে সূর্যের সবচেয়ে কাছের অবস্থা।

**অপসূর** (aphelion): সৌরজগতের কোন বস্তুর—যেমন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু বা কৃত্রিম উপগ্রহ—কক্ষপথে সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের অবস্থা।

**আলোক-বছর** (light year): দূরত্বের একটি একক—প্রায় ৯,৪৬,০৭০ কোটি কিলোমিটার ; আলো এক বছরে যত দূর যেতে পারে।

**আপাত মান** (apparent magnitude): পৃথিবী থেকে দেখলে তারার যে উজ্জ্বলতা দেখা যায়।

**আবদ্ধ মহাবিশ্ব** (closed universe): যে তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে এক পর্যায়ে তার প্রসার থেমে যাবে এবং তা আবার সংকুচিত হতে আরম্ভ করবে।

**ইথেন** (ethane): কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ; পৃথিবীর ওপর এটি গ্যাস কিন্তু শনির উপগ্রহ টাইটানের ওপর তরল।

**ইলেকট্রন** (electron): পরমাণুর ভেতরকার কণিকা যাতে ঋণাত্মক চার্জ বা বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে।

**উন্মুক্ত মহাবিশ্ব** (open universe): যে তত্ত্বে বলা হয় মহাবিশ্ব চিরকাল ফেঁপে উঠতে থাকবে।

**উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি** (elliptical galaxy): মোটামুটি উপবৃত্তের আকারের যে গ্যালাক্সি প্রধানত পুরনো তারায় তৈরি আর তাতে ধুলো আর গ্যাস কম থাকে।

**উল্কা** (meteorite): সৌরজগতের কোন কঠিন বস্তু যা পৃথিবী বা আর কোন গ্রহের ওপর পড়ে।

**উর্ট মেঘ** (Oort cloud): সূর্যের চারপাশে একটি বড় এলাকা যেখানে ধূমকেতুর বীজ রয়েছে; এরা সূর্যের কাছাকাছি এলেই তাদের দেখা যায়।

**এক্স-রশ্মি** (X-rays): ঘনীভূত শক্তির সূত্রে তৈরি শক্তিশালী বিকিরণ ; গ্যালাক্সির মধ্যে উত্তপ্ত গ্যাস অথবা কৃষ্ণবিবর ও নিউট্রন তারার চারপাশে গ্যাসের চাক্তিতে এমন রশ্মি উৎপন্ন হয়।

**কক্ষপথ** (orbit): একটি বস্তু যখন মহাকর্ষের প্রভাবে অন্য কোন বস্তুর চারপাশে ঘুরতে থাকে তখন তার পথ।

**কৃষ্ণবস্তু** (dark matter): তত্ত্ব অনুসারে যে বস্তু সারা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে কিন্তু যাকে কোন দূরবীন দিয়ে দেখা যায় না; তারা এবং গ্যালাক্সিদের ওপর মাধ্যাকর্ষণ টানের কারণে এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

**কৃষ্ণবিবর** (black hole): মহাকাশের এমন জায়গা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ এমন প্রবল যে সেখান থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভরের কৃষ্ণবিবর অতিনবতারা বিস্ফারণের জন্ম দিতে পারে। কোয়াসারের ভেতরে সূর্যের ভরের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ ভরের কৃষ্ণবিবর দেখতে পাওয়া যায়।

**কোয়ার্ক** (quark): পরমাণুর ভেতরকার কণিকা যা থেকে নিউট্রন ও প্রোটন তৈরি হয়।

**কোয়াসার** (quasar): অতি উজ্জ্বল অথচ অতি ছোট বস্তু যা সৌরজগতের চেয়েও ছোট এলাকা থেকে বহু গ্যালাক্সির সমান তেজ বিকিরণ করে। মনে হয় এরা অতি বিশাল কৃষ্ণবিবরের চারপাশে উষ্ণ গ্যাসের চাক্তি।

**খাদ** (crater): কোন গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ে বাটি বা পিরিচের মতো কোন গর্ত; মহাকাশ থেকে কোন বস্তুর আঘাতে এমন খাদ সৃষ্টি হয়।

**গামা রশ্মি** (gamma radiation): অতি শক্তিশালী বিকিরণ; তরঙ্গদৈর্ঘ্য $১০^{-৮}$ মিমি-এর চেয়ে কম।

**গ্যালাক্সি** (galaxy): বিশাল নক্ষত্রজোট—সাধারণত একটি গ্যালাক্সিতে দশ লক্ষ থেকে এক লক্ষ কোটি তারা থাকে। আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি তার নাম ছায়াপথ গ্যালাক্সি। উপবৃত্তাকার গ্যলাক্সির আকার হয় ডিমের মতো; তাতে খুব বেশি ধুলো বা গ্যাস থাকে না। যে সব গ্যালাক্সিতে বেশি ধুলো আর গ্যাস থাকে তাদের আকার এলামেলো অথবা লম্বা লম্বা শাখাওয়ালা প্যাঁচানো।

**গ্যালাক্সি জোট** (cluster of galaxies): কয়েকশ বা কয়েক হাজার গ্যালাক্সির দল, পরস্পরের আকর্ষণের টানে যা একত্র হয়ে থাকে।

**গ্রহাণু** (asteroid): যেসব বস্তুখণ্ড সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খায়; তাদের ব্যাস সাধারণত এক কিলোমিটার বা তার চেয়ে কম থেকে সিরেজ নামে গ্রহাণুর বেলায় ১,০৩০ কিমি পর্যন্ত হয়; অধিকাংশই থাকে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে গ্রহাণু বলয়ে আর ঘোরে পৃথিবীর প্রায় একই কক্ষতলে।

**গ্রীনহাইস প্রতিক্রিয়া** (greenhouse effect): গ্রহের বায়ুমণ্ডলে নানা রকম গ্যাসের কারণে সূর্যের তাপ জমা হয়ে তাপমাত্রা বেড়ে ওঠা—কাচের তৈরি সবুজঘরে যেমন ঘটে; জলীয় বাষ্প আর কার্বন ডাই-অক্সাইড এরকম গ্রীনহাউস গ্যাস।

**ঘটনা দিগন্ত** (event horizon): কৃষ্ণবিবরের সীমানা, যার ভেতরের কোন ঘটনাই বাইরের মহাবিশ্ব থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

**চন্দ্রশেখর সীমা** (Chandrashekhar limit): সাদা বামনে পরিণত হবার জন্য তারার ভরের সীমা; সূর্যের ১·৪৪ গুণ পর্যন্ত ভরের তারারাই সাদা বামন হতে পারে। এর চেয়ে বেশি ভরের তারারা হয় নিউট্রন তারা অথবা কৃষ্ণবিবর।

**চাক্তি** (disc): বস্তুর চ্যাপ্টা গোলাকার জোট। মহাকাশে নানা ধরনের চাক্তি সৃষ্টি হয়। তারা আর গ্যাস মিলে প্যাঁচানো গ্যালাক্সিতে চাক্তির আকারে জড়ো হয়। কোয়াসারে কৃষ্ণবিবরের চারপাশে উত্তপ্ত গ্যাস চাক্তি তৈরি করে। আবার নতুন তারার চারপাশে ধুলো আর গ্যাস চাক্তির আকারে জড়ো হয়ে গ্রহজগৎ সৃষ্টি করে।

**ছায়াপথ** (Milky Way): সূর্যসহ প্রায় ৪০,০০০ কোটি তারা নিয়ে একটি গ্যালাক্সি; কখনো বলা হয় 'আমাদের গ্যালাক্সি'।

**জৈব অণু** (organic molecules): এমন যৌগ যাতে কার্বন পরমাণু রয়েছে; জীবন্ত কোষ মূলত বড় বড় জৈব যৌগ দিয়ে তৈরি হয়।

**জ্যোতির্বিদ্যা-একক** (astronomical unit): পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব; সৌরজগতের বিভিন্ন দূরত্ব বর্ণনা করার জন্য এই একক ব্যবহার করা হয়। এই দূরত্বকে ধরা হয় ১৪,৯৫,৯৭,৮৭০ কিলোমিটারের সমান।

**তারা** (star): মহাকাশে এমন এক বস্তু যার ভেতরে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটছে; সূর্য একটি তারা।

**তাপপারমাণবিক বিক্রিয়া** (nuclear fusion): যে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় হালকা পরমাণুর কেন্দ্র জুড়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণু তৈরি হয়; যেমন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে গিয়ে একটি হিলিয়ামের পরমাণু সৃষ্টি হয়; তাপপারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলেই তারারা আলো বিকিরণ করে।

**তারামণ্ডল** (constellation): আকাশে একগুচ্ছ তারা মিলে তৈরি একটি নকশা।

**দানব তারা** (giant star): একই ধরনের আলো দেয়া তারাদের মধ্যে অতি উজ্জ্বল আর সচরাচর খুব বড় আকারের তারা। এসব তারার ওপরকার গ্যাস অতি হালকা।

**ধূমকেতু** (comet): সৌরজগতের ছোটখাট বস্তু, বরফ আর পাথরের খণ্ডে তৈরি; সূর্যের কাছাকাছি এলে এদের গ্যাসে তৈরি বড়সড় 'কমা' বা মাথা আর একটি লম্বা লেজ দেখা যায়।

**নবতারা** (nova): ছোট সাদাবামন তারার গায়ে জমে থাকা গ্যাসের বিস্ফোরণ; সাদা বামন কাছের কোন তারার গা থেকে এই গ্যাস শুষে তুলে নেয়।

**নিউট্রন** (neutron): পরমাণুর ভেতরকার কণা যাতে কোন চার্জ বা বৈদ্যুতিক আধান নেই।

**নিউট্রন তারা** (neuton star): খুব ভারি তারার অন্তিম অবস্থায় তৈরি ছোট আকারের অতিঘন বস্তু যাতে থাকে শুধু নিউট্রন ; ঘুরপাক খাওয়া নিউট্রন তারাকে বলা হয় পালসার।

**নিষ্ক্রমণ বেগ** (escape velocity): কোন মহাজাগতিক বস্তু থেকে মহাকাশে বেরিয়ে যেতে হলে যে বেগ হওয়া দরকার। এই বেগ নির্ভর করে মহাজাগতিক বস্তুর আয়তন ও ভরের ওপর। পৃথিবীর বেলায় এটা ১১·১৮ কিমি/সে. আর সূর্যের ৬১৭·৩ কিমি/সে.।

**নীল দানব** (blue giant): অতি উষ্ণ ও অত্যন্ত উজ্জ্বল তারা যারা মূলত কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে। এদের আয়ু কম হয়; আর গায়ের তাপমাত্রা হয় সূর্যের চেয়ে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ গুণ বেশি; উজ্জ্বলতা হয় সূর্যের চেয়ে প্রায় লক্ষগুণ বেশি।

**নীহারিকা** (nebula): মহাকাশে গ্যাসের পুঞ্জ—ভেতরে উষ্ণ নতুন তারার কারণে আলোকিত।

**পরম মান** (absolute magnitude): সব তারাকে একই দূরত্বে (৩২·৬ আলোক-বছর দূরে) ধরে কোন তারার প্রকৃত উজ্জ্বলতার মাপ।

**পরম শূন্য** (absolute zero): যার নিচে আর কোন তাপমাত্রা নেই: —২৭৩° সে.।

**পারমাণবিক বিক্রিয়া** (nuclear reaction): দুটি পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যে যে বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধরনের পরমাণুর উদ্ভব হয়।

**পারসেক** (parsec): যে দূরত্বে থাকলে একটি বস্তু বছরে এক সেকেণ্ড কৌণিক বিচ্যুতি উৎপন্ন করে। এর মান ৩·২৬ আলোক-বছরের সমান। পৃথিবী থেকে এত কাছে কোন তারা নেই।

**পালসার** (pulsar): ঘুরপাক খেতে থাকা নিউট্রন তারা যা থেকে বেতার তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি, আলো প্রভৃতি বিকিরণ বেরোয়।

**প্যাঁচানো গ্যালাক্সি** (spiral galaxy): এমন গ্যালাক্সি যার মাঝখানটা পুরু এবং বিষুবতলে চারপাশে প্যাঁচানো শাখা বেরিয়ে আছে। এগুলো তারা, ধুলো ও গ্যাস মিলিয়ে তৈরি।

**প্রতিপদার্থ** (anti-matter): যে পদার্থের বৈদ্যুতিক আধান ও গুণাগুণ সাধারণ বস্তুর বিপরীত; প্রতিপদার্থ যখন পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাদের উভয়ের বিলোপ ঘটে শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে।

**প্রসারণ** (inflation): মহাবিস্ফোরণের পর এক সেকেণ্ডের অতি সামান্য ভগ্নাংশ যে সময়ে মহাবিশ্ব দ্রুত প্রসারিত হয়ে বিশাল হয়ে ওঠে।

**প্রোটন** (proton): পরমাণুর ভেতরকার কণিকা যাতে ধনাত্মক চার্জ বা বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে।

**বর্তুলাকার তারাস্তবক** (globular cluster): অপেক্ষাকৃত ঘন হয়ে গোলকের আকারে জোট বাঁধা তারার দল। এরকম জোটে বিশ-ত্রিশ হাজার থেকে দশ লাখের ওপর তারা থাকতে পারে।

**বাদামি বামন** (brown dwarf): গ্রহ আর তারার মাঝামাঝি ভরের বস্তু। এদের ভর হয় সূর্যের ০·০৮ গুণের কম। এদের ভেতরে তাপপারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে না, তবে মাধ্যাকর্ষণের কারণে এরা সংকুচিত হয় বলে কিছু শক্তির বিকিরণ হয়।

**বেতার উৎস** (radio source): মহাকাশে এমন বস্তু যা থেকে সর্বক্ষণ বেতার তরঙ্গ বেরোচ্ছে।

**বেতার দূরবীন** (radio telescope): মহাকাশের বেতার উৎসের সন্ধান করার জন্য ব্যবহৃত দূরবীন।

**ভর** (mass): কোন পদার্থে মোট বস্তুর পরিমাণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সচরাচর গ্রহের ভরের তুলনা করেন পৃথিবীর সঙ্গে আর তারার ভর তুলনা করেন সূর্যের সঙ্গে।

**মহাধস** (Big Crunch): সব বস্তুর ধসের ফলে যে ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে বলে মনে করা হয়।

**মহাবিস্ফোরণ** (Big Bang): প্রায় ১,৫০০ কোটি বছর আগে যে বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল।

**মহাবিশ্ব** (universe): স্থান ও সময় জুড়ে যা কিছু আছে তার সব কিছু।

**মূলধারার তারা** (Main Sequence star): যে তারার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে।

**মিথেন** (methane): কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ; পৃথিবীতে গ্যাস কিন্তু নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন ও প্লুটোর ওপর জমে কঠিন।

**মৌল** (element): একই ধরনের পরমাণুর সমাবেশ, যেমন হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন।

**ডপলার প্রতিক্রিয়া** (Doppler Effect): উৎস ও দর্শক বা শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতির কারণে আলো বা শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা স্পন্দনহারে পরিবর্তন।

**যুগল গ্রহ** (double planet): দুটি প্রায় একই ভরের বস্তু যা সূর্য বা আর কোন তারার চারপাশে একসঙ্গে ঘোরে, যেমন প্লুটো আর কেয়ারন।

**যুগল তারা** (binary star): একই সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে এমন দু'টি তারা।

**লাল বামন** (red dwarf): হালকা, মিনমিনে এবং ঠাণ্ডা মূলধারার তারা।

**লাল দানব** (red giant): বিশাল তারা যার তাপমাত্রা কম; তারার জীবনের অন্তিম অবস্থা যখন সেটি তার আগের আয়তনের চেয়ে একশগুণ ফুলে ওঠে।

**শেফালি বিষম তারা** (Cepheid variables): এক ধরনের বিষম তারা যেগুলোতে ১৭৮৪ সালে আবিষ্কৃত ডেল্টা সেফাইয়ের মতো উজ্জ্বলতার কম-বেশি ঘটে। ১ থেকে ৫০ দিনে এদের উজ্জ্বলতার ওঠা-নামা ঘটে।

**সংযুতি চাক্তি** (accretion disc): কৃষ্ণবিবর বা আর কোন বস্তুর চারপাশে বস্তুর বলয় যাতে ক্রমাগত নতুন নতুন নতুন বস্তু যোগ হচ্ছে; অবশেষে এক সময় সে সব বস্তু চাক্তি থেকে তারায় বা কৃষ্ণবিবরে গিয়ে পড়ে।

**সাদা বামন** (white dwarf): ঘনীভূত তারা; লাল দানবের গা থেকে তার ওপরের স্তর খসে পড়লে তার কেন্দ্রে সাদা বামন দেখা দেয়।

**সৌরকলঙ্ক** (sunspot): সূর্যের আলোকমণ্ডলে যে কালো দাগ দেখা যায়। এগুলো সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের কারণে সৃষ্টি হয়; এই এলাকাগুলো চারপাশের এলাকার তুলনায় কম উষ্ণ।

**সৌরজগৎ** (solar system): সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু নিয়ে যে জগৎ; তার মধ্যে সূর্য ছাড়াও পড়ে তার সব গ্রহ, উপগ্রহ, তাদের বলয়, গ্রহাণু ও ধূমকেতু।

---